আত্ম-নিবেদন

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষ দিব্যমুপৈতি ॥

মুণ্ডক উপনিষদ ॥

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-
সম্পাদিত।

মূল্য—২৲, বাঁধাই ২॥০ টাকা।

আত্ম-নিবেদন

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্

মুণ্ডক-উপনিষৎ

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-
সম্পাদিত।

প্রকাশক—
পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ সরস্বতী
স্থান—ঋষভাশ্রম—কৈলাসশেখর-উপত্যকা,
কাশ্মীর।
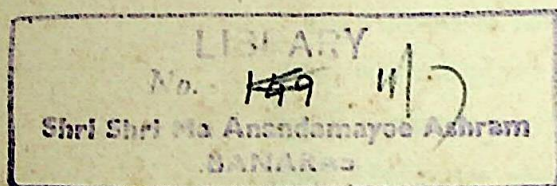
প্রিন্টার—
শ্রীঅমৃতলাল দত্ত
অমৃতপ্রিন্টিংওয়ার্কস্
১২৮।১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা

এই আত্ম-নিবেদন গ্রন্থের উদ্দেশ্য কি,—আলোচ্যই বা কি—এই ভূমিকায় তাহা উল্লেখ করা সহজ নহে। পাঠক পাঠিকাগণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা বুঝিয়া লইবেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা বা রচয়িত্রী যে কে, তাহা প্রকাশ করিতে আমাকে অধিকার দেওয়া হয় নাই—সুতরাং সে সম্বন্ধে কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন না করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। তবে ইহা যে কেবল এক ব্যক্তির রচনাতেই রচিত হয় নাই, গ্রন্থ-পাঠে তাহা স্পষ্টতই বুঝা যাইবে। আমি এই গ্রন্থের সম্পাদক মাত্র। এই গ্রন্থ পাঠে জন-সমাজের কিছু উপকার হইতে পারে—এই ভরসায় আমি সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছি।

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
> অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্ম-নিবেদনম্ ॥

এই নব প্রকার ভক্তির শেষটী—আত্ম-নিবেদন। ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে এই পদটী Self-consecration পদে অনুদিত হইতে পারে। আত্ম-নিবেদন-ব্যাপারে আত্ম-সংযম (Self-control), আত্মত্যাগ (Self-abnegation), আত্ম-বলিদান (Self-sacrifice), আত্ম-উপেক্ষা (Self-denial), আত্ম-সমাধি (Self-absorption) এবং আত্ম-বিসর্জ্জন (Self-annihilation বা Self-disintegration) প্রভৃতি স্বার্থ-নাশজনক চরিত্র-গঠনের উপাদান পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে এই সকল ভাবের উদাহরণ উদ্‌ঘাপন, আবেশ সমাবেশ, প্রভাব সম্ভাব, প্রসার প্রতিপত্তি, বৈভব ও গৌরবের সমুজ্জল লেখনী-চিত্র দৃষ্ট হইবে। আদান-

প্রদান-বাণিজ্য-ব্যাপারময় জগৎ হইতে স্বার্থ ত্যাগের উচ্চস্তরে যে এক অত্যুচ্চ বিপুল বিশাল স্বতন্ত্র বিশ্ব নিত্য বিরাজমান আছে, ইহাতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

১৩৩৬ সালের বৈশাখে আরম্ভ

শ্রীরসিকমোহন দেব শর্ম্মা
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আত্ম-নিবেদন

প্রথম অধ্যায়

আঁধারে আলো

উপরে নীলাকাশ,—অসীম অনন্ত; তাহাতে অগণ্য তারকার মেলা—যদি তারকাগুলি না থাকিত, তবে উহা আঁধারের মহা সাগর বলিয়াই মনে হইত—ভাগ্যে বিধি তারার ফুল ফুটাইয়া রাখিয়া ছিলেন, তাই রক্ষা,—নচেৎ এ আন্ধারে বুঝি শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে সহসা বায়ুকোণে এক খানি মেঘের উদয় হইল, দেখিতে দেখিতে উহা সমগ্র আকাশে ছড়াইয়া পড়িল—তারার বাগান মেঘের সাগরে ডুবিয়া গেল—শেষ আলোটুকুও নিভিয়া গেল।

এমনই এক আঁধার রাত্রিতে ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া স্থির করিলাম—মরণ ভিন্ন আমার এ জীবনে আর শান্তি নাই—মরণই ভাল। যে জীবনে কোন সুখের আশা নাই, কোনও শান্তি নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, স্নেহময়ী জননী ছিলেন তিনিও সহসা ছাড়িয়া গেলেন—তবে কেন যাতনা ভোগের জন্য বৃথা এ জীবনের ভার বহন করিব; মরণই আমার বন্ধু—মৃত্যুতেই আমার শান্তি। আমি বিধবা নই, সধবা নই, কুমারীও নই—কিন্তু ফলতঃ কতকটা কুমারীরই মত। কিন্তু ঠিক কুমারী অবস্থায় থাকিলে এত দুঃখ হইত না। ব্রহ্মচারিণী বলিলে ব্যবহারে বড় বেশী মিথ্যা হইবে না। কিন্তু ব্রহ্মচারিণীর চিত্ত যেরূপ স্থির প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার, আমার চিত্ত সেরূপ নহে। চিত্ত সর্ব্বদাই শূন্যশূন্য

বোধ হইত, আর তীব্র যাতনা! তখন আমার বয়স সতর বা আঠার বর্ষ। মনে যে কি প্রকার যাতনা হইত তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। কিন্তু সে যাতনা অতি তীব্র! আহার নিদ্রা আপন হইতেই দূর হয়েছিল, সমবয়সীরা যে আমোদ, উল্লাসে সংসার করে, বিধাতা যখন আমার জন্য সে ব্যবস্থা করেন নাই, তাহাদের সহিত আলাপে আমার দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই, আমি তাহাদের সঙ্গ করিতাম না পাছে বা তাহাদের কথা শুনিয়া প্রাণে নূতন নূতন যাতনার সৃষ্টি হয়,—এই ভয়ে তাহাদের নিকট ঘেসিতাম না।

সকল কথা খুলিয়া বলিব না—বিধাতার এইরূপ অভিশপ্তার দুঃখ সংসারের লোকে বুঝিবে না, বুঝাইতেও প্রয়াস পাইব না। দিবারাত্রি মনে হইত এই নির্জ্জন কারাবাসে,—এই শুষ্ক মরুদেশে আর কতকাল হাহাকার করিয়া প্রাণ ধারণ করিব? আমার মরণই মঙ্গল—মৃত্যুই আমার এক মাত্র বন্ধু।

এইরূপ ভাবি আর রোদন করি—চখের জল চখেই শুকাইয়া যায়—উহা দেখিবাব কেহ নাই, দেখিলেও বুঝিবার কেহ নাই—বিধাতা যে কেন আমাকে মানুষের সমাজে পাঠাইয়াছেন, ইহাই অনেক দিন বুঝিতে পারি নাই। জ্ঞানের আরম্ভেই পাপের ভয় জাগিয়াছিল—সর্ব্বদাই সেই ভয় করিতাম—ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা কখনও মনে স্থান দিই নাই। বিধাতা যখন আমায় সে অবস্থায় জগতে আনেন নাই, আমি অবস্থা বুঝিয়া সে চিন্তা একেবারেই ছাড়িয়াদিয়া সংযম ও বৈরাগ্যকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলাম—অসদ্ভাব যে নরকের দ্বার, যৌবনের প্রারম্ভেই তাহা বুঝিয়া ছিলাম, অন্তরের সহিত সে সকল ভাবের প্রতি ঘৃণা করিতাম, সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীরা সেরূপ আলাপের সূত্রপাত করিলে আমি ভয়ে ভয়ে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতাম—কিন্তু

ক্রমেই জীবনের প্রতি তীব্র ঔদাসীন্য আসিতে লাগিল, কি-জানি-কেমন এক নিরাশার ভাব হৃদয় জুড়িয়া বসিল ; জীবন ভার-ভার বোধ হইতে লাগিল—কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হইল না—আত্মহত্যা করিয়াই এ যাতনার শেষ করিব ইহা একেবারেই নিশ্চয় করিয়া রাখিলাম। আত্মহত্যার যতগুলি উপায় আমি কল্পনায় আনিতে পারিলাম সকল গুলিই আমার নিকট সহজ বলিয়া মনে হইল। মনে করিলাম শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এ দেহ ত্যাগ করাই পরম মঙ্গল।

এক ভীষণ আঁধার নিশীথে প্রকৃতই সে সুবিধা সহজেই উপস্থিত হইল। আমি ভজন সাধনের প্রণালী কিছুই জানিতাম, সেইরূপ উপদেশও পাই নাই। কিন্তু শ্রীগৌরগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি স্বতঃই আমার মন জুড়িয়া বসিতেন। আমি অনেকক্ষণ শ্রীগোবিন্দের নাম করিলাম—যে উপায়ে এ দেহ-কারাগার হইতে উদ্ধার পাইব, সেই উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্রেই সহসা একটি গোলাকার আলোক-গোলক আমার চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, তখন চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়াছিল। সেই আলোক হইতে—বলিতে কি, বলা ভাল কি মন্দ জানি না, যখন বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন ইহাও বলিব—বলিতে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে—আমার ধ্যানের শ্রীমূর্ত্তি শিখিপুচ্ছচূড়, বংশীধারী শ্রীগোবিন্দ দেখা দিলেন, বংশী ফেলিয়া আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন—ছি ছি একি ? এখনও দেহত্যাগের সময় হয় নাই, তোমার যাতনা আমি জানি, অচিরেই এক নরদেহে আমি তোমায় দেখা দিব—তখন সেই দেহে তোমার ভাবতৃষ্ণার মহাসাধনায় সিদ্ধি দিব। কিন্তু বিরহ-বেদনা তখন অন্য ভাবে যাতনার বৃদ্ধি করিবে, তাহাই তোমার সাধনার সহায়

হইবে, সত্বরেই সে দেহেদেখা দিব।" এই বলিয়া আমার হাত ছাড়িয়া গিলেন, আলোক নিভিয়া গেল, কিন্তু নয়নে সে রূপের ঝলক, কাণে সে মধুর বাক্যের ঝঙ্কার যেন এখনও লাগিয়া রহিয়াছে।

আমি সেই নয়নানন্দ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে এবং অশরীরী বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইলাম—মরণের উপায় দূরে ফেলিয়া দিলাম। সেই ভীষণ নিদাঘের নিশীথে গম্ভীর প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে আমার এই ভীষণ কার্য্যের উদ্যোগ দেখিতেছিল। গভীর নিশীথে সমস্ত প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ, গাছের একটী পাতাও কাঁপিবার সাহস পায় নাই। সেই শ্রীকর স্পর্শে এবং আশার বাণীতে আমার দেহ মন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। আমি গৃহে আসিয়া একখানা মাদুরে বিবশ ভাবে পড়িয়া রহিলাম—ভাবিতে লাগিলাম, শুনিয়াছি ভগবান্ দয়াময়, দয়া কাহাকে বলে জীবনে তাহা জানি না, হৃদয়ের হাহাকার এবং পুনঃ পুনঃ ঔদাসীন্য ভাবই সর্ব্বদা অনুভব করি, প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা দয়া বিবেক বৈরাগ্য এ সকল কথার কোনও অর্থ বুঝিতে পারি নাই—আজ শ্রীগোবিন্দ নিজে দয়া বুঝাইয়া দিলেন, বুঝিলাম তিনি দয়াময়। কিন্তু তিনি নরদেহে আসিয়া আমার প্রাণের তৃষ্ণা পূরাইবেন, সে আবার কি রূপ? কিন্তু তিনি তো সত্য-সঙ্কল্প। একখানি গ্রন্থে গোপবালাদের হেমন্তে সাধনার কথা পড়িয়া ছিলাম—তাঁহারা কাত্যায়নী ব্রতের ফলে রসময় শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের মনোমত প্রার্থনা পূরণের জন্য যেমন আশা দিয়াছিলেন, তেমনই তাহা পূর্ণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার আপন শক্তি, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই সিদ্ধ দেহ—ভাব সিদ্ধা ছিলেন সকলেই। কিন্তু এই নীচস্থলোদ্ভবা তুচ্ছ মানবীর প্রতি তাঁহার এই দয়া—ইহা মনে করিলেও স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহা ধাঁধা নয়। আমি মনে মনে

বলিতে লাগিলাম—এ অধমার জন্য তুমি নরদেহে আবিষ্ট হইবে কেন? আমার যে শ্রীহস্তে স্পর্শ করিয়াছ ইহাই যথেষ্ট; ইহাতেই আমার সকল জ্বালা দূর হইল। আমি শান্তরস অপেক্ষা তোমার মধুররস অধিক ভালবাসি। তাহাতেও যে অনন্ত জ্বালা আছে, তোমার ব্রজলীলায় তাহাও জানা যায় কিন্তু তথাপি সে জ্বালাতেও আনন্দ আছে, কেন না তাহাতে কেবল তোমারই চিন্তা। মা যশোদার কথাই বলি, আর শ্রীমতী শ্রীরাধার কথাই বলি,—ইহাদের নিদারুণ দুঃসহ বিরহে কেবল তোমারই চিন্তা—উহাই তো এ জগতের নরনারীর সাধনার উদ্দীপক। দয়াময় যখন হাত ধরিয়া মরণ হইতে রক্ষা করিয়াছ, তখন এ জীবনে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিও, তাহাতে যত জ্বালা যাতনা হয়, হইবে; সহিতে শক্তি দিও।" এই বলিয়া করযোড়ে তাঁহার উদ্দেশ্যেই প্রণাম করিলাম; উদ্দেশ্যে তত নয়—হৃদয়ে সে চিত্রটি তখনও উজ্জ্বল ভাবেই অঙ্কিত ছিলেন।

রাত্রি শেষ হইল, পাখীগুলি গাছে বসিয়াই দয়াময়ের প্রভাতী গানের তান ধরিল। উষার বায়ু তাহারই সুশীতল করকমলের ভাব লইয়া বহিতে লাগিল, পাখীদের কলকণ্ঠে আমি তাঁহারই মধুর কণ্ঠের ক্ষীণাভাস অনুভব করিতে লাগিলাম। সমগ্র সংসার আমার নিকট মধুময় হইয়া উঠিল। আমি কেবলই তাঁহার নরবেশে শুভাগমনের দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমি আমার পিতৃগৃহে কিছু দিনের জন্য গিয়াছিলাম। উদাস ভাবেই দিন যামিনী অতিবাহিত হইত। এই সময়ে একটি মহিলা কথা প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তাঁহার কথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে সামাজিক রীতি অনুসারে তাহার পরিচিতা একটি ভদ্র মহিলা আত্ম-ত্রাণের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহার নিকট আত্ম-ত্রাণের উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহার আকার প্রকার বিদ্যাবুদ্ধি রূপ গুণের কোনও

কথা তিনি বলিলেন না, কেবল তাঁহার নামটীর উল্লেখ করিলেন। তিনি বিদ্বান্ কি মূর্খ, যুবক কি বৃদ্ধ, সুরূপ কি কুরূপ, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সাধু কি অসাধু,—এ সকল বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করিলেন না, করিলেও আমি তাহাতে ত বড় একটা কাণ দিই নাই—কেবল নামটী শুনামাত্রেই আমার প্রাণে কেমন একটা ঝঙ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার নিকট আর কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পাইলাম না। দেহটা যেন অবশ বোধ হইতে লাগিল। আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘরে আসিয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলাম, চিত্তে যে তখন কত ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিব না। কেবল মনে হইতে লাগিল কিরূপে আমি ইহার দর্শন পাই। আহারের সময় হইল পিতৃগৃহের আত্মীয়গণ আহারের জন্য আমায় তাগিদ দিতে লাগিলেন। আমি বসিলাম আমার শরীর ও মন ভাল নয়, আমার জন্য কেহ অপেক্ষা করিও না, আমি এখন মাথা তুলিতে পারিব না। ফলত আমি প্রকৃত পক্ষেই অবশ হইয়া পড়িলাম। অতঃপরে যদিও কোন প্রকারে দেহের নিত্যকার্য্যগুলি করিতে লাগিলাম কিন্তু প্রাণে কিছুমাত্র শান্তি রহিল না। তখন আর পিতৃগৃহ ভাল বোধ হইল না, স্থানান্তরে—পরের ঘর। সেই গ্রামে উপদেষ্টা আসিয়াছিলেন; কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে। তিনি যেখানে আসিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার পুনর্ব্বার আগমনের কোনও হেতু নাই—তথাপি সেই গ্রামে যাওয়ার জন্য আমার বলবতী বাসনা হইল। যেহেতু কখনও ঐ গ্রামে তাঁহার পদার্পণ হইয়াছিল, যেন সেই গ্রামের ধূলায় তাঁহার পদরজ মিশিয়া রহিয়াছে, যেন সে গ্রামের বাতাসে তাহার অঙ্গগন্ধ আছে, যেন সে গ্রামের সূর্য্যকিরণে এখনও বুঝি তাঁহার অঙ্গচ্ছটা মিশিয়া রহিয়াছে,—এই এক উদ্ভট ভাব আসিয়া আমার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। আমি আর পিতৃগৃহে থাকিতে পারিলাম না।

পরের ঘরের লোকজনদিগকে খবর দিয়া তাঁহাদের গ্রামে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইলাম। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা মনে কিছু শান্তি আসিল, মনে হইল এই গ্রামে তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন এই গ্রামটী অতি ধন্য। যোগীরা যেমন যোগপীঠে বসিয়া ধ্যেয় বস্তুর ধ্যানে বিভোর হয়, আমিও তেমনি এখানে থাকিয়া তাঁহারই ধ্যানে বিভোর হইলাম—সে ধ্যান সাকার নহে—নিরাকারও নহে। কিন্তু ধীরে ধীরে উঁহার একটি আকার আমার হৃদয় পটে অঙ্কিত হইতে লাগিল। আমি অবলা—কুলবধূ, সংসারে কিছু কিছু কাজ করিতে হয়—কিন্তু তাহা নাম মাত্র। সর্ব্বদাই ভাবী-গুরুর সুখময়ী ভাবনা আমার হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইল। আমি গৃহ-স্বামীর নিকটে অতি কাতর ভাবে আমার উপদেশ প্রাপ্তির বাসনা খুলিয়া বলিলাম—উপদেষ্টার নামটীও জানাইলাম। তিনি দয়া করিয়া আমার নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন এবং আমার অভীষ্ট পূরণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আমার হৃদয়ে ক্রমশঃ উৎকণ্ঠার আবেগ বাড়িতে লাগিল। আহারে রুচি হইল না, দিন যামিনী কেবল মনে ঐ এক চিন্তা। নিদ্রা প্রায়ই হইত না, যদি বা কখনও নিদ্রার আবেশ হইত, উহাতেও সেই স্বপ্ন। কিন্তু এত ব্যাকুল ভাব ও এত বৈরাগ্যের মধ্যেও আমার চিত্তে সর্ব্বদাই একটী আশার আলোক ঝলক দিত, মনে হইত দয়াময় অবশ্যই আমায় দেখা দিবেন—অবশ্যই আমায় অঙ্গীকার করিবেন—আমি উপেক্ষিতা, সংসার সুখ-বঞ্চিতা কিন্তু পতিতা নই—আমি রূপগুণ-বিহীনা, ভজন-সাধন-বিহীনা কিন্তু আমার প্রাণ তো তাঁহাকেই চায়—প্রাণ তো তাঁহার জন্যই ব্যাকুল ; তিনিও দয়াময়, যখন আশা দিয়াছেন অবশ্যই দেখা দিবেন অবশ্যই কৃপা করিবেন। কিন্তু এখনও কি সময় হয় নাই—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিন দিন ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। যাঁহারা

আমায় কৃপার চক্ষে দেখিতেন, তাহারা প্রবোধ দিতেন। আমার উদ্দেশ্য সাধনে তাহারা সচেষ্ট হইলেন।

নব বর্ষের শুভ বৈশাখ পুরাতনকে বিদায় দিয়া নব ভাব জাগাইয়া তুলিল। বৃক্ষ বল্লরী পূর্ব্ব হইতেই কচিকচি কিশলয় বিকাশ করিতেছিল, এখন প্রত্যেক বৃক্ষেই পত্র গুলি সরস সজীব ও নয়নানন্দ হরিত ভাবে প্রকৃতির নব জীবনের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিল। এই সময় সহসা এক দিবস চন্দ্রের রজত কিরণ গায়ে মাখিয়া নরদেহে প্রাণের ঠাকুর দেখা দিলেন—কিন্তু শ্যাম দেহ নয়,—গৌরাঙ্গ ; চাঁচর চিকণ-কুন্তল নয়—মণ্ডিত মস্তক। লোকেরা কি দেখিল,—বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হইল রসিক-শেখর রসরাজের এই অভিনব মূর্ত্তি আমার ন্যায় উপেক্ষিতা দুঃখিত নর-নারীর উদ্ধারের জন্যই বুঝি ধরাধামে অবতীর্ণ। দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলাম—শ্রীগোবিন্দ বাস্তবিকই সত্যসঙ্কল্প ; যাহা বলিয়াছিলেন ঠিক তাহাই করিলেন। যিনি অনন্ত কোটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তিনি একটি ক্ষুদ্রতম কীটেরও প্রিয়তম সুহৃদ, সখা বন্ধু ও আত্মা ; তাই তিনি আমায় দেখা দিলেন। আমার হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল।

অন্য অন্য নরনারীগণ তাঁহাকে কেমন দেখিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে হইল, বৈরাগ্যবিদ্যা ও প্রেমভক্তির সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীশচীনন্দনরূপে আমায় কৃপা করবায় জন্য ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীগোবিন্দ আজ দর্শন দিলেন। দেখা মাত্রই আমার হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ দূর হইল। ইন্দ্রিয়-বিলাস আমার মনে কখনও আসে নাই, আমি বিবেক-বৈরাগ্য প্রেমভক্তি এবং দয়াদাক্ষিণ্যময়ী মধুরা প্রীতির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম—কিন্তু তাঁহার লেশাভাসও অনুভব করিবার সুযোগ পাই নাই।

তাহার পরিবর্ত্তে আমি কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিতাম যে এ সংসারে আমি কেবল গো-গর্দ্দভের ন্যায় পাশবিক পরিশ্রমের জন্যই আনীত

হইয়াছি—মনুষ্যোচিত দয়াটুকুতেও বঞ্চিত ছিলাম। দয়াময়ের নয়নের জ্যোতিতে,বচনের মধুরতায়, বদনের প্রফুল্লতায় ও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আমার স্পষ্টতঃই ধারণা হইল, যিনি আমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া আমায় নররূপে দেখা দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া ছিলেন, আজ তিনিই গুরুরূপে আসিয়াছেন—সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার দেহ-মন-প্রাণ ইঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া দিলাম, সংসারে সুখের আশা ত্যাগ করিলাম এবং জীবন-ব্যাপী বিরহ বেদনা-সহনের জন্য প্রস্তুত হইলাম—শ্রীগোবিন্দ আমাকে পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছিলেন। আমিও মনে মনে বুঝিয়া ছিলাম জগদারাধ্য সমগ্র জগতের অভিবাঞ্ছিত এই করুণাময় বিগ্রহকে মানস-নয়নে ধ্যান ব্যতীত নিত্য দর্শন এই দুঃখিনীর পক্ষে সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ বিহিত বিধানে তিনি আমার কর্ণে শ্রীতারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিলেন; আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, শুষ্ক হৃদয়ের মধ্যদিয়া যেন ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত হইল—মনে হইল যেন কোন পবিত্র আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, যেন নব জীবন পাইলাম। তিনি অতীব মৃদু মধুর কণ্ঠে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, উহার প্রত্যেক অক্ষর আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি গদ্‌গদ কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নেত্রে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। আমি আনন্দে বিবশ হইয়া পড়িলাম—আমার মনে হইল যেন কোন আনন্দময়ী বিজরী-শক্তি আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া আমায় আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছে। তিনি এইরূপে কিয়ৎক্ষণ শ্রীতারকব্রহ্ম নাম কর্ণে দিয়া মহা মাদনী শক্তিবিশিষ্টা একটী অনুরাগ-গায়ত্রী-মন্ত্র কর্ণে দিলেন। পরে শুনিলাম ইহা কাম গায়ত্রী—কিন্তু আমি বুঝিলাম—ইহা প্রেম-গায়ত্রী। ইহা শ্রীকৃষ্ণানুরাগের মহামন্ত্র—ইহা মহামাদনী শক্তির উদ্বোধক। এই গায়ত্রী

দশবারমাত্র জপের পরে আমার হৃদয়ে যে কি মহাপ্রেমরসের সঞ্চার হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশিত হইবে না।

অতঃপরে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ উপাসনার বীজ মন্ত্র লাভ করিলাম। কিন্তু সেরূপ তো মূর্ত্তিমানরূপেই আমার নয়নগোচরে উপনীত। সে আনন্দের কথা আর কি বলিব। আমি বুঝিতে পারিলাম আনন্দটি হৃদয়ের কোন বৃত্তি নহে—ইহা বস্তু। দয়াময় শ্রীগুরুরূপে আমাকে সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু দান করিলেন। তিনি আমাকে কিয়ৎক্ষণ সচ্চিদানন্দময় গৌরগোবিন্দ-প্রেমরসে নিমজ্জিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন করিলেন। অতঃপরে আমার কর্ণে যেই অপর একটি মহামন্ত্র দান করিলেন, সেই মন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণমাত্রই আমি স্পষ্টতঃ যাহা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিলাম, আমার হৃদয়-আকাশেও সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম—গুরুদেব আমার মস্তকে যে কোন সময়ে তাঁহার শ্রীকর স্পর্শে আমাকে আনন্দ-মূর্চ্ছা-পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, দীর্ঘকাল পরে সে ধ্যান-মূর্চ্ছা তিরোহিত হইল, দেহ একবারেই অবশ—দেখিলাম দয়াময় তাঁহার শ্রীকরকমলে এই বিবশার মস্তক স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। তখন আমার মস্তক তাঁহার শ্রীচরণযুগলে সহসা লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আমি নয়ন-জলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া বলিলাম,—দয়াময়, এ দাসীর প্রতি এত কৃপা। মহাযোগীর আরাধ্য ধন, প্রেমানন্দ-বিগ্রহ—তোমার এত কৃপা! এখন আমায় কি করিতে হইবে, এ পথে কিরূপে চলিতে হইবে তাহার উপদেশ করুন। তিনি তখন সংক্ষেপে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, দুই একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

গুরুদেবের উপদেশগুলি মুরলীর সুমধুর নিক্কণের ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে—সে অনেক দিনের কথা। এখনও তাহার ঝঙ্কার সেই রূপেই আমার প্রাণের স্তরে স্তরে বিরাজ করিতেছে। উহা এই :—

১। ইন্দ্রিয়-লালসা ও ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ও তাঁহার মাধুর্য্যে বিশ্বাস রাখিও। সরল ভাবে সত্য পথে চলিও, সাধন ভক্তির নিয়ম যথা সম্ভব প্রতি পালন করিও, ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তিতে ক্রমশঃ চিত্ত উন্নত করিও।

২। আমাদের এ জীবন সুখের জন্য নয়, ইহা পরীক্ষার স্থল। সাগরতরঙ্গের মত দুঃখের পর দুঃখ আসিবে, তাহাতে বিচলিত হইও না, ভয় করিও না ; নির্ভীক ভাবে ব্রজের পথে চলিও। শ্রীভগবন্নিবেদিত সাত্ত্বিক আহার্য্য গ্রহণ করিও।

৩। সংসার স্বার্থময়। স্বার্থের হানি হইলেই মানুষ উন্মত্ত হয়, হিতাহিত জ্ঞান হারায়, তখন অকার্য্য কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কিন্তু ইহাতে আত্মার অধোগতি হয়। জ্ঞান ও প্রেম আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম। তুমি আত্মার প্রেমধর্ম্মই সারধর্ম্ম জানিও। যেখানে ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসাও স্বার্থ সাধনের প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, সেখানে ভগবৎ প্রেম থাকে না।

আমি বলিলাম,—গুরুদেব আমার মনে হয়—ধর্ম্ম এক, তাহা কেবলই আপনার শ্রীচরণ পানে চেয়ে থাকা। ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝিতে পারি না।

গুরুদেব তদুত্তরে জানাইলেন তা বটে, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি ও আত্মা—এই সকল লইয়াই মানুষ। সুতরাং দেহের ধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাদি,— ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম দর্শন শ্রবণাদি, প্রাণের ধর্ম্ম দৈহিক বায়ুর কার্য্যাদি, মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প বিকল্পাদি, বুদ্ধির ধর্ম্ম বিচারাদি ও আত্মার ধর্ম্ম শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধপ্রেম। শাস্ত্রে বহু প্রকার উপদেশ আছে। তাহাও শুনিবার ও জানিবার বিষয়। তদনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। কেন না শ্রুতি স্মৃতি সদাচার প্রভৃতির বিধান বহির্ভূত আত্যন্তিকী ভক্তিও অনেক স্থলে চিত্তে বিশৃঙ্খলার

সৃষ্টি করে। তোমায় ক্রমশঃ আমি সেই সকল জানাইব। এখন তুমি যাহা বুঝিয়াছ, তাহাতেই চিত্তটীকে দৃঢ় রাখিও। তাহাতেই এইরূপ লক্ষ লক্ষ উপদেশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। স্মরণ, মনন, অর্চ্চন, স্তব-পাঠ, ধ্যান তারকব্রহ্ম নাম জপ, ইষ্টমন্ত্র জপ ও ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কার্য্যগুলি নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত। নিষ্ঠার সহিত এই সকল কার্য্য করিও।

শ্রীপাদ গুরুদেব অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত এই সকল উপদেশ দিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাই আমার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল—আমার নয়নে চির দিনই পুণ্য পবিত্রতা ও অসাধারণ প্রেম ভক্তির সুনির্ম্মল সমুজ্জল ছবিরূপে বিরাজমান। আমার হৃদয়ে এই মহাপ্রেমের ছবি চির দিনের তরে অঙ্কিত করিয়া দিয়া অল্প কয়েক ঘণ্টা এখানে থাকিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এত সত্বরে যে তিনি চলিয়া যাইবেন ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি সত্য সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার নয়ন-জলপূর্ণ আর্ত্তনাদে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল না। তিনি বলিলেন—আমি সর্ব্বদা তোমার প্রত্যক্ষের বিষয় হইব না, ধ্যানে আমায় দেখিও এবং ভাবিও। কখন কখন দেখিতে পাইবে। শ্রীভগবান্ তোমার আত্মার কল্যাণ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। আমি চরণ ধরিয়াও রাখিতে পারিলাম না। আমি সেই সময় হইতেই বুঝিয়া লইলাম—ধ্যানের ধন প্রত্যক্ষ হইলেন বটে, জীবনের গতিও নির্দ্দিষ্ট হইল বটে, জীবনের পথও নিষ্কণ্টক প্রসরতর ও সমুজ্জল হইল বটে কিন্তু ভীষণ তীব্র বিরহ এ জীবনের চির সহচর হইল। এখন কেবলই এ জীবনে মুহুর্মুহু দীর্ঘ শ্বাস—নিরন্তর হা-হুতাশ—কেবলই হাহাকার,—

কি করিব হায় হায় কোথা তাঁরে পাব।
এদিন যামিনী আমি কেমনে যাপিব॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুদ্দেশ

শ্রীগুরুদেবের প্রস্থানের পরে আমার যে কি দশা হইল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করার শক্তি আমার নাই। সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ, এই মাত্র বুঝিয়া লউন যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে এক গুরুদেব ভিন্ন আমার নিজের বলিয়া আমার আর কিছুই নাই—এই ধারণা আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। এই অবস্থায় তাঁহার অদর্শনে আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার শোকের একটা সমষ্টি অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। পুত্র-শোকাতুরা মাতার ন্যায়, পিতৃশোকাতুরা অনাথা বালিকার ন্যায়, ভ্রাতৃশোকাতুরা ভগিনীর ন্যায়, পতিশোকাতুরা সদ্য বিধবা নব বধূর ন্যায়, সুহৃদ্‌বিরহী সুহৃদের ন্যায়—আমি সমগ্র জগৎ আঁধার দেখিতে লাগি-লাম—আমার দেহবন্ধ শিথিল হইল, হৃদয় অবসন্ন হইল, তুষের অনলের ন্যায় চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন শূন্য-শূন্য বোধ হইতে লাগিল, এমন ভরপুর আনন্দ এক নিমিষেই শোকের বিষাদে ডুবিয়া গেল। আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। তীব্র বিরহে কখন কখন মূর্চ্ছার মত হইতে লাগিল। আমি পিতৃমাতৃ-হীনা সুহৃদ্‌বান্ধবহীনা। পিপাসায় মরিলেও একবিন্দু জল আমার মুখে দিবে এমন লোক নাই—ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করার লোক নাই—সে রূপ লোকের আমার প্রয়োজনও ছিল না। যদিও কোন লোক আসিয়া আমার কি হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিত, তাহা উৎপাত বলিয়া আমার মনে হইত। সোজা কথায় বলিতাম শরীর ভাল নয়। তাহাতেই তাহারা নীরবে চলিয়া যাইত।

এই অবস্থায় আলো অপেক্ষা অন্ধকারকেই আমি ভাল মনে করিতাম—অন্ধকারই আমার গুরু-ধ্যানের সহায় হইত। রক্ত মাংসের দেহ, একেবারে দীর্ঘ উপবাসে থাকিতে পারিতাম না—সহজে যাহা পারিতাম তাহাই প্রস্তুত করিয়া শ্রীগুরুগোবিন্দের ভোগ দিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিতাম। শ্রীগুরুর আদেশমত তাঁহার প্রদত্ত উপাসনা গ্রন্থ দেখিয়া নিয়ম-রক্ষার জন্য সময় মত যৎকিঞ্চিৎ উপাসনা করিতাম। কিন্তু আমার মূল উপাসনা হইয়া দাঁড়াইল—সেই প্রেম-প্রতিভা-সমুজ্জল শ্রীগুরুর শ্রীমুখ-মণ্ডলের ধ্যান—কি সুন্দর, কি মধুর, কি পবিত্র প্রেম-রসের উদ্দীপক—সেই মুখ খানি! হরি হরি—ঐ শ্রীমুখ-মণ্ডলের ধ্যানই আমার মরণ, জীবনের সম্বল। আমি জ্ঞানহীনা, ভজন-সাধনহীনা অবলা অনাথা। জগতে আমার আর যে কিছুই নাই। আমি কেবল ঐ ধ্যানেই বিভোর থাকিতাম—কত কথা মনে উঠিত, আবার আপন মনেই নিভিয়া যাইত। আমি একাকিনী বিরলে বসিয়া আমার জীবিত-বল্লভ প্রাণেশ্বরের ধ্যান করিতাম—করিতাম বলি কেন—এখনও করি। এযে বিরহের জীবন—সাক্ষাৎ সন্দর্শন আর কতক্ষণ ঘটে—কেবলই একটানা অদর্শন—হরি হরি—এযে কি ভীষণ মরুভূমি—আপনারা যাহারা মরুভূমির নাম শুনিয়াছেন, তাহার ভীষণ অবস্থার কথাও পাঠ করিয়াছেন—কিন্তু বিরহতপ্ত এই হৃদয়ের তুলনায় তাহা কিছুই নহে।

গুরুদেবের প্রথম অদর্শনের নিদারুণ আঘাতে আমার হৃদয় যেন চুড়মার হইয়া গেল। বজ্রাঘাতে গিরিশিখর বিদীর্ণ হয়—লোকে তাহা দেখিতে পায়—পুত্রশোকাতুরা জননীর, এবং পতিশোকাতুরা বাল বিধবার করুণ রোদনে সান্ত্বনার জন্য লোক সমাগম হয়, তাহা লোকের নয়ন-গোচর হয়, প্রশমনের পথ পায়—চখের জলে, করুণ বিলাপে সে শোক

বাহির হওয়ার পথ পায়—কিন্তু আমার এ পাষাণ চাপা শোকের কথা বলিবার নয়, বুঝাইবার নয়—জানাইবার নয়, জানাইলেও কেহ বুঝিঁতে পারিবে না—ইহার জন্য সমবেদনার হৃদয় দেখিতে পাইলাম না।

এই ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। শ্রীগুরুদেবের আদেশ-অনুসারে শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-পূজা, শ্রীগৌরগোবিন্দ পূজা শ্রীরাধা-গোবিন্দ-পূজা—স্তব পাঠ, মালা জপ, সায়ং সন্ধ্যায় আরত্রিক ইত্যাদি বিধান মত কার্য্য করি, কিন্তু তাহা নামমাত্র; প্রাণটা কেবল শ্রীগুরু-ধ্যানেই বিভোর থাকে।

"নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
কানু অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥"
"কি করিব কি হইবে সোয়াস্থ না পাই।
আন্‌ছান্ করে প্রাণ, হায় কোথা যাই॥"

নিদাঘের শুষ্ক পুকুরের ক্ষীণপ্রাণ শফরীর ন্যায় প্রাণ রাখাই আমার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। শ্রীগুরুদেবের খবর দেয়, এমন লোক নাই; কেই বা তাঁহার খবর রাখিবে? কোথাও তো তিনি স্থির থাকেন না—ইচ্ছামত যথাতথা গমনাগমন করেন। মনে হয় কত জন্মের পুণ্য ফলে সেই অসাধনের চিন্তামণি ক্ষণেকের তরে দেখা দিয়াছিলেন। আর কি তাঁর দেখা পাইব, আর কি তাঁর সংবাদ পাইব?

তিনি কোথায় কখন থাকেন, তাই বা কে জানে? জানিলেই বা আমার এ উপকার কে করিবে? কে গুরুদেবের সন্ধান বলিয়া দিবে, বলিয়া দিলেই বা আমি কি করিতে পারিব—তাঁহাকে আমি কি পত্র লিখিতে পারিব—লিখিলেও সে পত্র কি তাঁহার হস্তগত হইবে, হইলেও কি তিনি তাহা পাঠ করিবেন? তাঁহার অনন্ত কার্য্য; অনন্ত ভক্ত। আমি কোথাকার এক তুচ্ছ কীট—আমার কথা কি তাঁহার মনে আছে

তাঁহার লক্ষ লক্ষ ভক্ত। শত শত রাজা মহারাজ যাঁহার দাস, শত শত রাণী মহারাণী যাঁহার দাসী—আমি অবলা অনাথা পথের ভিখারিণী হইয়া কোন্ সাহসে তাঁহার নিকট পত্র লিখিব? লেখারই বা আমি কি জানি?

এইরূপ শত শত ভাবনায় আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সখী নাই সঙ্গিনী নাই, সহচরী নাই—মনের বেদনা জানাইবার সুহৃদ নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিব এমন কেহই নাই। রাত্রিতে জগৎ নীরব হইয়া যায় কিন্তু আমার চক্ষে ঘুম নাই। ছাদের উপরে পড়িয়া আকাশের দিকে তাকাই—চাঁদ উঠিলে ঘরের বাহির হইতে পারি না—চাঁদ দেখিলে প্রাণ অস্থির হয়—ভয়ে ভয়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করি। কেন এমন হয়, বলিতে পারি না, চাঁদ দেখিলেই প্রাণ আনচান করে। বরং অন্ধকার ভাল—অন্ধকার খুব ভাল। আঁধার রাতে নীলাকাশে শত শত তারা ফোটে। আমি অনিমেষ নয়নে তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকি,—আর পাগলিনীর মত তারাকে ডাকিয়া বলি, ওগো তুমি অত উচুতে আছ, আমার প্রাণের আরাধ্য গুরুদেব কোথা আছেন, বলিতে পার কি? তুমি কথা বলিবে না তাহা জানি, কিন্তু কিরণের ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দাও তিনি কোন্ দিকে আছেন—পূর্ব্বে কি দক্ষিণে, পশ্চিমে কি উত্তরে? তারার কিরণ-রেখায় আপন মনে বুঝিয়া লই তিনি যেন এখন উত্তর দিকে আছেন—উত্তরে কোন্ স্থানে—বোধ হয় কপিলাশ্রমে যাইয়া শিষ্যগণকে তত্ত্বোপদেশ দিতেছেন—আমার কথা কি তাঁহার মনে আছে? তিনি কখন বা কপিল-পতঞ্জলি, গোতম-কণাদ ও জৈমিনি-বাদরায়ণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচারে শিষ্যগণের মনোরঞ্জন করেন, কখনও ক্যাণ্ট্ হিগেল্ মিল, স্পেন্সার প্রভৃতির দার্শনিক তত্ত্বের কথা তুলিয়া আধুনিক লোকদের কুতর্ক খণ্ডন করেন। কখনও ফিজিক্স,

ফিজিওলজী, কেমিষ্ট্রী সাইকোলজী, বোটানী বাইওলজী জুলজী জিওলজী- সোসিওলজী, প্যাথলজী মেটেরিয়া মেডিকা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অপরা বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেও মহাযোগী, জ্ঞানী ও ধ্যানী। লোকে তাহাকে সর্ব্ব-বিদ্যায় সুপাণ্ডিত বলিয়াই জানে। কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব ও রস-তত্ত্বই নাকি তাঁহার প্রধানতম শিক্ষাদানের বিষয়। লোকের মুখে তাঁহার যে সকল গুণের কথা শুনিয়াছি, আমি প্রত্যক্ষ সেরূপ দেখি নাই। এ সকল কথায় তাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বলিয়া জানা যায়। কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমামৃতরসময় শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রতম অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন কীটাণুকীটের প্রতি তাঁহার যে এই দয়া, ইহা কেবল অসা-ধারণ ঔদার্য্য-মাধুর্য্য গুণেরই পরিচায়ক। কিন্তু এ জন্মে বা কোটি কোটি জন্মে আর কি কখনও তিনি আমায় দেখা দিবেন ?

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥

সুদুর্ল্লভ ইন্দ্রাদির দুরগম্য যে শ্রুতির
মুনিদের সরবস্ব ধন,
সেই গোপী-প্রেম-সার ভক্তের মাধুর্য্যাধার
আর কি দিবেন দরশন ?

শ্রীরূপের এই "প্রাণ-গৌরাঙ্গ" আর কি আমায় দর্শন দিবেন ? শ্রীমৎ দাস রঘুনাথের হৃদয়োন্মাদক প্রেম-সুধাসিন্ধুর পূর্ণচন্দ্র আর কি আমায়

দেখা দিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুকে প্রেমসমুদ্রের সুধাতরঙ্গে উন্মত্ত করিয়া তুলিবেন ?

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

আর কোটি জন্মেও বুঝি আমার সে সুদিন আর ফিরিয়া আসিবে না ! হরি হরি, আমি এখন কি করি, কোথা যাই—আমি কিছুতেই হে প্রাণ স্থির রাখিতে পারি না।

এইরূপে দেড় মাস কাল কাটিয়া গেল। একদিন বিকাল বেলায় কুটীরের বারন্দায় বসিয়া নীরবে নীরবে কাঁদিতেছি,—চখের জলের বিরাম নাই। আট বৎসরের একটি বালিকা আমার মুখের দিকে চাহিয়া সম দুখিনীর ন্যায় সুমধুর ভাষায় বলিল,—মাসী মা, তোমার কি হয়েছে, অসুখ করেছে ? আমি তোমার গায় হাত বুলাইয়া দিব, তোমার কি হয়েছে মাসী মা ? আমি বলিলাম না মা কিছুই হয় নাই।

"তবে কাঁদ্‌ছো কেন ?"

"আমার আপনি চখের জল পড়ে।"

"না মাসী মা, তোমার কি হয়েছে বল"

আমি আর কোন উত্তর দিলাম না, পাষাণ-চাপা ফোয়ারার পাষাণ সরিয়া গেলে যেমন অদম্য বেগে জলের প্রবাহ উৎসারিত হয়, আমার অবস্থা তখন সেইরূপ দাঁড়াইল।

এমন সময় বাহির হইতে একটা শব্দ আসিল 'ওগো তোমাদের পত্র আছে গো।" আমাকে কেহ কখন পত্র লেখে না, কাহারও পত্রের আশাতে আমি ছিলাম না। বাড়ীওয়ালাদের পত্র এসেছে মনে

করিয়া বালিকাটিকে আনিতে বলিলাম, সে পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি হাতে লইয়া মাটিতে রাখিলাম। বালিকা বলিল "মাসীমা কার পত্র" ? আমি ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া আবার পত্র খানা হাতে লইলাম—দেখিলাম খামের উপরে আমারই নাম। লেখাগুলি মুক্তার মত। আমাকে কে পত্র লিখিবে—ত্রিসংসারে আমার যে আপন বলিতে কেহই নাই—এ জীবনে কেহ আমাকে কখনও পত্র লিখে নাই। যখন পত্র খানায় আমারই নাম এবং এই বাড়ীরই ঠিকানা, তখন একটু সন্দেহভাবে পত্র খানা খুলিলাম। খুলিয়া দেখি—এক সুদীর্ঘ পত্র। পত্র খানি কাশ্মীর ঋষভআশ্রম হইতে প্রেরিত। পত্রের শেষ পৃষ্ঠের নিম্নভাগে লিখিত আছে "চির শুভাশীর্ব্বাদক শ্রীগুরুদেব।"

ইহা দেখা মাত্র আমার দেহ প্রথমতঃ স্তম্ভিত ও অবশ হইয়া পড়িল। এ কি ? এযে আমার নামে গুরুদেবের পত্র ! আমি অভাগিনী পথের ভিখারিণী—আমার নামে ত্রিভুবনপাবন গুরুজী মহারাজের কৃপা পত্র ! নয়ন-জলে নয়ন পূর্ণ হইতে লাগিল। কিছুকালের জন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কম্প ও রোমাঞ্চ অনুভূত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরিলাম। পত্র লইয়া ছাদের উপরে গিয়া পড়িতে বসিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

ঋষভ-আশ্রম

১৯২৮ শক ২৫শে আষাঢ়

শ্যাম-সোহাগিনি—দুই মাস হইল তোমার কোন খবর লইতে পারি নাই। তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহর্ষিগণের তপস্যা-স্থান ভৃগুক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে কতিপয় তীর্থদর্শন ও সাধুসঙ্গ-সম্ভোগ করিয়া গঙ্গোত্তরী দর্শনে গিয়াছিলাম। আজ তিন দিন হইল কাশ্মীরের ঋষভাশ্রমে আসিয়াছি, এখানকার সাধু ঋষিগণের অনুরোধে বোধ হয় এখানে দু'একদিন থাকিতে হইবে। স্থানটী অতি মনোরম। কাশ্মীরের উপত্যকা স্বভাবতঃই অতি সুন্দর। এই আশ্রমটী কাশ্মীরের উত্তর দিকে একটী স্বচ্ছ-সলিল হ্রদের উপরে। এই হ্রদের উত্তর দিকে হিমালয়ের সানুপ্রদেশ। রজতশুভ্র তুষারমণ্ডিত হিমালয় পর্ব্বত শেখর এখানে প্রায় ২৭০০০ ফিট উচ্চ। হ্রদটী পাহাড়ের বক্ষে বিরাজিত, সুনীল সুস্নিগ্ধ সলিলে আতটপূর্ণ হ্রদের তটে আশ্রমের তিন দিকে সমুন্নত চির হরিৎ দেবদারু তরুমালা। অন্যান্য পার্ব্বত্যবৃক্ষেরও অভাব নাই। এই তপোবন দেখিলে প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের কথা সহসা মনে উদিত হয়। তরুলতায়, ফুলে ফলে আশ্রমটি চির বসন্তের একটি নিত্য লীলা-কুঞ্জ। বৃক্ষের শাখায় শাখায় কলকণ্ঠ বিহগগণের কল-কাকলি। আশ্রমে আসিয়াই তোমার কথা অধিকরূপে মনে পড়িল। এই পুণ্য পবিত্রতাময় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় আশ্রমটী দেখিলে অবশ্যই তোমার মনে অতীব আনন্দের উদয় হইত। এই স্থানটী

গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান হইতে প্রায় সাতশত মাইল দূরে। [illegible]র ন্যায় কুসুম-কোমলা বালিকাদের পক্ষে এই স্থান অতীব দুর্গম। কাশ্মীরের হ্রদগুলির মধ্যে এই হ্রদটীই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম এবং সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। স্থির প্রশান্ত আতটপূর্ণ অগাধ সলিলের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য নাস্তিকের প্রাণেও ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়। এখানকার মনুষ্যগণের অঙ্গের গঠনও সুন্দর। সকলেরই শরীরের বর্ণ শুভ্র—ঋষিগণের অনেকেই বৃদ্ধ, তাঁহাদের মস্তকের কেশকলাপ রজত-শুভ্র, আবক্ষ লম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রু তরঙ্গায়িত হইয়া বক্ষে দোদুল্যমান্। ইহাদের বিনয়ে সৌন্দর্য্যে ও সুমধুর মৃদু ভাষায় স্বভাবতঃই ইহাদের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। এই আশ্রমের দশ মাইল পশ্চিমে একটী পল্লীগ্রামে আমার জন্মস্থান—সে গ্রামটী সাধু সদ্ব্রাহ্মণগণের বাস স্থান। এখানে এখন আমার আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই নাই। তথাপি গত কল্য জন্ম-স্থানটী দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম; দুই একটি বৃদ্ধ লোক আমাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহারা যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। আমার শিষ্যগণের মধ্যে সেখানে পণ্ডিত বিভূতি রাম ও বেদান্তবিদ্ সাধু ধনঞ্জয় মিশ্র এখন এই তপোবনে ঋষভ-আশ্রমের অধ্যক্ষ রূপে অবস্থান করিতেছেন।

এই আশ্রমের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত তোমাকে জানাইতেছি। ইহার নাম ঋষভ-আশ্রম। পুরাণের মধ্যে ঋষভের নাম শুনিয়া থাকিবে। শ্রীমদ্ভাগবত একখানি প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ। এই পুরাণের পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেবের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এদেশে নাভি নামক এক জন সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মেরু দেবী। এই মেরুর গর্ভে ও নাভির ঔরসে ঋষভ দেবের আবির্ভাব হয়। ইনি আদি নারায়ণের এক অবতারবিশেষ। কপিল ও বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় ইনিও একটি অবতার। বুদ্ধদেব যেমন বুদ্ধগণের আদি আচার্য্য, কপিলদেব যেমন

সাংখ্য সম্প্রদায়ের আদি গুরু, কথিত আছে ঋষভ দেবও তেমনি জৈন-সম্প্রদায়ের আদি তীর্থঙ্কর। ইনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ঋষভ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঋষভ দেবকে পুত্ররূপে পাওয়া নাভির পুণ্য ফল। একটি প্রাচীন শ্লোক ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে যথা :—

কেন তৎকর্ম্ম রাজর্ষে র্নাভেরন্বাচরেৎ পুমান্।
অপত্যতামগাদ্ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্ম্মণা ॥

অর্থাৎ এমন জন কে আছে, যে জন রাজর্ষি নাভির কার্য্যের অনুসরণ না করিবে? ইঁহার শুদ্ধ কর্ম্মপ্রভাবে স্বয়ং হরি পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি দেহের গৌরবে, সাহস ও শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রভাবে এবং বিবিধ সদ্‌গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম করা হইয়াছে,—ঋষভ।

ঋষভ দেবের এক শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র—মহাযোগী ভরত। ইহারই নামানুসারে এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। অপর নব ভ্রাতা নব যোগেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম যথা—

কবি র্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রাথ দ্রমিল শ্চমসঃ করভাজনঃ ॥

ইঁহারা মহাভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধ-প্রারম্ভে বসুদেব নারদ-সংবাদে ইঁহারা ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ করেন।

এই ঋষভদেবের সংক্ষিপ্ত উপদেশাবলী আমি তোমায় শুনাইতেছি। তোমার চরিত্র গঠনের জন্য ঋষভের উপদেশ তোমাকে বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। যাঁহারা ভক্তিরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন তাহাদের জন্য এই শ্রেণীর জ্ঞান বৈরাগ্যের উপদেশ প্রয়োজনীয় নহে। প্রাথমিক সাধকগণের পক্ষেই এই উপদেশ প্রয়োজনীয় হইবে।

ঋষভদেব তাঁহার সন্তানদিগকে উপলক্ষ করিয়া জগতের জীবদিগের প্রতি বলিতেছেন :—

১। এই সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ কামভোগের জন্য নহে। কামভোগ বিষ্ঠাভোজী শূকরদেরও আছে। তাহারাও আপন প্রিয় বস্তু আহার করে, তাহারাও সন্তানোৎপাদন করে, তাহারাও ক্ষুধা পাইলে আহার করে, নিদ্রা পাইলে ঘুমায়। কামভোগ কেবল দুঃখের হেতু। মানুষের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রধানতমকার্য্য ভগবৎ-উপাসনা। তজ্জন্য সাধনাই এই মানবদেহের প্রধানতম কর্ত্তব্য। শাস্ত্রীয় সাধনা প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; তাহাতে সংসার দুঃখ নষ্ট হয় এবং ব্রহ্মানন্দ-রূপ সুখলাভের উপায় হয়। কামভোগ কেবলই সংসার-দুঃখের হেতু ; ভগবানের উপাসনাই মোক্ষ-লাভের উপায়।

২। মহৎসেবাই বিমুক্তির দ্বার, স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গই অজ্ঞানজনিত মোহের দ্বার। এই অজ্ঞান বা মোহ বা অবিদ্যা হইতেই সংসার-দুঃখ ঘটিয়া থাকে। মহৎসেবাই যখন বিমুক্তি-লাভের উপায়, সুতরাং মহান্ পুরুষগণের লক্ষণ কি তাহাও জানা আবশ্যক। তজ্জন্য ঋষভদেব বলিতেছেন—যাঁহারা সমচিত্তাদিগুণযুক্ত তাঁহারাই মহান্। সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, নিন্দায় প্রশংসায় যাহাদের চিত্ত সমঅবস্থায় থাকে, তাঁহারাই সমচিত্ত। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সম্বন্ধে বহুল উপদেশ আছে। সর্ব্ববস্তুতেই ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। এই জ্ঞান হইতেই সমচিত্ততা জন্মে।) এতাদৃশ মহাপুরুষগণের চিত্ত প্রশান্ত। ইঁহারা ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণের বৃত্তিগুলিকে পরাভূত করিয়া প্রশান্ত অবস্থায় বিরাজ করেন। ইঁহারা ক্রোধহীন তিতিক্ষু ক্ষমাশীল, সকলের সুহৃদ্ পরোপ-কারী ও সদাচারী। কাম-স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ এই উভয়ই চিত্তকে ভগবৎচিন্তন হইতে দূরে রাখে। 'স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ' পদের প্রকৃত অর্থ—মৈথুন-

(১) গুরুভক্তি (ভগবান্‌ই গুরু, ভগবান্‌ গুরুরূপে কৃপা করেন, সুতরাং ভগবানে ও গুরুতে অভেদ দৃষ্টিতে ভক্তি রাখিবে।) (২) গুরুর অনুবৃত্তি বা গুরুসেবা। (৩) বিষয়ে বিতৃষ্ণা। (৪) দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। (শীত গ্রীষ্ম নিন্দা প্রশংসা লাভালাভ ভাল মন্দ প্রভৃতিকে দ্বন্দ্ব বলা হয়। এই দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সাধুচরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ) সংসারকে দুঃখময় বলিয়া জানা। (৬) তত্ত্বজিজ্ঞাসা, (৭) কাম্যকর্ম্মের প্রবৃত্তি-বিচার, (৮) তপস্যা (অর্থাৎ একাদশ্যাদি ব্রত-পালন; দেহ অপটু হইলে উপবাস অব্যবস্থেয়)।

১১। (৯) ভগবদ্ভক্তিজনক কর্ম্ম, (১০) ভগবৎকথা শ্রবণ, ১১) ভক্তসঙ্গ, (১২) ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন, (১৩) নির্ব্বৈর, (১৪) সমত্ব, (১৫) ক্রোধত্যাগ, (১৬) দেহ গেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-ত্যাগ।

১২। (১৭) আত্মযোগ,, (১৮) নির্জ্জন স্থানে বাস, (১৯) প্রাণেন্দ্রিয়-চিত্ত-বিজয়, (২০) সৎশ্রদ্ধা, (২১) ব্রহ্মচর্য্য, (২২) কর্ত্তব্যের অপরিত্যাগ, (২৩) বাক্য সংযম।

১৩। (২৪) সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন। বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানযোগ—এই পঁচিশটী সাধনায় ধৃতিশালী ও উদ্যমশালী সত্ত্বযুক্ত ব্যক্তি সমাধি দ্বারা অবিদ্যা-গ্রন্থি ছেদন করিবেন।

ঋষভদেব তাঁহার পুত্র দিগকে উপলক্ষ করিয়া এই পারমহংস্য ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। এই উপদেশে ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান ও জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি এই উভয়েরই সমাবেশ আছে। বলা বাহুল্য ইহা গার্হস্থ্যাশ্রমের ধর্ম্মোপদেশ নয়। পরমহংসগণের জন্যই এই সকল উপদেশ। সুতরাং এই উপদেশের প্রথমেই যে স্ত্রীসঙ্গের দোষ বলা হইয়াছে, তাহা গার্হস্থ্য ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট স্ত্রীর প্রতিও প্রযুক্ত। সেই মিথুন ভাব হইতেই পুত্র কন্যা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া সংসার প্রপঞ্চিত হয়। মিথুন মূলক স্ত্রীসঙ্গম

নিষ্কলঙ্ক ভগবদ্ভজনোন্মুখজনগণের যে অবশ্য পরিত্যাজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ" ইত্যাদি যে অষ্টবিধ মৈথুনের উল্লেখ আছে, বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গেও সে দোষ বর্ত্তমান থাকে এবং উহা যে হৃদয়-গ্রন্থির একটি প্রধান হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে বক্তব্য—ঋষভদেব যে পারমহংস্য-ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর শুষ্ক পারমহংস্য ধর্ম্মও নহে—উহা ভাগবত পারমহংস্যধর্ম্ম—উহার সীমা জ্ঞান মিশ্র ভক্তি পর্য্যন্ত।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায়—সূত্রাকারে ভক্তির যে উচ্চতম লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে উন্নত উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তির গন্ধও স্পষ্টতঃই অনুভূত হয়,—

মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।

গীতা ৯ম শ্লোক ১০ম অধ্যায়।

ইহা হইতে ব্রজরসময়ী ভক্তির আভাস পাওয়া যায়। শ্রীভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ উদ্ধবের নিকটে এই ভাবের গোপী-চরিত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতার উপদেশ সার্ব্বভৌমিক। ঋষভদেবের উপদেশে সেরূপ ভক্তির সন্ধান থাকিলেও উহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয় নহে। ঋষভ সম্প্রদায়ের সাধুগণের মধ্যেও ব্রজরসের সাধনা দৃষ্ট হয় না।

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমৎ উদ্ধবকে বলেন হে উদ্ধব, অক্রূর আমার অগ্রজসহ আমাকে যখন মথুরায় আনয়ন করেন তখন মদেকচিত্তা ব্রজবালারা আমার তীব্র বিরহ ব্যাধিতে অভিভূত হইয়া অন্য কিছুতেই সুখ লাভ করেন নাই। আমার সঙ্গে যখন সুদীর্ঘ

রাস-রজনীসমূহ সম্ভোগ করিতে ছিলেন, তখন সেই সুদীর্ঘ নিশাসমূহ তাঁহারা ক্ষণকালের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ক্ষণার্দ্ধ মাত্র সময়ও তাঁহাদের নিকট এক কল্পকালের ন্যায় অফুরন্ত ক্লেশজনক অনুভূত হইতেছে—

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে।

অর্থাৎ তখন আমাতেই তাঁহাদিগের বুদ্ধি আসক্ত ছিল। ইঁহারা আমা ভিন্ন আর কিছুই জানেন নাই। আমার বিরহাবস্থায় কেবল আমার চিন্তা ভিন্ন তাঁহাদের আত্মদেহ, আত্মীয়স্বজন পত্যাদি বা ইহকাল পরকাল ইহার কোন বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। মুনিগণ যেমন নিখিল বাহ্যজ্ঞান-বিহীন হইয়া সমাধিমগ্ন হন,—নদীগুলি সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে যেমন উহাদের নাম রূপের কোনও সন্ধান থাকে না, আমার বিরহে এই ব্রজবালাগণের কেবল একমাত্র আমার ধ্যানে সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অন্য চিন্তা তো দূরের কথা, তাঁহাদের দেহস্মৃতি বা আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা শুদ্ধ জ্ঞানজাত নহে, বিচার-বিতর্কপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান জাত নহে বা যোগজ্ঞানলব্ধও নহে। বিশুদ্ধ প্রেম হইতেই গোপীদের এই মহাভাবের আবির্ভাব।

প্রশ্নোপনিষদে পারমহংস্য ভাবসাধনায় কতকটা এই ভাবের উল্লেখ আছে, যথা :—

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে; এবমেবাস্য

পরিদ্রষ্টু্রিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি; ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষকলঃ ইত্যেবং প্রোচ্যতে; এষ কলোঽমৃতো ভবতি। ৬ষ্ঠ প্রশ্ন।

গোপীগণও সেই রসিক-শেখরের রস-সাগরে এইরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মবিসর্জ্জনে আর পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।

চির-সিমন্তিনি, তোমার সম্বন্ধেও আমার এই ধারণা। তোমার এই দৃঢ় ব্রজরসোপসনার ফলে তুমিও প্রেমানন্দরসময় শ্রীগোবিন্দের ব্রজলীলায় উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইবে।

এখানকার পরমহংসগণের উচ্চতম লক্ষ্য—নির্ব্বিকার পরমব্রহ্ম। এই ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবৎতত্ত্বের অনেক নিম্নে। রসময় রসিক-শেখর-শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব তো অনেক উপরের কথা। উহা হইতে আর যে কোন উচ্চতত্ত্ব আছে, তাহা এতাবৎ শুনিতে পাই নাই।

এখানকার পরমহংসগণের আচার ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে তোমায় জানাইতেছি। ঋষভদেবের উপদেশাবলীর যতটুকু সংক্ষিপ্ত অর্থ বলা হইয়াছে তাহাতে সূত্রাকারে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে ধারাবাহিনী প্রণালী বুঝিতে পারিবে না। এখানে অতি সংক্ষেপে এই শ্রেণীর পরমহংসদের বিবরণ তোমায় জানাইতেছি—

জাবাল উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা, জনকরাজ শ্রোতা। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সম্পাদন করিয়া গৃহী হইতে হয়, গার্হস্থ্য সমাপনান্তে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়, ইহার অবসানেই প্রব্রজ্যা। এই প্রব্রজ্যাই পারমহংস্য ধর্ম্মে প্রবেশের আদি সোপান। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করা

৩

যাইতে পারে। এই অবস্থায় যজ্ঞ-বিশেষের অনুষ্ঠানে যজ্ঞোপবীত ও শিখা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে নিগ্রন্থ হইতে হইবে ; কাহারও কিছু পরিগ্রহ করিবে না, সতত ব্রহ্ম ভাবনামগ্ন হইতে হইবে, চিত্তকে সর্ব্বদাই বিষয় চিন্তা হইতে বিমুক্ত রাখিতে হইবে। লাভালাভকে সমান জ্ঞান করিতে হইবে, যথাকালে ভিক্ষার জন্য বাহির হইতে হইবে, সাধু সজ্জনের আলয় হইতে ভিক্ষা লইতে হইবে। সাত বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে হইবে, এক বাড়ী হইতে ভিক্ষা লইবে না, গৃহস্থের রন্ধনাদি শেষ হইলে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে, অগ্নি স্পর্শ করিবে না।

শ্রীমদ্ভগবতগীতায় ও শ্রীভাগবতে এই সকল সাধনার অতি বিস্তৃত উল্লেখ আছে যথা,—ভগবানে নিত্য যুক্ততা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সর্ব্বভূতে হিততা, ইন্দ্রিয়সংযম, সমত্ব, অভ্যাসযোগ, ভগবৎকর্ম্ম পরতা, কর্ম্মফলত্যাগত্ব, ধ্যান, সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টৃত্ব, মৈত্রতা, কারুণ্য, নির্ব্বৈরত্ব, নিরহস্কারত্ব, সমদুঃখ-সুখত্ব, ক্ষমিত্ব, সন্তোষ, দৃঢ়নিশ্চয়তা, আত্মসংযম, অনুদ্বিগ্নতা, অনুদ্বেগকরতা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, অনপেক্ষত্ব, শৌচ, দক্ষতা, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগিত্ব, রাগদ্বেষাদির অভাব, শুভাশুভ পরিত্যাগিতা, মৌন, অনিকেতত্ব, স্থিরমতিত্ব, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, আচার্য্যোপসনা, বৈরাগ্য, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষাদর্শন, নির্জ্জন স্থানে বাস, জনসমাজে বিরক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অদ্রোহ ইত্যাদি বহুল সদ্‌গুণ ভিন্ন পরমহংসত্বপদ লাভ করা যায় না।

উপনিষদ্‌গুলির স্থানে স্থানে, মন্বাদি উনবিংশ সংহিতায়, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহে সবিস্তাররূপে পরমহংস ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। শ্রীভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পারমহংস-ধর্ম্ম-কথনে

আজগর মুনির বৃত্তান্তটী সবিশেষ জ্ঞাতব্য। এই অধ্যায়ে সামান্যরূপে পারমহংস্য-ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আজগর উপাখ্যান দ্বারা উহা বিশেষ-রূপে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়েও উহা পুনর্ব্বার আলোচিত হইয়াছে। সপ্তমের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতেও পারমহংস ধর্ম্মের কথা তোমায় কিঞ্চিৎ বলিব।

পরমহংস পদের অর্থটি তোমাকে প্রথমতই বলা উচিত ছিল। এখন বলিতেছি। হংস অর্থ হাঁস—পক্ষি-বিশেষ। হংস জলচর ও স্থল চর—উভয় চর ও বটে, কিন্তু প্রধানতঃ জলচর। সেইরূপ পরমহংস-গণকেও এ জগতে বিচরণ করিতে দেখা যায় বটে কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম-সরোবর-বিহারী। তাঁহাদের আত্মা শঙ্খের ন্যায়, কুন্দ-কুসুমের ন্যায়, বা পদ্মের মৃণালের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক শুভ্র,—শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ শুভ্র।

ফলতঃ হংস শব্দের অন্য অর্থ যতি, ভিক্ষু চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী। হংস শব্দের আরও বহুল অসাধারণ অর্থ আছে, যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, সম্রাট্ ইত্যাদি। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় আছে। বায়ু সংহিতায় কুটিচক বহূদক হংস পরমহংস এই চারি প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। পরমহংস কেবল প্রণব জপ করেন। অপর তিন শ্রেণী গায়ত্রী জপ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহারও পরমহংসদের ন্যায় নহে; আচার-ব্যবহারে প্রচুর পার্থক্য আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য হইতে দশনামী সম্প্রদায় গুলি প্রবর্ত্তিত হয়। যথা,—গিরি, পুরী, ভারতী, সাগর, অরণ্য, সরস্বতী, তীর্থ, আশ্রম, বন ও পর্ব্বত। প্রাণতোষিণী গ্রন্থে অবধুত প্রকরণে ইঁহাদের এবং অবধূতদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

যিনি যতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই পরমহংস-পদ বাচ্য। ভারত-বর্ষীয় আর্য্যগণের গ্রন্থাদিতে পরমহংসগণের স্থান অতি উচ্চ। পূর্ব্বোল্লিখিত সদ্গুণরাশিবিশিষ্ট মহাত্মারই পরমহংস। ইঁহাদের চরিত্র

অতি মধুর; মহাপণ্ডিত হইয়াও বালকের ন্যায় সরল। ইহাদের হৃদয়ে দম্ভ বঞ্চনা কপটতা বা ক্রোধের লেশ মাত্রও নাই—মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই প্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভাব। এইরূপ পরমহংস এখন অতি বিরল। ইহারা আশ্রম স্থাপন করেন না, এক রাত্রির অধিক কোথাও থাকেন না।

শ্রীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পরমহংস ধর্ম্মের নিয়ম আছে তাহা হইতে সংক্ষেপতঃ তোমায় কয়েকটী কথার মর্ম্ম এখন জানাইতেছি—

কেবল দেহটি ছাড়া আর সকলই ত্যাগ করিয়া যতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, কেবল বাহ্য বস্তুর ত্যাগ নয়,—মনোগত নিখিল কামনা-ত্যাগই প্রধান ত্যাগ। মনের লয় না হইলে কামনার উদয় হইবেই হইবে। যজ্ঞের অনলে যজ্ঞোপবীত ভস্মীভূত করা তো কঠিন নয় কর্ম্মত্যাগও সন্ন্যাস নয়,—কিন্তু মনের বাসনা দগ্ধ না হইলে কর্ম্মফল-বাসনার অবসান হয় না। এই ধর্ম্মে এই সাধনা অতি কঠিন। সন্ন্যাসী এক রাত্রির অধিক কোন গ্রামে থাকিবেন না, যতটুকু বস্ত্রে কেবল গুহ্যের আচ্ছাদন হয় কেবল ততটুকু বস্ত্রে কৌপীন করিবেন, নিরাশ্রয়ভাবে আত্মরাম হইয়া একক বিচরণ করিবেন—সঙ্গে শিষ্য ভৃত্যাদি লইবেন না, তাঁহাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ শান্ত ও নারায়ণপরায়ণ হইতে হইবে। স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণ সকল বস্তুতেই আত্ম-দর্শন ও পরব্রহ্ম দর্শন করিতে হইবে। কার্য্য কারণের পর পারে অবস্থিত অব্যয়—আত্মায় এই বিশ্বের দর্শন করিতে হইবে। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মতত্ত্ব তমসাবৃত অবস্থায় থাকে, স্বপ্ন জাগরণেও উহা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, বিশেষতঃ বদ্ধজীব ও পরব্রহ্মের ঐক্য দর্শনই বা কি প্রকার সম্ভবপর হয়;—এই নিমিত্ত ইহার উপায় বলা হইয়াছে যে এই উভয়ের সন্ধি-অবস্থায় আত্ম-তত্ত্ব দেখিতে হইবে। সন্ধিতে তমো বা

বিক্ষেপের আশঙ্কা নাই। আত্মদর্শী এই অবস্থায় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মতত্ত্ব দর্শন করিবেন। যোগগ্রন্থে লিখিত আছে—

নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে যো ভাব উপজায়তে।
তং ভাবং ভাবয়ন্ নিত্যং মুচ্যতে নেতরো যতিঃ॥

নিদ্রার আদিতে ও জাগরণের অন্তে যে ভাব উপস্থিত হয় যতি সেই ভাবের ভাবনা করিয়া বদ্ধ অবস্থা হইতেই মুক্তিলাভ করেন। মোক্ষ ও বন্ধকে ইহারা মায়া মাত্র মনে করেন।

চারুশীলে, এস্থলে তোমার জন্য কতকগুলি বাক্যমাত্র লিখিত হইল বটে। কিন্তু এখন তুমি ইহার কিছুই ধারণা করিতে পারিবে না। জগতের খুব অল্প লোকই এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ। এইরূপ সাধনার ইহা একটা উচ্চতম অবস্থা,—কেবল তাহার সন্ধান দেওয়ার জন্যই তোমাকে ইহা জানাইলাম। এই সাধনা তোমার লক্ষ্য নহে।

মৃত্যুর কামনা করিতে নাই। পরমহংস কেবল কালের প্রতীক্ষায় থাকিবেন। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকে, এদেহ লইয়া এজগতে সেইরূপ অবস্থান করিতে হইবে। জন্ম মৃত্যু ও কাল-প্রভাব-সাপেক্ষ। ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন অপর বিদ্যায় মন দিবে না এবং সেই সকল অপরাবিদ্যা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না। ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত আর সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যা নামে খ্যাত। জ্যোতিষাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। জল্পাবিতণ্ডাদিনিষ্ঠ কুতর্কে যোগ দিবে না। বাদবিবাদের কোনও পক্ষে অবলম্বন করিবে না, বহু শিষ্য করিবে না, বহুগ্রন্থ অভ্যাসও শাস্ত্রব্যাখ্যা-উপজীবিকা এই উভয় নিষিদ্ধ। মঠাদি স্থাপন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে না। শান্ত সমচিত্ত মহাত্মা যতিগণের মঠাদি প্রায়শঃই ধর্ম্মের হেতু হয় না। তবে লোক-সংগ্রহার্থ কেহ কেহ

মঠাদি করিয়া থাকেন। ইহার অন্তরূপ ব্যাখ্যাও আছে। ইহারা জ্ঞানী হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় এবং বালকের ন্যায় বিচরণ করেন। সুপণ্ডিত হইয়াও মূকের ন্যায় ব্যবহার করেন। এই সম্বন্ধে বেদান্ত বাক্য এই যে "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"। এইরূপ আরও শ্রুতি বাক্য দেখিয়া বাদরায়ণ এ সম্বন্ধে একটি সূত্রও বলিয়াছেন তাহা এই—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ"। আরও একটি সূত্র আছে তাহা এই :—সহ কার্য্যান্তর বিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ"—

ব্রহ্মসূত্র ৪৩৪-৩।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে মুনি বালকের ন্যায় কামাচারাদি করিতে পারিরেন। কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করার জন্ত এবং বালকবৎ সরল ব্যবহার করার জন্তই এই বিধান। সাধু চরিত্রে স্বতঃই এই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শ্রীভাগবতের এই অধ্যায়ে একটি উপাখ্যানে পরমহংস ধর্ম্ম পরিস্ফুট করা হইয়াছে।উহা প্রহ্লাদ ও আজগর সংবাদ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাটি এইরূপ—

প্রসন্নসলিলা কাবেরী-তটে সহ্যাদির সানুদেশে এক মুনি বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা কেহ জানে না কিন্তু লোকেরা অজাগর মুনি বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিত। সম্ভবতঃ তিনি অজাগরের ন্যায় ঐ সহ্য পর্ব্বতের সানুদেশে পড়িয়া থাকিতেন তাই লোকেরা তাঁহাকে আজগর মুনি এইনাম দিয়াছিল। সহ্যাদ্রিটি আমি দেখিয়াছি, ইহা মলয় পর্ব্বতের উত্তরে ; এখন ইহাকে পশ্চিমঘাটগিরি বলে। ইহার পশ্চিমেই সুনীল সুগভীর আরব সাগর উত্তাল তরঙ্গমালায় বিরাজ-মান। কাবেরীর সুশীতল সুস্নিগ্ধ প্রবাহ সহ্যাদির চরণ তলে লুটাইয়া লুটাইয়া হৃদয়ে ভক্তি রসের সঞ্চার করিয়া দেয়।

আজগর মুনি যে স্থানে বসিয়া সাধনা করিতেন, সে স্থানটি আমি ভাগ্যক্রমে দর্শন করিয়াছি। সহ্যগিরির শিখরদেশে একটি সমতল ক্ষেত্রে ইহার আশ্রম ছিল। এখনও এই পর্ব্বত-সানু চিরহরিৎ সমুচ্চ-তরুরাজি দ্বারা শোভিত, এখনও কলকণ্ঠ বিহগগণ মধুরকণ্ঠে বৃক্ষের শাখায় শাখায় উপবেশন করিয়া মৃদু মধুর রবে আজগর মুনির সাধন-মহিমা কীর্ত্তন করে। নিম্নদেশে পুণ্যতোয়া কাবেরী-প্রবাহ রজতরেখার ন্যায় দৃষ্ট হয়। কাবেরী সলিল স্বভাবতঃই সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ। ইহা উহার বাহ্যধর্ম্ম। কিন্তু উহার অন্তর্ধর্ম্ম ভক্তিরস-সঞ্চারণ। শ্রীভাগবতেও ইহার প্রমাণ আছে। একাদশ ৫ম অধ্যায় ৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক এখন আজগর আখ্যান বলা হইতেছে—কোনও সময়ে ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ লোক তত্ত্বাদি জানিবার জন্য কতিপয় আমাত্যসহ এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে এই মুনিকে দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন মুনি কাবেরীতটে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ ধূলিমাখা, কিন্তু এই ধূলিমাখা দেহ হইতে সমুজ্জ্বল তেজ উদ্ভাসিত হইতেছে। অনেক লোকের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনি এই মুনির পরিচয় সম্বন্ধে অনেককে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার কর্ম্ম কি, ইনি কোন্ বর্ণজাত, কোন্ আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, ইহার আশ্রম ধর্ম্মের চিহ্নাদিই বা কি,—কেহই তাহা বলিতে পারিল না। ইঁহার আকার প্রকার দেখিয়া ইনি যে সেই প্রসিদ্ধ যোগী, তাহা কেহই জানিত না। মহাভাগবত প্রহ্লাদ মস্তক লুটাইয়া ইহাকে প্রণাম করিলেন, অভ্যর্থনা করিয়া ইহার বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়, আপনার দেহ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন উহা উদ্যমশীল ভোগীর দেহের ন্যায় পুষ্ট, কিন্তু আপনাতে তো কোনও উদ্যম দেখিতে পাই না। এই জগতে উদ্যমশীল

ব্যক্তিদেরই ধন হয় এবং ধনী লোকেরাই ভোগী হন। আপনি উদ্যমহীন আপনার বিত্তই বা কোথায়, ভোগই বা কি প্রকার প্রাপ্ত হন? ভোগবানের দেহই পুষ্ট হয়, ভোগ বিনা তো দেহ পুষ্ট হয় না। ভোগ ভিন্ন আপনার দেহ কি প্রকার পুষ্ট হয়? আপনি শয়ান থাকেন, আপনার কোনও চেষ্টা দেখিনা সুতরাং আপনার অর্থ কোথায়,—যাহা হইতে ভোগ প্রাপ্ত হন? ভোগ নাই অথচ আপনার দেহ পুষ্ট দেখিতেছি—ইহা কি প্রকারে হয়? যদি গোপনের বিষয় না হয়, তবে বলুন—শুনিতে কৌতুহল হইতেছে।

বিদ্যার্জ্জনে অসমর্থ হইলেও এ জগতে মনুষ্যগণ অর্থ উপার্জ্জনের যত্ন করে। কিন্তু আপনি তো অসমর্থ নহেন বরঞ্চ বহুগুণে গুণান্বিত—আপনি বিদ্বান্, দক্ষ, সুচতুর—আপনার বাক্যও অতি মধুর—উহা শুনিলে সকলে তুষ্ট হয়। অর্থোপার্জ্জনেরও সকল গুণই আপনাতে আছে। অথচ আপনি কিছুই করেন না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কর্ম্মকরে, তাহার কার্য্য দেখিয়াও আপনি ভালমন্দ কিছু না বলিয়া—উহার অনাদর করিয়াই যেন আপনি শয়ান থাকেন।

নারদ বলিলেন দৈত্যপতি প্রহ্লাদের এই প্রশ্ন শুনিয়া এবং তাঁহার অনুরোধ-বাক্যামৃতে বশীভূত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মহামুনি প্রহ্লাদকে বলিলেন—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ—আপনি জ্ঞানিগণের সম্মানিত। আপনাকে আর কি বলিব? এই জগতে লোকদের চেষ্টাও উপরতির বিষয় গুলি অধ্যাত্ম চক্ষুর দ্বারা দর্শন করুন। ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয়গত ভাবে বিরাজ করেন। সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন তিনিও সেইরূপ স্বীয় জ্ঞান ভক্তি দ্বারা তাঁহার অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন।

আমি জীবস্বরূপ; ভব-বাহিনী তৃষ্ণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া

নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া নানা কার্য্য করিয়া বেড়াইতে ছিলাম। সেই সকল কামনা কখনও পরিপূরিত হইবার নহে। কর্ম্মফলে বিবিধ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কখন দেবযোনি বা মনুষ্য যোনিতে জন্মিয়া স্বর্গের দ্বার বা মোক্ষের দ্বার পাইয়াছি, কখনও বা তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখ প্রাপ্তির জন্য এবং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য অনেক কার্য্য করিয়া দেখিলাম তাহাতে সুখ-প্রাপ্তি বা দুঃখ নিবৃত্তি হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল. এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং প্রবৃত্তি পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তি পথ অবলম্বন করিয়াছি। নিবৃত্তি পথে থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম, সুখই জীবের স্বরূপ। সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিলে স্বতঃই সুখ প্রকাশ পায়। মনঃস্পর্শ হইতেই সর্ব্ব প্রকার ভোগ লালসার উদয় হয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য ঘটিলেই মনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাই আমি জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রাই ভাল মনে করি—ঘুমাইয়াই দিন যামিনী অতিবাহিত করি। বাস্তবিক ইহা নিদ্রা নয়, ব্রহ্মে চিত্ত রাখিয়া সর্ব্বদা নিরুদ্যম থাকি। যদি বলেন,—তাহা হইলে আপনার ভোগ কিরূপে হয়—তদুত্তরে বলিতেছি উহা প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ স্বতঃই হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার বলেন :—

বলমানন্দ ওজশ্চ সহজ্ঞানমনাকুলং।
স্বরূপাণ্যেব জীবস্য ব্যজ্যন্তে পরমাদ্বিভোঃ ॥

অর্থাৎ বল, আনন্দ, ওজ, সহ অনুকুল জ্ঞান—এই সকলই জীবের স্বরূপ। ইহারা পরম বিভু চৈতন্য হইতে প্রকাশ পায়।

আত্মাই যে পরম সুখের আধার, জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া ইন্দ্রিয় ভোগকে সুখজনক মনে করে। তাহারই ফলে জীবকে পুনঃপুনঃ বিঘোর সংসার-যাতনা ভোগ করিতে হয়। নিজের সম্মুখেই যে তৃণ-শৈবালাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন সুশীতল সুনির্ম্মল পানীয় জল আছে তাহা

দেখিতে না পাইয়া মৃগতৃষ্ণিকার জলের অন্বেষণে ভ্রমণ করে কিন্তু সে মায়া মরীচীকায় জল কোথায়। অবশেষে মরীচিকার প্রচণ্ড তপ্ত বালুকার অনন্ত যাতনা ভোগ করিয়া মুগ্ধ মৃগ প্রাণ হারায়। জীব কর্ম্মায়ত্ত দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ পাইতে ইচ্ছা করে এবং সেই ইচ্ছানুসারে পুনঃ পুন তদ্রূপ কার্য্য করিয়াও সুখ প্রাপ্ত হয় না বা দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারে না। জীবগণ ত্রিতাপ তাপে তাপিত। এই ত্রিতাপের মূলোচ্ছেদক সাধন না করিয়া কেবল কষ্টার্জ্জিত ধন দ্বারা এবং কামভোগ দ্বারা তাহার দুঃখসমুহের নিবৃত্তি হয় কি? লুব্ধ অজিতাত্ম ধনীদের ক্লেশ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সর্ব্বদাই তাহাদেয় নিত্য আশঙ্কা বর্ত্তমান—চোরের ভয়ে শান্তিময়ী রজনীতে তাহাদের নিদ্রা পর্য্যন্ত হয় না। রাজার ভয়, দস্যুর ভয়, শত্রুর ভয়, স্বজনের ভয়, পশুপক্ষীর ভয়, অর্থীদের ভয়, ভিখারীদের ভয় এবং নিজের দেহ হইতে ভয়—সর্ব্বদাই প্রাণের ভয় ও অর্থের ভয়। প্রাণ ও অর্থের জন্যই এ জগতের যত শোক মোহ ভয় ক্রোধ, অনুরাগ, ক্লৈব্য ও শ্রমাদি। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি এই উভয়ের স্পৃহা রাখিবেন না।

মধুকর এবং মহাসর্প এই উভয়েই আমাদের উত্তম গুরু। মধুকরের নিকট বৈরাগ্য এবং মহাসর্পের নিকট পরিতোষের শিক্ষা পাইয়াছি। সর্ব্ব কামনা হইতে বৈরাগ্য লাভ করার শিক্ষা আমরা মধুকরের নিকট প্রাপ্ত হই। মধুকর কত ক্লেশ করিয়া মধু সঞ্চয় করে কিন্তু এই মধু-সঞ্চয়ের ফলভোগী মধুকর হয় না। মানুষ মধুসঞ্চয়ী মধুকরকে নিহত করিয়া মধুচক্র লুণ্ঠন করে। শ্রমার্জ্জিত অর্থ উহার ভোগ্য হয় না, ইহা দেখিয়া কে আর সঞ্চয়-কামনা বা সঞ্চিত ভোগের কামনা করিবে?

অজগর সর্প নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, যদৃচ্ছাক্রমে যখন যাহা উহার মুখের নিকট উপস্থিত হয় তাহা গ্রহণ করিয়াই সত্ত্বশীল নিরুদ্যম

মহাসর্প পরিতুষ্ট থাকে। আমি উহার নিকটে এই শিক্ষালাভ করিয়া উদ্যমে মনোযোগ করি না, বহু লাভের আশা করি না। যাহা পাই তাহাতেই ধৈর্য্যশীল হইয়া পরিতুষ্ট থাকি। স্বাদুই হউক, অস্বাদুই হউক, অল্প হউক আর বেশী হইক, পুষ্টিকারক হউক বা নাই হউক, যখন যেমন আহার্য্যের জোটনা হয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকি। তাহা কেহ শ্রদ্ধার সহিত, আবার কেহ বা অশ্রদ্ধার সহিত প্রদান করেন, উহা দিনে উপস্থিত হউক, অথবা রাত্রিতে প্রাপ্ত হই,—কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট না হইয়া উহা ভোজন করি। পরিধান বস্ত্রের কথাও এইরূপ—ক্ষৌম হউক, বহু মূল্য বস্ত্র হউক, কিংবা পথে পতিত ছিন্ন বস্ত্র হউক, কিম্বা বৃক্ষের বল্কল হউক অবিচারে তাহা পরিধান করি। ফলতঃ আমি প্রারব্ধ-ভোগী ও নিত্যতুষ্ট।

অপিচ আমি কখনও ভূতলে কখনও তৃণ শয্যায়, কখনও বা ধূলির উপরে শয়ান থাকি। আবার কেহ যদি প্রাসাদে দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় আমার শয়নের ব্যবস্থা করেন তখন তাহার ইচ্ছায় সেইখানেই শয়ন করি। কখনও সুস্নাত, সুগন্ধিতে অনুলিপ্ত, সুবস্ত্র ও মাল্যালঙ্কার ভূষিত হই, কখনও ধূলিমাখা দেহে বিবস্ত্র ভাবে বিচরণ করি. কখন বা অপরের প্রযত্নে রথে হস্তিপৃষ্ঠে বা অশ্বে আরূঢ় হইয়া ভ্রমণ করি, আবার কখনো বা অলক্ষ্য ভাবে গ্রহবৎ দিগম্বর ভাবেও ভ্রমণ করিয়া থাকি। বিষম স্বভাব লোককে আমি নিন্দাও করি না, প্রশংসাও করি না। ইহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুময় বলিয়া মনে করি।"

ব্রজলক্ষ্মি,—আজগর মুনি এইরূপে তাঁহার নিজ চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ার পরেই ইঁহারা যে রূপ ভাবে জীবন যাপন করেন এখানে অতি সংক্ষেপে তাহাই তোমাকে জানাইলাম। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত সাধনা অতীব

কঠোর। সে এক অলৌকিক যজ্ঞ। এই যজ্ঞে দেহের আহুতি, ইন্দ্রিয়ের আহুতি প্রাণের আহুতি, মনের আহুতি, বুদ্ধির আহুতি বিজ্ঞানের আহুতি, অবশেষে পরম ব্রহ্মানলে আত্মার পূর্ণাহুতি দিয়া পরমহংস এই সাধন যজ্ঞের উদ্‌যাপন করেন। নদী যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে, পরমহংসও সেইরূপ নামরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানলে আত্ম আহুতি দিয়া চরম নির্ব্বাণ লাভ করেন। শেষের অবস্থা—"নিরিন্ধন ইবানলঃ"—অগ্নি যতক্ষণ ইন্ধন (জ্বালানিকাষ্ঠ) প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ জ্বলে—ইন্ধনের শেষ অণুটুকু দগ্ধ করিয়া অবশেষে যেমন উহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়—পরমহংসও সেইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞে সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

উপৈতি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষঃ।

প্রাকৃত তত্ত্বসমূহের অনুলোমে এই দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টি—মানবের সৃষ্টি। ইহাকে ক্রমবিকাশ বা Evolution বলা যায়। আবার প্রতি-লোমক্রমে স্থূলভূত সূক্ষ্ম ভূতে, সূক্ষ্মভূত তন্মাত্রায়, তন্মাত্রা অহঙ্কারে অহঙ্কার প্রধানে, প্রধান ব্যক্ত প্রকৃতিতে, ব্যক্ত প্রকৃতি অব্যক্ত প্রকৃতিতে, অবশেষে অব্যক্ত প্রকৃতি পরব্রহ্মে লয় করিয়া যোগী বা পরমহংস ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এইরূপে দেহ-প্রপঞ্চের নাশ হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না। নাশ পদের অর্থ—অদর্শন মাত্র—"নাশঃ কারণে লয়ঃ" স্বায় কারণে লীন হওয়াই নাশ। Electron বা পরমাণুর ধ্বংস হয় না। কিন্তু দ্রব্যবস্তু প্রতি লোম ক্রমে কারণে লীন হয়। ইহাকেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান Involution বলেন।

নিকুঞ্জ বিহ্বে,—তোমার সাধনার চরম লক্ষ্যের ধারা অন্য ভাবে—প্রায় এইরূপ। গোপী-ভাব-তটিনীর আকুল প্রবাহ কুলকিনারা ভাসাইয়া নানা রসের উত্তাল তরঙ্গে রঙ্গভঙ্গে শ্যাম-সাগরের অভিমুখে

ব্যাকুল ভাবে উধাও ধাবিত হয়,—অবশেষে সেই শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-শ্যাম-রস-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। তখন :—

না সো রমন না হাম রমণী
দুঁহভাব মনোভাব পেশল জানি॥

এই অচিন্ত্য অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে,—তখন "নির্ধূত ভেদ ভ্রমং" বাক্যে প্রেমিক ভক্তগণ এই ব্যাপার প্রকাশ করেন। উহা প্রেমিক ভক্তের অভিবাঞ্ছিত ধন। ভক্তির চরম সীমায় যে তত্ত্ব স্ফুরিত হয়, তাহাতে উপাস্য-উপাসকের ভেদ-অভেদ অচিন্ত্য বলিয়াই অনুভূত হয়; উহা বহু সাধনার পরে বুঝিতে পারিবে।

মহাসাগরের তরঙ্গের ন্যায় চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়, তখন দেশকালপাত্রের জ্ঞানহারা হইয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমার সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করিতে যতটা ধৈর্য্যের প্রয়োজন, হয়তো ততটা ধৈর্য্য তুমি রাখিতে পারিবে না। সমস্তটা একবারে পড়িতে না পার,—ক্রমশঃ পড়িও। কিন্তু তোমার চিত্ত তো এ ভাবে গঠিত নয়—এ পত্রে তোমার বিরক্তির কারণও হইতে পারে। সেরূপ হইলেও ধৈর্য্য সহকারে এই পত্র খানি ক্রমশঃ পাঠ করিও। ব্রহ্মজ্ঞানের পরেই বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি উপজাত হয়। যদি বল গোপী-দের কোথা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সে ভাগ্য, শিব-শুক-নারদাদি কাহারও নাই। যাঁহার অঙ্গ প্রভাই পরম ব্রহ্ম,—সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিজস্ব বল্লভ, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা কি? অন্যান্য ভাগ্যবান্ ভক্তগণেরও সৎসঙ্গ-প্রভাবেই তাদৃশী ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তোমার পক্ষেও তাদৃশ সুবিধা আছে, তাহা সত্য। কিন্তু বলা বাহুল্য তোমাকে উপলক্ষ করিয়া লোকশিক্ষার জন্যই এতগুলি কথা লিখিত হইল। নচেৎ 'কেবল

ঋষভ-আশ্রমের বর্ণনা টুকু লিখিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারিতাম। আশাকরি ইহা দ্বারা তুমি অপরের উপকার করিতে পারিবে। পরমহংস ধর্ম্মটা কি তাহাও জানিয়া রাখা ভাল। পরম হংসদের বহু সম্প্রদায় আছে, সেই সকল সম্প্রদায়ের নাম আচার ও ব্যবহারেরও পার্থক্য আছে। তোমার কৌতুহল হইলে পরে জানাইব। তুমি সর্ব্বদা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম-সাধনম্" দেহই ধর্ম্ম-সাধনার মূল। তুমি দেহের প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা কর, ইহাই আমার ধারণা। তোমার ভাবগতি দেখিয়া আমার সেইরূপ বোধ হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিও—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভম্"
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।

লেকে বলে "নরতনু ভজনের মূল"। তুমি নিষ্ঠাময়ী ভজনশীলা শ্রীভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। আমি দুই একদিনের মধ্যেই অন্যত্র যাইতেছি; আমায় পত্র লিখিও না; পত্র পাওয়া অসম্ভব। শ্রীভগবানের প্রেরণায় কখন্ কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু তোমার কুশল-সমাচার পাইবার আমার অন্য উপায় আছে। তোমায় সততই মনে রাখিব—সতত মঙ্গল কামনা করিব। সুদীর্ঘ পত্রখানি বিরক্তির কারণ হইলে ক্ষমা করিও। প্রেমময় শ্রীগোবিন্দ তোমার অভিলাষ পূরণ করুন।

চির শুভাশীর্ব্বাদক
শ্রীগুরুদেব।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃপণের ধন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোনওরূপে পত্রখানা একবার পড়িয়া লইলাম। পড়িবার সময়ে কি-জানি-কেন অনেক বার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছিল এবং দেহ অবশ হইয়া যাইতেছিল। পত্রে যে কি কি কথা লেখা আছে তাহাতে তত মন দিই নাই—সেই মুক্তামালার ন্যায় অক্ষর গুলিতে কেবলই শ্রীগুরুদেবের প্রেম-প্রতিভা-সমুজ্জ্বল মুখখানি এবং লাবণ্যময় সুকোমল শ্রীকর কমলের কথা মনে পড়িতেছিল। তিনি যে শ্রীকর-সরোজে মূর্চ্ছা-পতনের অবশতা হইতে আমার মস্তক রক্ষা করিয়াছিলেন, যে শ্রীকর-কমল আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, এই পত্র খানি সেই শ্রীকর-কমলে লিখিত—পত্রখানি তাঁহারই শ্রীকরপদ্মের সুমধুর গন্ধে আমোদিত—আমি অনেকবার পত্র খানি মস্তকে লইলাম, অনেক বার বক্ষে ধারণ করিলাম—তখন নয়ন-জল কোন মতেই সম্বরণ করিতে পারি নাই, পাছে বা চক্ষের জল গড়াইয়া পত্রে পড়ে, তাহাতে বা পাছে কোন শ্রীঅক্ষরের অঙ্গ-হানি হয়—এই ভয়ে বসনের অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া পত্রখানা বুকে করিয়া রাখিলাম।

এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যার আঁধার নামিয়া আসিল, আকাশটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, দুই এক ফোঁটা জলও পড়িতে লাগিল। আমি অবশ দেহে কোন প্রকারে সাঁঝের আলো জ্বালিলাম—শ্রীমন্দিরে ঝাট দিয়া প্রাত্যাহিক নিয়মমত গঙ্গা-জলের ঝিটা দিয়া ধূনচিতে ধূনা জ্বালিয়া আরত্রিক-আরাধনা শেষ করিলাম। নিয়মমতই শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরী-ঝাঝরি বাজিল ;—নিয়ম মত সকল কার্য্যই হইল, কিন্তু আমার মন তখন

ঐ পত্রে ছিল। পত্র খানার মর্ম্মটা কোনরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলাম, গুরুদেবের প্রগাঢ় উপদেশ গুলির প্রতি মনোযোগ দিয়া পড়া হয় নাই—মনে করিলাম এই পত্রই যখন আমার দিন যামিনী যাপনের সম্বল, একবার কেন দ্বিতীয় পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত যখন উহাই শতবার পাঠ করিতে হইবে, সেজন্য আর ব্যস্ততা কি? কিন্তু তিনি যে আমায় পত্র লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন এ যাতনা আমার অসহ্য হইল। আমি রান্নাঘরে গিয়া ঐ কথা মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গার্হস্থ্য কার্য্যের কিছু কিছু করিতে লাগিলাম। না করিলে নয়—আমার কাজ আর কে করিবে? নিজের জন্য নয় কিন্তু গৃহস্বামী ও তাহার লোক জনদের সেবার যোগাড় করিতেই হয়। তখন আবার শয়ন ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিয়া আবার পত্রের শেষটা পড়িলাম। সুধু যে আমায় পত্র লিখিতে মানা করিয়াছেন তা নয়—তিনি আর যে কবে পত্র লিখিবেন, আদৌ লিখিবেন কি না এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই—তখন আমার শোকের বেগ দ্বিগুণ বাড়িল। আমি রান্নাঘরে ভাতের হাড়ি চাপাইয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এত দুঃখের মধ্যেও একটা সুখের বিষয় এই ছিল যে আমার রোদনে বাধা দিবার কেহ নাই—জিজ্ঞাসা করারও কেহ নাই; এ অবস্থায় কেহ কোন কথা বলিলে আমার উৎপাতের কারণ হইত। আমি নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে নীরবে যাতনায় দেহমন প্রাণ ঢালিয়া দিলাম। যন্ত্রের মত রান্না করিলাম, রান্নাবাড়া দেওয়া থোয়ার কাজ শেষ করিলাম। আহারে রুচি হইল না। গুরুদেব লিখিয়াছেন দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিও তাঁহার কথা রক্ষা করার জন্য শ্রীবিগ্রহের সান্ধ্য শীতলী ও দুগ্ধ প্রসাদ কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া শয়ন গৃহে যাইয়া ভারতবর্ষের ম্যাপ লইয়া বসিলাম। ম্যাপ খুলিয়া কাশ্মীর স্থানটা কোথায় দেখিয়া লইলাম ঋষভ-আশ্রমটীও কল্পনা-চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। একটি পয়সার মাপে

ইঞ্চির মাপ ঠিক করিয়া দেখিলাম, ঋষভ-আশ্রম আমার এই কুটীর হইতে নিতান্ত কম পক্ষেও দুই হাজার মাইল দূরে; হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল! হা হরি, আমার প্রাণের প্রাণ,—চক্ষুর চক্ষুর,—আত্মার আত্মা আমার ছেড়ে দুই হাজার মাইল দূরে? আর কি এজন্মে সেই আত্মবন্ধু—হৃদয়ের একমাত্র সুহৃদকে দেখিতে পাইব? তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"গুরু কর্ণধারম্" সেই সুযোগ্য কর্ণধার বিহনে এ জীবন-তরীর এখন কি গতি হইবে? ভাবিয়া দেখিলাম—পত্রই সম্বল! কিন্তু তাহারও তো নিশ্চয়তা নাই—কখন লিখিবেন—লিখিবেন কি না, তাই বা কি করিয়া বুঝিব? আবার বাক্স খুলিয়া পত্র বাহির করিলাম। উহার শেষের দিকে লিখিত আছে—"আমি তোমায় মনে রাখিব"—এই বাক্যটি আমার নিকটে মহাবাক্যের ন্যায় মনে হইল। গুরুদেব—সত্যসঙ্কল্প। তাঁহার বাক্যের একটি বর্ণও মিথ্যা নয়—তাঁহার এই মধুময় বাক্যটি আমার নিকটে অতীব আশ্বাস-বাক্যের মত সান্ত্বনাজনক বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তা হলে তিনি এ কাঙ্গালিনী পথের ভিখারিণীকে মনে রাখিবেন; তাহা হইলে অবশ্যই পত্র লিখিবেন। ইহাতে কিছু সান্ত্বনা পাইলাম। তখন তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া হরিনাম জপ করিতে বসিলাম। শ্রীনামজপে, যাতনাতেও কতকটা শান্তি পাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ পূরণ করাই—শ্রীগুরুদেবের উপদেশ। আজ অপরাহ্নে তাহা ঘটে নাই, কাজেই রাত্রিতে সেই সঙ্খ্যা পূরণ করিলাম। রাত্রি দুইটার পরে সংখ্যা-পূরণ হইল। মাদুরে শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না। পত্রখানা ভাল করিয়া পড়িবার জন্য মন ব্যাকুল হইতে লাগিল। চারি টার সময়ে উঠিয়া দীপ জ্বালিয়া আবার পত্র পড়িতে বসিলাম। রজত শুভ্র-তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের পাদদেশে প্রসন্নসলিল হ্রদ-তটে তপোবনের চিত্র হৃদয় জুড়িয়া বসিল; আর সেখানে ঋষভাশ্রমে গুরুদেবের সমুজ্জ্বল

৪

শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন—যেন প্রত্যক্ষ তাহা দেখিতেছিলাম। গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া আবার পত্র পড়িতে লাগিলাম—এমন বিভোর ভাবে পড়িতেছিলাম কোন সময়ে যে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। পরিচারিকা উঠানে আসিয়া ডাকিতেছিল, তাহাও শুনিতে পাই নাই। সে দরজায় আঘাত করায় আমি চমকিয়া উঠিলাম, দরজা খুলিয়া দিয়া গৃহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। ঋষভের বিবরণ পূর্ব্বেও আমি শ্রীমদ্ভাগবতে পড়িয়াছিলাম—কিন্তু তখন তেমন মনোযোগ দিয়া পড়ি নাই—উপদেশ গুলিতে তখন আমার মন কিছুমাত্রও বসিতে পায় নাই।

এই পত্র পাঠে উহার প্রত্যেক কথাই আমার ভাবিবার বিষয় হইল। উহার কোন কোন কথা একবারেই আমার জন্য নয়। আবার কোন কোন কথা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল। এই পত্রে গুরুদেব উপনিষদের কথা লিখিয়াছেন। কয়েক খানি উপনিষৎ, শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আমার নিকটেই আছে। কখন কখন উহা দেখিতাম। আমি নিজে এই সকল গ্রন্থ ক্রয় করি নাই। আমার পিত্রালয়ে একটি ব্রাহ্মণ-মহিলা ছিলেন। তাঁহার স্বামী কাশীতে কি কাজ করিতেন। ইনিও স্বামীর নিকটে থাকিতেন। এ ঘটনা আমার জন্মেরও পূর্ব্বে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ-মহিলা বত্রিশ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ইনি ব্রহ্মচারিণীভাবে স্বামার মৃত্যুর পরেও কাশীতে ছিলেন। ইঁহার সন্তান হয় নাই। কাশীতে অসুবিধা হওয়ায় দেশে ফিরিয়া আসেন। এখানেও কেহ ছিল না। ইনি সাধুশীলা সচ্চরিত্রা ও সুশিক্ষিতা ছিলেন।

আমি যখন বালিকা, তখন হইতেই ইনি আমায় বড় ভাল বাসিতেন আমার জননীর সহিত ইঁহার সখ্যভাব ছিল। আমি সর্ব্বদাই ইহার নিকটে

থাকিতাম। আমার বয়স যখন তের বৎসর, তখন ইনি বৃদ্ধা। এই সময়ে রোগান্বিতা হইয়া শয্যাগত হন। আমিই সেবা শশ্রূষা করিতাম। আমাকে ইনি শিক্ষা দিতেন ও কত উপদেশ দিতেন। সে ঋণ শোধের বিষয় নহে—আমি তাহার জীবদ্দশায় তেমন কিছুই করিতে পারি নাই। তবে রোগের সময়ে প্রাণপণে সেবা করিয়াছিলাম। আমার মাতা তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমাকে ইহার হাতে দিয়া পরলোকে গমন করেন। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে এক বৎসরেরই মধ্যেই ইনিও আমায় ছাড়িয়া স্বধামে গমন করিলেন। মৃত্যুর সময়ে আমাকে হাতে ধরিয়া বলিলেন—মা লক্ষ্মি, আমাদ্বারা তোমার কিছুই হইল না। শ্রীভগবান্ এখন আমায় এখান হইতে অন্যত্র লইতেছেন। আমার কিছুই নাই যে তোমায় দিয়া যাইব। এই গ্রন্থগুলি আমার প্রাণের ধন। ইহাই তোমায় দিয়া গেলাম—এগুলি যত্ন করিয়া রাখিও, উপযুক্ত বয়সে পড়িও, ইহাতে তোমার উপকার হইবে"—তিনি এই বলিয়া শ্রীভগবানের নাম করিয়া চিরতরে নয়ন নিমীলন করিলেন। আমি এক বৎসরের মধ্যে দুই বার মাতৃহারা হইলাম, শোকে শোকে জর্জরিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার প্রাণের সম্পত্তি—এই গ্রন্থ গুলি আমি যত্নে রাখিয়াছি। এখনও প্রতিদিনই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থগুলিকে প্রণাম করি। গুরুদেবের পত্রে এই সকল গ্রন্থের নাম দেখিয়া অনেক যাতনার মধ্যেও আমার একটুকু আহ্লাদ হইল। পত্র পাঠে মনে হইল, এই সকল গ্রন্থের মর্ম্ম কিছু কিছু অবগত হওয়াই যেন গুরুদেবের অভিপ্রায়। গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, আমার পাঠের কতকটা সুবিধা আছে। ব্রহ্মচারিণী মাতার কৃপায় গুরুদেবের অভিপ্রায় অনুসারে কিছু কিছু পাঠ করিবার সুবিধা আমার হাতেই আছে, ইহা মনে করিয়া আহ্লাদ হইল। প্রাতে শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরের পরে পত্র খানি অতি

উত্তমরূপে পড়িলাম। ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তসংযম করার উপদেশগুলি আমার প্রাণেরই কথা। গীতাতে এই সকল উপদেশ আছে। তথাপি গুরুদেবের উপদেশগুলি সরস ও সরলভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। অতঃপরে আমি খুব মনোযোগের সহিত কঠ উপনিষৎ, মুণ্ডক উপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ পাঠ করিয়াছিলাম। গীতা আমার নিত্য পাঠ্য। কিন্তু শ্রীপাদ গুরুদেবের দর্শনলাভের তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই সকল উপদেশের মর্ম্ম যদিও কতকটা জানিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু উহাতে আমার মনের তৃপ্তি হইত না—এখনও উহাতে ততটা প্রীতি লাভ করি না। প্রীতির পাঠ্য—আনন্দময়ের মাধূর্য্য-লীলা। কিন্তু গুরুদেবের এই পত্রে তাহার অতি সূক্ষ্ম উপদেশ বা ইঙ্গিত মাত্র দেখিতে পাইলাম। একটুকু চিন্তা করিয়াই আমি ইহার কারণ বুঝিলাম,—গুরুদেব বিশ্ব-স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নিয়ম অনুসারেই আমাকে গঠিত করিতে ইচ্ছুক। এই যে মানুষের দেহ ইহা কেবল কোমল পদার্থে গঠিত হইলে ইহার দাঁড়াইবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত থাকি না—কাজকর্ম্ম করা তো দূরের কথা। তাই তিনি কঠিন অস্থি দিয়া দেহের কাঠাম গঠন করিয়া কোমল পদার্থ দ্বারা উহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও লাবণ্য সম্পাদন করিয়াছেন। মানসিক শিক্ষার প্রক্রিয়াও সেইরূপ হওয়াই বৈজ্ঞানিক নিয়মসম্মত। বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অস্থি-পঞ্জরের উপরে প্রেম-ভক্তির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করা চাই ; তবে উহা—স্থায়ী হয়, কর্ম্মযোগ্য হয়। পারমহংস্যধর্ম্মের পাষাণবাঁধা জমীর উপর দিয়া,—জ্ঞান বৈরাগ্যের বাঁধা তটের ভিতর দিয়া—প্রেম-তটিনী প্রবাহিত করাই,—শ্রীপাদগুদেবের মহান্ উদ্দেশ্য। তাই পত্রে তিনি সেই আভাস দিয়াছেন। এই উপদেশ অবশ্যই প্রতি পালনীয় ও সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য।

কিন্তু সম্প্রতি আমার অবস্থা যে কিরূপ,—সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেব তাহা

বুঝিয়াছেন ; বুঝিয়াই লিখিয়াছেন,—"যদিও ইহা তোমার জন্ম নহে তথাপি সবিশেষ কারণে লিখিলাম।" ধন্ত দয়াময়, তোমার সর্ব্বজ্ঞতা, ধন্য তোমার অন্তর্দর্শিতা! শত ধন্ত তোমার করুণা! এই তুচ্ছ কীটের প্রতি তোমার এত করুণা!

করুণাময়ের কৃপা-পত্র খানিকে আমি কৃপণের সর্ব্বস্বধনের ন্যায় সযত্নে রাখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি না ; উহা একবার বাক্সে রাখিতেছি—আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই খুলিয়া দর্শন করিতেছি। মণিমুক্তার মোহনমালা অপেক্ষাও এই কৃপা-পত্রের অক্ষর গুলি আমার পক্ষে খুব অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাতেই যেন তাঁহার দর্শন পাইতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীগ্রন্থপাঠ—ভগবদ্গীতা।

হৃদয়ের যাতনা হৃদয়ে চাপা দিয়া থাকিতে হয়—আরতো কোন উপায় নাই। সংসারের কাজ দেখিতে হয়। ঘরে এমন কেহ নাই, যে একদিনের তরেও রান্নার কার্য্যটুকু করিয়া আমায় সাহায্য করে—নিজের দৈনিক আহ্নিক পূজা নিত্য কর্ম্মগুলিও করিতে হয়। ভক্তি-গ্রন্থপাঠও নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত—উহা গুরুদেবেরই আজ্ঞা। উপাসনার নিত্য ক্রিয়া শেষ করিয়া সংসার সেবা,—ইহার পরেই আমি গ্রন্থপাঠ আরম্ভ করি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মচারিণী মাতার চরণতলে বসিয়া গীতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম। আমি উহার কিছুই বুঝিতাম না—

তিনি সাদাসিধে কথায় কিছু কিছু উপদেশ দিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বসুমতী দৈনিক সংবাদ পত্রে কলিকাতা বাগ্‌বাজারের পূজ্যপাদ বিদ্যা ভূষণ মহাশয়ের গীতা সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন গীতা নামে ছোট বড় অনেক গ্রন্থ আছে, উহাদের সংখ্যা একশতেরও উপরে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত। আকারেও বড়। কিন্তু শ্রীভাগবতের শ্রীউদ্ধব গীতার আকার উহা অপেক্ষাও বড়। অথচ শ্রীমদ্ভগবদগীতাখানি সার্ব্বভৌমিক, উহা সর্ব্বসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য—উহার টীকার সংখ্যা তাঁহার মতে ৭৫ খানিরও উপরে। জগতে এমন সুসভ্য ভাষা নাই যে ভাষায় গীতার অনুবাদ না হইয়াছে। যে গ্রন্থের টীকার সংখ্যা এত অধিক, তাহা যে জন সমাজের কত আদরণীয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বেদান্তীরা বলেন ইহা বেদান্তেরই তিন প্রস্থানের অন্তর্গত এক প্রস্থান। প্রস্থান পদের অর্থ এই যে—যাহাতে কিছু স্থিত হয়। বেদান্তবাক্যগুলি যাহাতে স্থিত হইয়াছে তাহাই বেদান্তের প্রস্থান গ্রন্থ। উপনিষৎসমূহ (প্রধানতঃ দশখানি) শ্রৌত প্রস্থান; বেদান্ত সূত্র—ন্যায় প্রস্থান। এই বেদান্ত সূত্রেরও অনেক গুলি নাম আছে, যেমন—শারীরক সূত্র, ব্রহ্ম সূত্র, বেদান্ত সূত্র, শারীরক মীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা ইত্যাদি। ইহাতে বিচারপূর্ব্বক বেদান্তবাক্য সমূহের সিদ্ধান্ত সংস্থিত হইয়াছে এবং সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এই জন্য এই বেদান্ত সূত্র গ্রন্থকে ন্যায় প্রস্থান বলা হইয়াছে। ভগবদ্গীতা শ্রীভগবানেরই বাক্য। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় শ্রুতিবাক্যগুলিকে অনূদিত করিয়া বেদান্তবাক্য-স্মরণে এই গ্রন্থ প্রকটন করিয়াছেন বলিয়াই ইহার নাম স্মৃতি-প্রস্থান।

এই গ্রন্থ-পাঠে সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু আমার ন্যায় অশিক্ষিতা অবলার ইহা স্পর্শ করারও অধিকার নাই। কিন্তু শ্রীপাদগুরুদেবের

আদেশে প্রত্যহ কতিপয় শ্লোকমাত্র পাঠ করিলেও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা হইবে, এই সাহসে প্রত্যহ উপাসনার আসনে ইহাতে ও শ্রীভাগবতে চন্দন তুলসী অর্পণ করি এবং পাঠ করি। পূজনীয়া ব্রহ্ম চারিণী মাতার এই পবিত্র স্মৃতি আমি সবিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। ইহাতেও অনেক গুলি টীকা আছে, যথা শঙ্করভাষ্য, আনন্দ গিরির টীকা, শ্রীরামানুজ ভাষ্য, শ্রীপাদ মধুসুদন সরস্বতীর টীকা, হনুমদ্ভাষ্য, মহাভারতের টীকাকার নীল কণ্ঠের টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, বলদেব বিদ্যা ভূষণের টীকা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আমার নিকটে মধ্বাচার্য্যের টীকা, মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়-ভুক্ত রাঘবানন্দের টীকা, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরীর টীকা এবং অধুনা প্রকাশিত বাল গঙ্গাধর তিলকের গীতা ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ আছে। দয়াময়ের কৃপায় টীকা-গ্রন্থ আমার নিকটে যাহা আছে তাহা আমার পক্ষে প্রয়োজনের সহস্রগুণ অধিক। ইহা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞ মহাত্মগণেরও ব্যাখ্যা-বিবৃতি কিছু কিছু আছে। কিন্তু সে সকলও বুঝিতে পারি না। কেবল এক ব্রহ্মচারিণী মাতা ভিন্ন অপর কেহ আমায় ইতঃপূর্ব্বে শিক্ষাদান করেন নাই, তেমন কোন ব্যক্তিকেও আমি কখন দেখি নাই। বিশেষতঃ ভীরুতাই আমার স্বভাবের এক প্রধান বৃত্তি। কোন লোকের ত্রিসীমায় ঘেসিতে আমার সাহস নাই। ব্রহ্মচারিণী মাতা সংস্কৃত জানিতেন, এই জন্য তিনি এই সকল বড় বড় গ্রন্থ রাখিতেন। আমি কৌতুহল বশে কোন কোন সহজ টীকা স্পর্শ করিতাম।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, মূল গ্রন্থ পড়িলে, বুঝি আর না বুঝি, শ্রীগুরুকৃপায় কতকটা ধারণা করিতে পারি। কিন্তু কোন কোন টীকাকার মূল কথাগুলিকে একবারে আঁধারে ফেলিয়া দিয়া আমার ন্যায় অজ্ঞদিগকে একবারেই নিরাশ করিয়া ফেলেন। তখন. শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একটা উক্তি

মনে পড়ে। তিনি বেদান্ত-সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবেরই কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা গুলি যেন হয় তো বিকল॥
সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য—মেঘে করে আচ্ছাদন॥

শ্রীচরিতামৃত—মধ্যলীলা ৬ অধ্যায়

শ্রীশ্রীপ্রভু আদিলীলার সপ্তম অধ্যায়েও শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমীপে এইরূপ ব্যাখ্যাদোষের উল্লেখ করেন। তাহা পাঠে জানা যায় ব্যাখ্যার দোষে কেবল যে প্রকৃত তথ্য বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে তাহা নহে। বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধির হানি ঘটিয়া থাকে। যথা—

গৌণবৃত্ত্যে যেবাভাষ্য করিলা আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য॥

ব্যাখ্যাকারগণ স্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করার জন্য স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করেন। আবার এমনও হয় যে, কোন কোন ব্যাখাকার কোন কোন স্থল নিজেরাও ভাল বুঝেন না ; কঠিন বলিয়া ব্যাখ্যায় সে সকল স্থান সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন না অথচ সে সকল স্থানের ব্যাখ্যায় নিষ্প্রয়োজনে আড়ম্বর করেন। ব্রহ্মচারিণী মাতা কথাচ্ছলে স্পষ্টতঃই

এই কথা বলিয়াছিলেন। যোগ সূত্রের ভোজরাজ বৃত্তির প্রারম্ভ হইতে আমাকে এই কথা শুনাইয়াছিলেন। *

টীকা দ্বারা অনেক সময়ে এইরূপ অনর্থ ঘটে কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের ন্যায় অজ্ঞলোকদের পক্ষে বিজ্ঞ টীকাকারগণের কৃপা ভিন্ন স্বাধীন ভাবে শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিতে গেলে বিপদের আশঙ্কাই অধিক। এই গীতার কথাই বলি। গীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন

---

* দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ
স্পষ্টার্থেম্বতি বিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিকৈঃ।
স্বস্থ্যস্থেনুপযোগিভিশ্চধনুহুভির্জল্পৈর্ভ্রমন্তন্যতে
শ্রোতৃণামিতি বস্তু-বিপ্লবকৃতঃ সর্ব্বেঽপি টীকাকৃতঃ॥

অর্থাৎ টীকাকারগণ যে স্থান অতীব দুর্ব্বোধ্য মনে করেন, তাহার কোনও ব্যাখ্যা না করিয়া বলেন ইহাতো অতি স্পষ্টই আছে। আবার যে স্থানগুলি অতি স্পষ্ট সে স্থান 'গুলিতে বৃথা সমাসের ঘটা করিয়া মহা-বাগাড়ম্বরে অনর্থক অতিরিক্ত বিস্তৃতি করেন এবং অনুপযোগি বহু জল্প দ্বারা শ্রোতৃবর্গের প্রকৃত বিষয়ে ভ্রমোৎপাদন করেন। এইরূপে অধিকাংশ টীকাকারই মুখ্য অর্থের গোলযোগ ঘটাইয়া তোলেন। Crabbe এবং Young এই দুই ইংরাজ কবিই এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যথা—

(1) Oh rather give me commentators plain
Who with no deep researches vex the brain.
Who from the dark and doubtfnl love to run
And hold their glimmcring taper to the sun
Crabbe—The parish register

(2) How commentators each dark passage shun
And hold their farthing candle to the sun.
Young,—Love of fame.

এই যে—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমাদের পক্ষীয় এবং পাণ্ডব পক্ষীয় যুদ্ধার্থিগণ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিলেন ? যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থীরা যুদ্ধ ভিন্ন আর কি করে ? ধৃতরাষ্ট্র এমন নির্ব্বোধের ন্যায় বালকোচিত এই প্রশ্ন করিলেন কেন, আপাততঃ ইহাই মনে হয়।

শ্রীপাদমধুসূদন স্বরস্বতী টীকায় বুঝাইলেন যে এই প্রশ্ন সুগভীর অর্থমুলক। কেন না, যুদ্ধের স্থান কুরুক্ষেত্র,—উহা স্বভাবতঃই সুদীর্ঘ কালের ঐতিহাসিক ধর্ম্মক্ষেত্র। শ্লোকের প্রথমেই ধর্ম্মক্ষেত্র বিশেষণ পদটি দেওয়া হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের মনে হইল যে এমন পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে যোদ্ধাদের সমর-স্পৃহা তিরোহিত হওয়াই উচিত। বাস্তবিকই স্থান-মাহাত্ম্যে মহাবীর অর্জ্জুনের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অতীব প্রবলরূপেই জাগিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে ভীষণ অধর্ম্মের উৎপত্তি হইবে এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পর্য্যন্ত তিনি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। চক্রি-চক্রবর্ত্তী শ্রীনারায়ণের সবিশেষ উপদেশে এবং শাসনে অর্জ্জুনের হৃদয় হইতে তখন সেইধর্ম্মভীরুতা অপনোদিত হইয়াছিল। শ্রীপাদমধুসূদনের টীকার সাহায্য না পাইলে আমি তো কখনই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের এই সারবত্তা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিতাম না। এই জন্য আমি টীকাগুলি লইয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া থাকি।

ব্রহ্মচারিণী মাতার উপদেশে বুঝিয়াছিলাম, গীতা পাতঞ্জলদর্শনের ন্যায় যোগের গ্রন্থ এবং বেদান্তসিদ্ধান্তের গ্রন্থ। কিন্তু শ্রীধর স্বামীর, বিশ্বনাথের ও বলদেবের টীকার আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, কেবল যোগ দর্শনেও বেদান্ত দর্শনেই গীতার তাৎপর্য্য শেষ হয় নাই। ভগবৎতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বই—গীতার চরম উপদেশ। আমার প্রাণেশ্বর শ্রীগোবিন্দই গীতার পরম উপাস্য দেবতা এবং পরাভক্তিই তাঁহাকে লাভ করার একমাত্র

উপায়। গুরুদেবের পত্রে তাহা স্পষ্টতঃই লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও আমি ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

গীতায় ও পাতঞ্জল দর্শনে আমি ধ্যানের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার চিত্ত স্বতঃই ধ্যাননিষ্ঠ ছিল। ধ্যানের জন্য আমার কোন ক্লেশ বা প্রক্রিয়া স্বীকার করিতে হয় নাই। আমি বিরলে বসিলেই আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি আমার হৃদয় জুড়িয়া বসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে ধ্যানে সতত স্ফুর্ত্তির ভাব অনুভব করি না; সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় অনুভব হয় না। অদ্বৈতবাদীদের গীতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে কিছু কিছু পড়িয়াছি। তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, গীতা যে পূর্ণমাত্রায় ভক্তিবাদের গ্রন্থ তাহাতে আর আমার কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীগোবিন্দ তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উহাই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ বলিয়া জানাইয়াছেন; তদীয় প্রিয় তমসখা উদ্ধব-দেবকেও উহাই বলিয়াছেন। বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। ইহাতে কেহ কেহ বলেন এই যোগ শব্দের অর্থ—বিয়োগ। বিষয়-বৈরাগ্যই যোগের তাৎপর্য্য নয়, বিয়োগ উপলক্ষণ মাত্র। চিত্ত বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই আপনার স্বরূপে অবস্থান করে; তখন জ্ঞান ও প্রেম স্বতঃই নিজ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রেমই আত্মার স্বরূপ। আত্মা স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হন। ইহাতেই যোগ সার্থকতা লাভ করে। কেবল নির্ব্বিকারত্ব বা নিষ্ক্রিয়ত্ব লাভ—আত্মার স্বভাব নয়। দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা সমত্ব প্রভৃতির উপদেশে গীতার প্রায় অধিকাংশ স্থান পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সাধনার চরম লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণভক্তি-লাভ। অনন্যাভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে লাভ করা যায় না। পরাভক্তি-লাভের জন্য গীতার উপদেশ খুবই গম্ভীর। গীতার ঠাকুর একান্তীভক্তকেই নিজের অতি আপন প্রিয়তম বলিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনকে

বলিয়াছেন অর্জ্জুন তোমায় আমি আর অধিক কি বলিব ? তুমি আমার অতি প্রিয়সখা ; আমি তোমায় সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দিতেছি—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাংনমস্কুরু॥
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

ইহার উপরে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।” শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অতি স্পষ্ট। ইহার পূর্ব্বে তিনি আরও কত কথাই বলিয়াছেন, যথা—

১। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষুভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪

যিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার আত্মা চিরপ্রসন্ন ; তিনি শোক ও আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমার পরাভক্তি লাভ করেন।

২। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৫

তত্ত্বতঃ আমার ইয়ত্তা কি এবং আমার স্বরূপই বা কি, ইহা ভক্তি দ্বারা সম্যকরূপে জানা যায়। আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া ভক্ত আমাতে আবিষ্ট হন।

৩। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনাং।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭

যে সকল যোগীর আত্মা আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনিই যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম যোগী।

৪। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪

অন্য বিষয়ে চিত্ত না রাখিয়া কেবল আমাতেই চিত্ত রাখিয়া যিনি

সতত আমাকেই স্মরণ করেন, হে পার্থ সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি অত্যন্ত সুলভ।

৫। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪

অনন্যাভক্তির সাধক আমার এই স্বরূপ তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাকে দর্শন করিয়া আমাতে আবিষ্ট হন।

৬। ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরমোপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ১২।২

আমাতে আবিষ্ট হইয়া আমাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য যুক্ত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাতে যুক্ততম বলিয়া পরিগণিত।

৭। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ইত্যাদি ১২।৬

যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমাতে পরায়ণ হয়েন এবং অনন্যযোগে আমায় ধ্যান করেন ও উপাসনা করেন, তাঁহারা যুক্ততম।

৮। মাঞ্চ যোঽব্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬

যিনি দৃঢ় ভক্তিযোগে আমার সেবা করেন, তিনি গুণসকলকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয় না।

৯। সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং নিত্যং নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪

যাঁহারা সর্ব্বদা আমার গুণ নাম ও লীলা কীর্ত্তন করেন এবং মৎপ্রাপ্তির জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রযত্ন করেন, তাঁহারাই আমার নিত্যযুক্ত উপাসক।

১০। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

আমি সকলের পক্ষেই সমান নিরপেক্ষ; কেহ আমার প্রিয় নহে—দ্বেষ্যও নহে। যাঁহারা আমায় ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে এবং আমি তাঁহাদিগের আত্মাতে প্রকটরূপে বিরাজ করি।

১১। অপিচেৎ সু দুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯।৩০

কোন দুরাচার ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সহসা অনন্যভক্তিতে আমায় ভজন করে এবং সম্যগ্ভাবে আমাতে অবস্থান করে তবে তাঁহাকেও সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

১২। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানি হি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯।৩১

এতাদৃশ ব্যক্তিও অতি সত্বরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। হে কৌন্তেয় আমার ভক্তের কথনও বিনাশ নাই, ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যায়।

১৩। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯।৩২

স্ত্রীবৈশ্য বা শূদ্র অথবা পাপযোনিজাত অন্ত্যজ—যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, আমাকে আশ্রয় করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

১৪। মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯০
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্॥
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০

যাঁহাদের চিত্ত ও প্রাণ আমাতে সমর্পিত এবং আমার বিষয়ে মননশীল, আমার কথা-কথন-শীল, আমাতেই যাহারা তুষ্ট, এবং আমাকে চিন্তা করিয়াই যাহাদের চিত্তের আরাম, সেই সকল সততযুক্ত প্রেমভক্তি-সম্পন্ন ভক্তদিগকে আমি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যে সেই বুদ্ধিযোগে তাঁহারা আমায় লাভ করিতে পারেন।

১৫। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষভাগের শ্লোকগুলিও ভক্তি-মাহাত্ম্য-সূচক। এই সকল শ্লোকের দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, ভক্তির শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনই—গীতাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রজবালাদেরও হৃদয়ের ধন, তাহারও আভাস তাঁহার প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে তিনি নিজেই গীতার একাদশ অধ্যায়ে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন :—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।

এস্থলে অল্প কয়েকটা শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই যে ভগবদ্গীতার পরম উপাস্যতত্ত্ব এবং ভক্তিই যে তাঁহাকে পাওয়ার প্রধানতম উপায়—শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিচরণও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তাহার বিচার প্রকাশ করিয়াছেন। আমি উহার মর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছি, এস্থলে সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি। "গীতাশাস্ত্র—সর্ব্বশাস্ত্র-সার-স্বরূপ। সর্ব্বভক্ত-জনবন্দিত শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ের উত্তম অধিকারী অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তদীয় সর্ব্বপ্রকার আবির্ভাবের ভজন অপেক্ষা তাঁহার স্বভজন যে অতি গুহ্যতম, গীতার উপসংহার সেই উপদেশই করিয়াছেন। বিবিধ যজ্ঞে বিবিধ দেবতার উপাসনা হয়, গীতায় তাহাও বলা হইয়াছে; ধ্যান যোগে পরমাত্মার উপাসনা হয়, জ্ঞানে ব্রহ্মোপাসনা হয়,—এই সকল উপাসনার উপদেশের পরে সকল উপাস্যের চরমতত্ত্ব-স্বরূপ তাঁহার স্বকীয়, ভজনের

উপদেশ বলা হইয়াছে এবং উহাই যে সর্ব্বগুহ্যতম, স্পষ্টতঃ তাহাও বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, অর্জ্জুন তুমি এখন মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা কর না, অবশ হইয়া তাহাও তোমায় করিতে হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। চেতনাচেতন বস্তুমাত্রই তাঁহার অধীন। কাহারও স্বাধীনতা নাই। কাষ্ঠপুতুল-নর্ত্তক যেমন যন্ত্রে পুতুলগুলিকে আরোপিত করিয়া উহাদিগকে নর্ত্তিত করায়, ঈশ্বরও সেইরূপ স্বীয় মায়া-শক্তিতে জীবদিগকে পরিভ্রামিত করিতেছেন। মূল শ্লোকে লিখিত আছে "যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইহার অর্থ ঈশ্বর প্রকৃতি-পরিণাম-জনিত দেহেন্দ্রিয়রূপ যন্ত্রে জীবদিগকে আরূঢ় করাইয়া ভ্রামিত করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামিত্ব সম্বন্ধে এই বিষয়ের বহুল শ্রৌতবাক্য আছে। "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি, যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

এইরূপ কতই আছে। ইহা ছাড়া আর একটি শ্রুতির উল্লেখ করিতেছি—"এতদক্ষরস্য প্রশাসনে, গার্গি, সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" অর্থাৎ হে গার্গি এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।"

অতি চমৎকার! এক সময়ে গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী তাপস-তনয়াগণ ব্রহ্মবিদ্যা-শ্রবণের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু হতভাগিনী আমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—এমনই দুর্ভাগ্য!

যাক্ সে কথা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখাকে বলিতেছেন—হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। তিনি সর্ব্বভূতের চালক এবং মায়ারও নিয়ন্তা। তিনি বাৎসল্য-কারুণ্য-সৌহার্দ্দ্যাদিগুণপরবশ। অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন

আমি যে ঈশ্বর, তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমার নিখিল অবিদ্যা বিনাশ করিয়া পরম আনন্দরূপা শান্তিদান এবং প্রকৃতি-কাল-কর্ম্ম-সম্বন্ধশূন্য নিত্য ধাম প্রদান করিব। আমি তোমার নিকটে এই গুহ্যাতিগুহ্য জ্ঞানের কথা বলিলাম। তুমি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া নিজের অধিকারানুসারে কার্য্য করিও।

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়সখাকে গীতাশাস্ত্রের নিঃশেষ পর্য্যালোচনার কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইলেন, ভাবিয়া দেখিলেন এই সময়ে প্রিয় সখার প্রতি এই গুরুতর বিচার-ভার দেওয়া ভাল হইল না; তখন নিজেই আবার বলিলেন—অর্জ্জুন তুমি আমার পরম ইষ্ট, আমাতে তোমার দৃঢ় মতি। সুতরাং আমি যাহা ভাল মনে করিব তুমি তাহাই গ্রহণ করিবে—তাই তোমায় সর্ব্বগুহ্যতম কথা বলিতেছি—তুমি আমাতে মন দাও, আমাব ভক্ত হও, আমার যাজনা কর, আমার চরণে প্রণত হও, আমি সত্য সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—এই সকল করিলেই পরমানন্দস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ভক্তির বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন—ভগবানের নিমিত্ত ক্রিয়াই ভক্তি যথা—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিস্য যা ক্রিয়া।
সৈবভক্তি রিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বৈধী ভক্তির সাধনাতে পরা ভক্তির উদয় হয়। তথাপি আবার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ঃ—ইতঃপূর্ব্বে "দ্রব্যযজ্ঞ তপো যজ্ঞ" প্রভৃতি অনেক প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। যাহাদের বহু বিভব আছে তাঁহারা বহুল উপচারে ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, নিষ্কিঞ্চনগণ যথাশক্তি পত্রপুষ্পফলেই তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। তপোযজ্ঞের অর্থ—একদশ্যাদিব্রতপালন, যোগযজ্ঞ—আসন প্রাণায়াম নিয়মাদি সহ অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় ও চিত্ত জয় করা; স্বাধ্যায়

যজ্ঞ—শাস্ত্রাদি পাঠ ; জ্ঞান যজ্ঞ—শ্রুত বা অধীত উপনিষদ্ ও গীতাদির অর্থ সম্বন্ধে মনন কথনাদি। এই সকল কার্য্যে যে বৈগুণ্য হয় তৎ-পরিহারার্থ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রণত হইতে হইবে। এইরূপ পঞ্চ যজ্ঞের আরাধনা করিয়া অনুক্ষণ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ভগবৎ-চিন্তা করিতে হইবে। এই শ্লোকটি নবম অধ্যায়ের উপসংহারেও বলা হইয়াছে।

অতঃপরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন হে অর্জ্জুন তুমি কর্ম্ম কাণ্ডীয় সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য ভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর। যদি মনে কর যে শাস্ত্রানুসারে বিহিত কর্ম্ম-অকরণ জন্য পাপের আশঙ্কা আছে, তোমার সে আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, কেন না তুমি অনন্যভাবে আমার শরণ গ্রহণ করিলে বিহিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান না করার জন্য পাপরাশি হইতে তোমার আমি উদ্ধার করিব। শাস্ত্রীয় নিখিল বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য—অনন্য ভাবে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তিকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহাদের তজ্জন্য পাপ হয় না। টীকাকার-গণ এই শ্লোকের টীকায় এসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। যাহারা সবিশেষ আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ভক্ত সম্প্র-দায়ের টীকাগুলি পাঠ করিবেন।

এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার বহু বহু আবির্ভাব আছে। এমনকি পরব্যোমাধি-পতি নারায়ণও তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি। ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞানমাত্রের আবি-র্ভাব-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমতত্ত্ব। তিনি সর্ব্বত্রই "অহং" "মম" ইত্যাদি পদ ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই একমাত্র মুক্তি দাতা একমাত্র প্রেমদাতা—তাঁহার সমান কেহ নাই—তাহা অপেক্ষা অধিক কেহ নাই। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করিলেই কর্ম্ম জ্ঞানাদির উপাসনার উপরিচর ফল লাভ হয়। শ্রীভাগবত বলেন :—

১। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

২। নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম।

৩। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।

গীতার শ্লোক গুলি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। "ব্রহ্মণোহিপ্রতিষ্ঠাহম্"—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" ইত্যাদি গীতা বাক্যও পূর্ব্ব সিদ্ধান্তেরই পোষক।

একং শাস্ত্রং দেবকী-পুত্র গীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব
কর্ম্মাণ্যেকং দেবকীপুত্র-সেবা
মন্ত্রো হ্যপ্যেকো দেবকীপুত্র নাম।

এস্থলে দেবকী পদের অর্থ যশোদা। "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়াঃ যশোদা দেবকীতি চ।" অর্থাৎ নন্দের ভার্য্যার দুইটি নাম—যশোদা ও দেবকী। এখন উপরি উক্ত শ্লোকের অর্থ শুনুন—দেবকীপুত্র গীত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র। শাস্ত্র বলেন—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যৎ স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনির্গতম্॥

এতদ্ব্যতীত আরও কতই প্রমাণ আছে। আরও একটি বলিতেছি—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সকলগুলি উপনিষদ্ গাভীতুল্য,—গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের দোহক। (এখানেও দেবকীপুত্র যশোদাপুত্রের নামান্তর তাহা স্পষ্ট হইল) বৎস না হইলে দুগ্ধ-ক্ষরণ হয় না। এইজন্য অর্জ্জুন বাছুরের ন্যায় কার্য্য করেন। সুধীগণ ভোক্তা,—গীতারূপ অমৃতই দুগ্ধ।

হরি হরি, সকলই আমারই সেই ব্রজের কথা—আর সেই ধেনু

তার সেই বেণু—সেই বাছুর—আর সেই দোহাল। আমার গীতাপাঠ প্রায় এই ভাবেই চলে। আমি শ্রীকৃষ্ণের সখা—অর্জ্জুনের কথাই বেদবৎ মান্য করি। "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্"—মধুর—অতি মধুর! কে বলে গীতাশাস্ত্র নীরস—ইহার দোগ্ধা—গোপাল-নন্দন—আমারই সেই গোবিন্দ গোপাল! শ্রীগোপাল-তাপনী বলিতেছেন—"কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তংধ্যায়েৎ তং রসেৎ"—ইহার শ্রুতির আদেশ। কিন্তু আমি তো ইহার কিছুই বুঝি না! গুরুদেব, তুমি এখন কোথায়—বলিয়া দাও গুরুদেব, কি প্রকারে তোমাকে ভজিতে হয়, কি প্রকারেই বা রসিত করিতে হয়। তুমি তোমার প্রিয় সখাকে বলিয়াছ—অর্জ্জুন তুমি সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর।" অর্জ্জুনের সে ঈশ্বর কে? আমাকেও সেইরূপ বলিয়াছ শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করিও। আমায় বলিয়া দাও কিরূপে গোবিন্দকে চিনিব, কি প্রকারেই বা তাঁহার উপাসনা করিব? তোমাভিন্ন আমার গোবিন্দ আর কে আছেন?

যাহা হউক—উপক্রম-উপসংহার প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। গীতা শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহারে এই তাৎপর্য্য বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব—চরম উপাস্য;—ভক্তিতেই তাঁহার উপাসনা—প্রেম-ভক্তিই সে উপাসনার চরমা পরিণতি।

আমি স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুরোধে কখন কখন উপনিষৎ পাঠ করিতাম, এখনও করি। কিন্তু উহা তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। কেননা সমুদ্র-মন্থনে যেমন অমৃতের উৎপত্তি, তেমনই উপনিষৎ সমূহ মন্থন করিয়া গীতারূপ অমৃতের উদ্ভব। সুতরাং গীতা পাঠ করিয়াই উপনিষৎপাঠের ফল লাভ হয়। বিশেষতঃ উপনিষদে কর্ম্মযোগের যথেষ্ট পর্য্যালোচনা দেখিতে পাই না—গীতায় উহা পূর্ণ মাত্রায় আলোচিত হইয়াছে। এমন কি প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই কর্ম্মের

উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকটীতে আমার চিত্ত সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হয়, উহা এই :—

নিয়তস্যতু সন্ন্যসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ শাস্ত্র বিহিত নয়। মোহবশতঃ যদি কেহ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে ত্যাগ তামস ত্যাগ নামে অভিহিত হয়। কেবল একমাত্র শ্রীপাদরামানুজ নিয়ত কর্ম্মের অর্থ করিয়াছেন—কাম্য ও নিত্য এই উভয়বিধ কর্ম্মই নিয়ত। সুতরাং শ্রীপাদরামানুজ মতে শাস্ত্রবিহিত ও নিত্য,—উভয়ই অপরিত্যাজ্য। কিন্তু অন্যান্য টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ বলেন কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া উহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতু ; বিশেষতঃ কর্ম্মভিন্ন যখন জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না সুতরাং উহা অবশ্যই অত্যাজ্য।

আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানবাদী এবং কর্ম্ম-ত্যাগের একান্ত পক্ষপাতী। শ্রীপাদরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইনি কাম্য ও নিত্য উভয় প্রকার কর্ম্ম-আচরণেরই উপদেশ করেন। নিত্য কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতু ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু কাম্যকর্ম্মে পুনর্জন্ম হয়। এই জন্য শ্রীধরাদি সকলেই কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ স্বীকার করেন। গীতা পাঠে আমার ধারণা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীর—তিনি কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেই সর্ব্বদাই ব্যাপৃত। গীতায় তিনি কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ করেন নাই—কিন্তু কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্তি গুলিকে আরও সুব্যাখ্যাত করিয়া সুদৃঢ় করিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ে একাদশ শ্লোক এই যে :—

নহি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ দেহ-ধারণের পক্ষে নিখিল কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। সুতরাং তাহাদিগকে বিহিত কর্ম্মগুলি করিতেই হইবে। কিন্তু যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। ইহা গীতা উপনিষদের এক বিশেষত্ব। টীকাকারগণের মধ্যে এক শ্রীরামানুজ স্বামী ব্যতীত আর সকলেই কাম্য কর্ম্ম-ত্যাগের পক্ষপাতী। শ্রীমৎমধুসূদন সরস্বতী ষড়্ দর্শনে সুপণ্ডিত। তিনি সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিয়ত কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়াই স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন কিন্তু তিনিও শঙ্করের ন্যায় কাম্য কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের জটিল বিচারের অবতারণা করিয়াছেন; প্রাভাকর ও ভাট্টমতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুপণ্ডিত ভিন্ন পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শনে সে বিচার-বিতর্ক অপর কেহ বুঝিবে না —সে বাক্যের মহারণ্যে প্রবেশ করার সামর্থ্য অনেকেরই নাই; আমি উহার কিছুমাত্রও বুঝিতে পারি না। শ্রীপাদমধুসূদন অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ; বোধ হয় সকল দর্শনেই তঁহার সমান প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু এই প্রতিভাবান্ মহাদার্শনিক পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। গীতা ব্যাখ্যার শেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন—তাহা শুনুন :—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদ্ বিম্বফলা ধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।

এই পদ্যের বঙ্গানুবাদ করিব না— করিলে ইহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থাকিবে না। এই পদ্যটী ঠিক যেন শ্যামল কালিন্দী-তটান্ত-কুঞ্জবিলাসিনী কোন প্রেমিকা কুলকামিনীর প্রেমরস-সুধাময় মৃদুমধুর মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণের মহামাধুরীময়ী শক্তিতে আত্মারামগণেরও যে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহার আরও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পশ্চিম বিভাগে প্রথম শান্তভক্তি লহরীতে শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত একটি শ্লোক আছে, উহা এই :—

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধ-দীক্ষাঃ
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতাঃ গোপ-বধূ-বিটেন।

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈত পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং সেই স্বালঙ্কৃত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের পূজালাভ করিতাম। কোন শঠ গোপ-বধূবিট আমাদিগকে সহসা এখন সে আসন হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া স্বীয় চরণের দাস করিয়া ফেলেছে— আহা ইহা আমাদের বড় দুর্ভাগ্য। মহদ্‌গণের আরাধ্য হইয়াও আমরা শঠ লম্পট গোপবধূবিটের দাস হইলাম!"

ইহা ব্যাজস্তুতি। ইহাতে নিন্দামুখে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরম তাৎপর্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে আমাদের কি সৌভাগ্য— শ্রীকৃষ্ণের এমনই কৃপা যে আমাদিগকে হেয় ব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করাইয়া শ্রীমতী গোপ-বধূগণের সাধনার অনুগতিতে পরম সাধ্যমুকুটমণি-স্বরূপ আত্মভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞানের চরম ফল। অতি সৌভাগ্য বশতঃ কোন কোন ব্রহ্মবাদী ব্রজরসের এই নিগূঢ় প্রসাদে সে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসসিন্ধুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়াই ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ মনে করেন। যেখানে শ্রীভগবদ্গীতার উপদেশ শেষ—সেখান হইতেই শ্রীগীতগোবিন্দের উপদেশের আরম্ভ —ইহা আমি গুরুকৃপায় নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীগ্রন্থপাঠ—শ্রীগীত-গোবিন্দ

আমার বাল্য জীবনেই বিধাতা ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া আঁকিয়া তুলিয়াছিলেন। পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে ইহাই এ জীবনের জন্য বিধাতার বিধান। ঘটনার সংঘটনও তদনুকুল হইতে লাগিল। মাতার মৃত্যুর পরে ব্রহ্মচারিণীমাতা অভিভাবিকা হইলেন, তিনি তাঁহার আদর্শেই এ জীবনটার গঠন কার্য্য প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও আমার যৌবন-উন্মেষের পূর্ব্বেই তিনিও পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু আমার চরিত্রে এমন একটা শক্তিময় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়া গেলেন যে যৌবনেও সেই প্রভাবই চলিতে লাগিল। আমি তাঁহারই যত্নের ধন—আদরের সামগ্রী, উপনিষদ্ গীতা ও শ্রীভাগবতাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতাম—নাটক নভেল স্পর্শ করিতাম না—শ্রীভাগবতের শ্রীরাস লীলা তখনও বুঝিতে পারি নাই—পাঠও করি নাই। গীতা-উপনিষৎ পাঠে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল, জ্ঞান বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধির প্রচুর সাহায্য এই সকল গ্রন্থে পাইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বে আমার চিত্তের প্রবেশ অধিকার ছিল না—আমি ভগবৎতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতাম—সে চেষ্টায় কিছু সফলতাও লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপরে লীলাতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি। শ্রীগোপালতাপনী, ব্রহ্ম সংহিতা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রীমৎরূপ সনাতন ও শ্রীমৎ শ্রীজীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তের কিছু কিছু জ্ঞানাভাস পাইয়া লীলাতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি। শ্রীভগবান্ আমায় এই উদ্যমে যথেষ্ট কৃপা করেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব

ও প্রেমতত্ত্ব আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন ; বিবেক-বৈরাগ্যের ও ভাগবতধর্ম্মের মধ্য দিয়া লীলাতত্ত্বে প্রবেশ না করিলে ভগবৎকৃপা ভিন্ন উহাতে প্রবেশের আর দ্বিতীয় উপায় নাই ; ইহা আমি ভালরূপেই বুঝিয়াছিলাম। আমি ক্রমে ক্রমে ভক্তিগ্রন্থ কয়েক খানি সংগ্রহ করিলাম। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের সঙ্গে শ্রীগীত গোবিন্দ গ্রন্থ খানিও প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু শ্রীগীত গোবিন্দ স্পর্শ করিতে আদৌ আমার সাহস হয় নাই।

একদিন সাহস করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া শ্রীগ্রন্থখানিকে প্রণাম করিয়া—মস্তকে স্পৃষ্ট করিয়া উহা খুলিলাম—খোলামাত্রই একটি শ্লোক সহসা আমার চক্ষে পড়িল ; উহা এই :—

যদি হরি-স্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।

অতি ধীরে ধীরে পদ্যটীর অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পাইলাম। হরিস্মরণে মনটী যদি সরস হয়, যদি তাঁহার বিলাসকলা জানার জন্য মনটি কুতূহল হয়, তাহা হইলেই জয়দেবের কোমল কান্তপদাবলী-যুক্ত এই কাব্যবাণী শ্রবণ করিও।

ইহাতে আমি বুঝিলাম হরিস্মরণে মন যদি সরসভাবে অনুরক্ত হয় এবং তাঁহার বিলাসকলা জানিবার জন্য যদি মনের কৌতুহল হয়, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকার হয়, নচেৎ অপরের এই গ্রন্থ-পাঠে আদৌ অধিকার জন্মে না। হরি পদটীর অর্থ—লীলাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আহ্লাদিনী

শক্তিগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবন-লীলা করেন। লীলা-রসময়ী গোপীগণ তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি। শ্যামল কালিন্দীকূলে কুসুমিতে কুঞ্জ-কাননে তদীয় আহ্লাদিনীশক্তিগণের সহ শ্যামসুন্দরের লীলাময় কেলিবিলাস-বার্ত্তা জানিবার জন্য সকলের অধিকার সম্ভবপর নয়।

আমি ভাবিতে লাগিলাম—এই মধুর লীলাময় শ্রীগ্রন্থ পাঠের অধিকার আমার আছে কি? ভাবিলাম শ্রীশ্রীরাধগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া একবার পাঠে প্রবৃত্ত হই—পরে যেমন বুঝিব, তেমনই করিব। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুময়ী লীলার কিছু বুঝি আর না বুঝি, তাঁহাদের শ্রীনাম তো বহুবার নয়নগোচর হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তিপূরিত চিত্তে প্রেমিক ভক্তগণের আস্বাদ্য গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে পদ্যটী প্রথমতঃ আমার দৃষ্টিপথে পড়িল এবং যাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম—উহা এই মহাকাব্যের তৃতীয় শ্লোক। এই পদ্যে গ্রন্থ-প্রণয়নের রীত্যনুসারে এই গ্রন্থের 'সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ও অধিকারী' নির্ণয় করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধগোবিন্দের বিলাসকলাময়ী লীলা স্মরণই—এই গ্রন্থের প্রয়োজন। মধুররসময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলাই ইহার প্রতিপাদ্য—শ্রীরাধামাধবের বিজন-কেলিচিন্তনই ইহার অভিধেয়। প্রেমিক ভক্তগণই এই এই গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী। সুতরাং এ গ্রন্থ পাঠে আমার অধিকার নাই—অধিকার না থাকিলেও অপরাধের আশঙ্কা করি না। কেন না, এই গ্রন্থখানিকে বাসুদেব-রতি-কেলি কথা ভিন্ন কোন প্রাকৃত নায়কের কেলি-কথা বলিয়া কখনই আমি মনে করিব না, সে ভাব আমার মনে স্থান পাইবে না,—ইহা সুনিশ্চিত। এই সাহসে কিছু দিনের মধ্যে গ্রন্থ খানির আদ্যন্ত একবার পাঠ করিয়া লইলাম।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে—তাহা এই যে

ইঁহার নিবাসভূমি বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে। এই গ্রামটী অজয়-নদের উত্তর তটে। এখনও প্রতিবর্ষে এখানে মাঘ-সংক্রান্তিতে মেলা-হয়, সহস্র সহস্র লোকের আগমন হয়। শ্রীপাদজয়দেবের স্মৃতি-রক্ষার্থে এখনও এখানে অনেক শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকেন, শ্রীবিগ্রহসমূহের সেবার্থ যথেষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি আছে।

এই গ্রন্থের উপসংহারে নিখিত আছে ইঁহার পিতার নাম—ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী—পরাশরাদি কতিপয় ব্যক্তি ইহার বন্ধু ছিলেন। ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে যে আখ্যান আছে, তাহা অনেকেই জানেন। যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্তগ্রন্থে উহা পাঠ করিতে পারেন। বোম্বাইর কোন কোন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাতেও উহার অনুবাদ করিয়াছেন। জয়দেব, বল্লাল সেনের পুত্র-লক্ষণ সেনের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণী টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষণ সেনের পণ্ডিত-সভাগৃহের দ্বারের উপরে প্রস্তর খণ্ডে একটি শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। উহা এই :—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণস্য চ॥

জয়দেব নিজেও তদীয় গীতগোবিন্দে তৎসাময়িক এই সকল কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

বাচঃ পল্লবয়িত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়রচনৈ রাচার্য্যো গোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপী ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ

তাঁহার এই পদ্যে কেবল উমাপতিধর শরণ গোবর্দ্ধন ও ধোয়ী কবির

নামও আছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত লক্ষণ সেন রাজ্য শাসন করেন। ইহাতে স্পষ্টতঃই জানা যায় জয়দেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। ইনি পুরীধামেও অনেক দিন ছিলেন।

শ্রীগীতগোবিন্দ—মহাকাব্য। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। গদ্যেও পদ্যে বহু প্রকার কাব্য আছে। নাটক সাহিত্যও কাব্যেরই অন্তর্গত। মহাকাব্যও খণ্ডকাব্য—কাব্যের এই দুই বিভাগ খুবই প্রসিদ্ধ। গীতগোবিন্দ মহাকাব্য। এই কাব্য উজ্জ্বল রসপ্রধান। ইহার প্রথম পদ্যটী হইতেও কিছু বিচার করা চলে, যথা—মেঘাদি—উদ্দীপন ভাব। শ্রীরাধাদি আলম্বন বিভাব—ভীরু পদটী অনুভাব। হর্ষ, বেগ উৎসুক্য শঙ্কা ব্রীড়া চাপলাদি—সঞ্চারী ভাব। শ্রীকৃষ্ণ এই কাব্যের অনুকূল নায়ক, শ্রীমতী রাধিকা ইহার স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকা। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অভিলাষ-বিপ্রলম্ভরস—এবং পরার্দ্ধে সমৃদ্ধিমৎ সম্ভোগরস।

গানই এই গ্রন্থের রচনা-প্রণালীর মুখ্য অঙ্গ। বিশুদ্ধ সুরতাল-লয়ে এই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী সঙ্গীত-শ্রবণে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবও বিমুগ্ধ হইতেন। গ্রন্থকারের জীবনচরিতে তাঁহার সেই অদ্ভুত কাহিনীরও উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী জয়দেব বাল্যেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির মহতী কৃপা পাইয়াছিলেন। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তিভাবের স্ফূর্ত্তি হইতেছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় যে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার হৃদয়-নিহিত কাব্য-শক্তির সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল। জয়দেবের কাব্য-প্রতিভা নিশ্চয়ই দৈব সম্পৎ—উহা দয়াময় শ্রীগোবিন্দেরই প্রদত্তা। জয়দেব ভগবৎকৃপায় যে কাব্যশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে কাব্যশক্তি ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীগীতগোবিন্দ—সেই ভক্তি সেবারই অমৃতময় ফল। তাঁহার এই

কাব্য, ভাবে ভাষায় ও সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে লালিত্য-বৈভবে এবং সুরতাল-মান-লয়-সম্বলিত গেয়-ছন্দ-প্রাচুর্য্যে সংস্কৃত ভাষায় একবারেই অতুল্য ও অদ্বিতীয়। ইহারও অনেক উপরে—উহার চিরপ্রবাহিত প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহ-গৌরবের সুধামধুর উচ্ছ্বাস। এইরূপ অসংখ্য অনুপম গুণগরিমায় শ্রীগীতগোবিন্দ দেশের সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত ভক্ত ও বিবুধীদের অতীব সমাদরের বস্তু রূপে বিরাজমান। কাব্যের গানগুলি রাগ-রাগিণীতে তানে-মানে গীত হইলে এই যে মাধুর্য্য বর্ষণ করে, তাহারতো তুলনাই নাই, কেহ যদি কেবল আবৃত্তি করেন, সেই আবৃত্তি শুনিলেও বিমুগ্ধ হইতে হয়। কাব্যপ্রিয় নরনারীমাত্রেই সে মাধুর্য্য সম্ভোগ করেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—এমন কি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ দেবও শ্রীগীতগোবিন্দের গীতি-সুধা-আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইতেন এরূপ জন-শ্রুতিও শুনিতে পাওয়া যায়। জন-শ্রুতি এই যে এক দিবস জগন্নাথের পূজক, তাঁহাকে স্নান করাইতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার বস্ত্র স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে পরিধেয় বস্ত্র এইরূপ বিছিন্ন হইল, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না ; ইহা লইয়া এক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তখন জগন্নাথের সেবক ও রাজা উভয়েই স্বপ্নে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পরিলেন। উহা এইরূপ :—কোনও সময়ে এক শাক-বিক্রয়কারিণী তাহার বৃন্তাক-বাগানে যাইয়া বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃন্তাক চয়ন করিতেছিলেন এবং গীতগোবিন্দের পদগান করিতেছিলেন। জগন্নাথদেব সেই স্থানে বিমুগ্ধ হইয়া বৃন্তাক বাগানে সেই বৃন্তাক-বিক্রয়ণীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সেই গান শ্রবণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় বৃন্তাক কণ্টকে তাঁহার বস্ত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুও পুরীধামে এক দিবস গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় এক কণ্টক বনের উপর দিয়া গান-স্থানের নিকটে

যাইতে ছিলেন। গোবিন্দ দাস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে প্রতিরুদ্ধ করার জন্য তাঁহার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন; মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, চেতনা পাইয়া দেখিলেন—একটী রমণী মধুর কণ্ঠে গীত-গোবিন্দ গাইতেছেন। মহাপ্রভু তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, গোবিন্দ আজ তুমি আমায় রক্ষা করিয়াছ। আমি গায়কের বিচার না করিয়া উহার গানে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি এই সঙ্গীত-মাধুর্য্যকে মূর্ত্তিমৎ বস্তু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছ—নচেৎ স্ত্রীস্পর্শে আজ এই সুদীন সন্ন্যাসীর মৃত্যুফল ঘটিত। শ্রীগীতগোবিন্দ-গান-মাধুর্য্যে বাস্তবিকই আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম।"

জয়দেব ভগবৎকৃপায় যেমন অতুলনীয় কাব্য-শক্তি পাইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার ইহজীবনের ও পারমার্থিক জীবনের ভক্তি-সুধাময়ী পতিপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবীকে লাভ করিয়াছিলেন। সে বিবরণ অতি দীর্ঘ। ভক্তমালগ্রন্থে পাঠকগণ তাহা পাঠ করিবেন। তিনি এই পতিপ্রাণা অনুরাগময়ী সহধর্ম্মিণীকে লইয়া জগন্নাথ-মন্দিরে স্বরচিত গান করিতেন ও উভয়ে নৃত্য করিতেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের জনশ্রুতি আছে। শুনা যায় শ্রীপাদ জয়দেবের গীত গোবিন্দের যশোগৌরব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিপুল প্রসার দেখিয়া পুরীর তৎসাময়িক রাজাও এইরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থই গুণগরিমায় জয়দেবকৃত গ্রন্থ হইতে অধিকতর সম্মানার্হ, এই কথা থ্যাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, জয়দেবকৃত গ্রন্থ পাঠ না করিয়া তাঁহার গ্রন্থ পাঠের জন্য সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই আদেশভঙ্গকারীদিগকে যে দণ্ড পাইতে হইবে, তাহারও ঘোষণা প্রচার করা হয়। রাজা একদিন পুরীতে যাইয়া দেখেন জয়দেব স্বীয় গ্রন্থের

গানে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন। রাজা রুষ্ট হইয়া জয়দেবের প্রতি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নিরীহ ভক্ত জয়দেব কাতর কণ্ঠে বলিলেন, শ্রীভগবান্ আমার রচিত গানেই অধিকতর সন্তুষ্ট হন; এই জন্য উহা দ্বারাই তাঁহাকে তুষ্ট করি। ইহাতে আমার নিজের কোনও যশোলাভের আশা নাই। তখন রাজা বলিলেন ইহার পরীক্ষা হউক। এই বলিয়া দুই খানা গ্রন্থ শ্রীমন্দিরে রাখিয়া মন্দিরের কপাট রুদ্ধ করা হইল। ইহারা সকলেই বাহিরে রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কপাট উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল—জয়দেবের গ্রন্থ রাজার রচিত গ্রন্থের উপরিভাগে বিরাজমান। রাজা বিস্মিত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার মিথ্যা অভিমানও তিরোহিত হইল।

আরও আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। জয়দেব শ্রীরাধার মান-লীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী—মানময়ী। শ্রীকৃষ্ণ মান-প্রশমনের জন্য চাটু বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—কবি জয়দেব এই সম্বন্ধে একটি গানের খানিকটা লিখিয়া লেখাবদ্ধ রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—অতঃপরে কি লেখা যাইতে পারে? কবির হৃদয়ে তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনার উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু কোনটাই তাঁহার মনোমত হইলনা। তখন তিনি গ্রন্থ বাঁধিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। পদ্মাবতী দেবী ভোগ-রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই পদ্মাবতী তাঁহার পতির কণ্ঠস্বর শুনিয়া রন্ধন গৃহের বাহিরে আসিলেন—দেখিলেন জয়দেব স্নান না করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, স্নান না করিয়া ফিরিলেন কেন? তিনি বলিলেন আমি যে গ্রন্থ লিখিতেছি, সেই গ্রন্থখানা নিয়ে এস দেখি, একটী কথা মনে পড়িল, সে কথাটী লিখিয়াই স্নানে যাইতেছি। এই বলিয়া—সেই গ্রন্থে কিছু লিখিয়া আবার উহা বন্ধন করিয়া চলিয়া গেলেন! এদিকে বহুক্ষণ পরে জয়দেব স্নানান্তে গৃহে

প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনা-ভোগারাধনা ও প্রসাদ ভক্ষণাদি কার্য্য শেষ করিয়া প্রাত্যাহিক নিয়মানুসারে গ্রন্থ লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রন্থ খুলিয়াই দেখিলেন, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার পরে অপর এক ব্যক্তি যেন কি লিখিয়া রাখিয়াছেন—পড়িয়া দেখিলেন, উহাতে লিখিত হইয়াছে—

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
ধেহি পদপল্লবমুদারম্

দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একথা কে লিখিলেন—এত বড় একটা কথা লেখার সাহস আমার তো কখনই নাই। কথাটির অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তোমার যে পাদপল্লব মদনের গরল নষ্ট করে, আমার মস্তকের ভূষণস্বরূপ সেই উদার পাদপল্লব আমার মাথায় দাও।" এতো অতি অদ্ভুত ব্যাপার! জয়দেব বিস্মিতভাবে পদ্মাবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার গ্রন্থে কে এক নূতন কথা লিখিয়া গিয়াছেন তুমি জান কি? কেহ এখানে এসেছিলেন? পদ্মাবতী বলিলেন, কেউতো আসেন নাই। আপনিই তো ফিরিয়া আসিয়া গ্রন্থ চাহিয়া গ্রন্থে কি লিখিয়া গেলেন!

জয়দেব—কখনই নয়। আমি কখনই ফিরিয়া আসি নাই।

পদ্মাবতী—ঠিক আপনি। আমি মিথ্যা বলিব কেন? আর চক্ষুকেই বা অবিশ্বাস করিব কেন? আপনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন!

জয়দেব বুঝিলেন পদ্মাবতী যেমন দেখিয়াছেন, তেমনই বলিতেছেন। কিন্তু ব্যাপার অতি অদ্ভুত; বুঝিলেন, মানিনীর মান ভাঙ্গিতে এমন চূড়ান্ত কথা আর কাহারও লিখনীতে আসিতে পারে না। যাহার মানের দায়, তিনি নিজেই উহা লিখিয়াছেন। তখন তিনি নিগূঢ় কথা পদ্মাকে বুঝাইয়া বলিলেন এবং গভীর প্রেমানুরাগে পদ্মার হাত নিজ হাতে লইয়া

বলিলেন, প্রেমময়ি ভক্তিময়ি, তোমার জীবনই সার্থক। তুমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছ, বাক্যালাপ করিয়াছ—তুমিই ধন্যা। পদ্মা বলিলেন—সে দর্শন তো ভাগ্যক্রমে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি প্রাপ্ত হইতেছি—এখনও তো শ্রীভগবানের সেইরূপ আমার নয়ন-সমক্ষে বিরাজমান কিন্তু গোপ-বধূদের নয়নরঞ্জন সে রূপমাধুরী তো আপনারই প্রত্যক্ষ। আমার শ্রীভগবান্ এইরূপেই (জয়দেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) নিত্য দর্শন দিতেছেন, সেবাগ্রহণ করিতেছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট; ইহাতেই আমি কৃতার্থ।" এইরূপেও গীত গোবিন্দের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মত্ত এই ভক্ত-যুগলের নিত্য আস্বাদ্য গীতি-সুধা ভক্ত-মাত্রেরই আদরের ধন। কিন্তু কাব্যামোদী সাহিত্যকগণও এই গ্রন্থ খানির কাব্য-রসাস্বাদের জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জন্য শ্রীপাদ জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থখানির বহু সংস্করণ প্রকাতি হইয়াছে, এমন কি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইয়োরোপীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। এদেশীয় বৈষ্ণবসমাজে ইহার আদর অনন্যসাধারণ। স্বয়ং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গম্ভীরার নিভৃত শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিয়া গীত-গোবিন্দের সুমধুর রসময় ললিত পদাবলীর রসাস্বাদন করিতেন। সুতরাং এই গ্রন্থখানি বঙ্গীল বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখনও সমগ্র টীকাসহ এই গ্রন্থের একখানি সংস্করণ এপর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই। এদেশে পূজারি গোস্বামিকৃত বালবোধিনী টীকাখানির নাম প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীগীতগোবিন্দের যে অত্যুত্তম সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও কেবল পূজারি গোস্বামিকৃত টীকাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার যে আরও অনেকগুলি টীকা আছে, তাহা অনেকেরই অবিদিত। নিম্নে টীকাগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি :—

১। নারায়ণ কৃত—প্রদ্যোতনিকা।

২। পূজারি গোস্বামিকৃত—বালবোধিনী।

৩। জগদ্ধরকৃত—ভাবার্থদীপিকা।

৪। শঙ্করমিশ্রকৃত—রসমঞ্জরী।

৫। রঙ্গনাথকৃত—গীতগোবিন্দমাধুরী।

৬। মানাঙ্ককৃত—
৭। রসময়দাসকৃত—
৮। মিশ্রকান্তকৃত—
৯। কুমারখানকৃত—
১০। পরমানন্দকৃত—
(৬–১০) এই কয়েক টীকাকারের টীকার নাম জানা যায় নাই।

১১। কৃষ্ণদত্তকৃত—গঙ্গা।

১২। রাণকুম্ভকর্ণকৃত—রসিকপ্রিয়া।

১৩। নারায়ণ কবিরাজ কৃত—সর্বাঙ্গসুন্দরী।

আপাততঃ এই কয়েকখানি টীকার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এতন্মধ্যে পূজারি গোস্বামিকৃত বালবোধিনী এদেশে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। রসিকপ্রিয়া ও রসমঞ্জরী বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট টীকাগুলি প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে এই টীকাগুলির পাণ্ডুলিপি এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

সাহিত্যকহিসাবে শ্রীগীতগোবিন্দ সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই পরম আদরের ধন। সুতরাং ইহার টীকাগুলি সাহিত্যসেবিমাত্রেরই প্রয়োজনীয় ও পাঠ্য। বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রীগীতগোবিন্দ সবিশেষ আদরের সামগ্রী। কেন না, শ্রীপাদ জয়দেব বঙ্গের কবি। তাঁহার কাব্যসুধারসে কোনও সময়ে সমগ্র ভারত পরিপ্লুত হইয়াছিল, সে সুধাতরঙ্গ

সুদূরে বিসারিত হইয়া সুমধুর কলতানে ভারতবর্ষের সুদূরবর্ত্তী সঙ্গীত-সাহিত্যরসভিজ্ঞ জনগণকেও বিমুগ্ধ করিয়াছিল। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এখনও সেই মধুর কোমলকান্তপদাবলী, গীত, প্রগীত, কীর্ত্তিত, সঙ্কীর্ত্তিত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীপাদ জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের অর্থ ও ভাব বুঝাইবার জন্য এই সকল টীকাকার যথেষ্ট শ্রমচিন্তা করিয়াছেন। এক টীকায় যাহা অভিব্যক্ত হয় নাই, অপর টীকায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে; সুতরাং যে সকল টীকা বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয় মুদ্রিত হইলে পাঠকগণের পক্ষে যে সবিশেষ উপকার হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহাপ্রভু গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া আকুল হইতেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। স্বরূপ, রামানন্দের সহিত গীতগোবিন্দের গান গাইতেন, মহাপ্রভু সেই গান দিবারাত্র শ্রবণ করিতেন, আর স্বরূপের কণ্ঠে ধরিয়া প্রেমাকুলা শ্রীমতীর ন্যায় "হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ, দেখা দিয়া প্রাণ রাখ" বলিয়া কাঁদিতেন। আবার ভাবে বিভোরা শ্রীমতীর ন্যায় সেই দারুণ বিরহ-উৎকণ্ঠায় তখনই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন। এইরূপ মহাভাবে মহাপ্রভুর শেষ লীলা অতিবাহিত হয়।

গম্ভীরা অথচ ব্যাকুলা, বিদগ্ধা অথচ সরলা, সুমর্য্যাদাশীলা অথচ বিনীতা ও প্রিয়ম্বদা, ধৈর্য্যশালিনী অথচ বিরহোৎকণ্ঠায় উন্মাদিনী, উৎকণ্ঠার দারুণ আতিশয্যে কৃষ্ণবিরহে মৃতপ্রায়, অথচ কিঞ্চিৎ পরেই ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে তাঁহার সজীবতা ও উৎফুল্লতা,—আবার বাহ্যজ্ঞানের উদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথায় কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার ব্যাকুলিত রোদন—শ্রীগীতগোবিন্দে আমরা এতাদৃশী মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার চরণছায়া পাইয়া কৃতার্থ হই, আর ইহার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগৌরাঙ্গের কথা প্রেমিক ভক্ত পাঠকের মনে পড়ে;—মহাভাবস্বরূপিণী ও মহাভাবস্বরূপ একই মূর্ত্তিতে

প্রেমিক ভক্তের নিকট প্রকাশ পান। এই জন্যই বুঝি বা পদকল্পতরুতে শ্রীমতীর এক একটি ভাববর্ণনের পূর্ব্বে তদ্ভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রীগীতগোবিন্দ ব্রজরসের সুধাসিন্ধু। নীলাচলের প্রেম-লীলায় গীতগোবিন্দ সততই আস্বাদিত হইত, সুতরাং সে কথা কিছু কিছু বর্ণিত হইবে।

বসন্তকাল। ললিত লবঙ্গলতার পরশে পরশে মলয় সমীর আরও কোমল হইয়া বহিতেছে। মধুকরের গুঞ্জনে এবং কোকিলের কূজনে কুঞ্জকুটীরে মধুর বাসন্তী যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীনন্দনন্দনের বসন্ত-কুঞ্জে ভ্রমরগুঞ্জনে ও কোকিল-কাকলীর কলকল কূজন-সঙ্গীতে যে আনন্দ-সুধাধারা প্রবাহিত হয়, তাহার আস্বাদ, নন্দন-কাননচারী দেব-গণের পক্ষেও একেবারে দুর্ল্লভ। গুঞ্জরিত অলিকুলসঙ্কুল বকুলফুলদলের দারুণ ভারে ও ভ্রমরঝঙ্কারে বকুলবিটপী আকুল হইয়া পড়িয়াছে। তমালদলের নবপল্লব বসন্ত-শোভা বিস্তার করিতেছে, আর উহাদের নবপত্রাবলী হইতে মৃগমদসৌরভ বিস্তৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। পলাশ-তরুর শোভার সীমা নাই। পলাশ দেখিয়া বিরহী যুবজনের ভয় হইতেছে। পলাশফুলগুলি যেন কামদেবের নখের ন্যায় বিরহীদিগের হৃদয় বিদারণের জন্য সাজিয়া রহিয়াছে। নাগকেশরের ফুলগুলি যেন মদন রাজার সুবর্ণ ছাতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। পারুলের বেশ আরও অদ্ভুত। ভ্রমর অধোমুখ হইয়া পারুলের মধুকোষে মধু পান করিতেছে; দেখিলে বোধ হয় যেন স্মরের তূণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু এ শোভা শোভা নয়। বিরহিণী ব্রজবধূদের নিকট বসন্ত দুরন্ত মূর্ত্তিতে উপস্থিত! তাই তাঁহারা দেখিতেছেন, কেতকী-কুসুম বিরহিণীদিগের হৃদয়কর্ত্তন করার জন্যই যেন করাতের মত দন্ত-বিকাশ করিয়া রহিয়াছে। মাধবী ও নবমালিকার পরিমলে মুনির মনও

মোহিত হয়। শ্রীবৃন্দাবনে এমন সরস বসন্তে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধিকার প্রাণ আকুল। তিনি বনে বনে ব্যাকুল ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ ভ্রবণ করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণবিরহে ও পথশ্রমে বিদলিত সুকোমল বসন্ত-কুসুমের ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেছেন।

তিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে অদূরে কুসুমিত কেলিকুঞ্জে "চন্দনচর্চ্চিত নীল-কলেবর পীতবসন বনমালী"কে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু যেরূপ অবস্থায় তিনি তাঁহার দর্শন পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সুখ হওয়া দূরে থাকুক, সহসা ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া যেন তাঁহার আশার স্নিগ্ধ মেঘকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল, ঈর্ষার অন্তর্দ্দাহী অনলে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না, তিনি নিজের আগুন নিজের হৃদয়ে চাপিয়া রাখিলেন। রাসেশ্বরীকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ অপরা ব্রজবধূগণের সহিত রাস করিতেছেন, ইহা দেখিয়া শ্রীরাধা সহ্য কবিতে পারেন কি? তিনি রাসস্থলীতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলহ করিতে পারিতেন, তিনি মান করিয়া "গৌরবিণী মানময়ী" হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এখানেই "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া পায়ে ধরাইতে পারিতেন। ইহার কিছুই না করিয়া শ্রীমতী এই অবস্থা দেখামাত্রই চকিতার ন্যায় বিলাস-কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাল হওয়া মাত্র শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-লালসা বাড়িয়া উঠিল। এক দিকে ঈর্ষা, অপর দিকে প্রাণবল্লভের সুধামধুর মূর্ত্তিদর্শনের বলবতী লালসা তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। যিনি বাগ্‌যুদ্ধে বাক্‌পতি শ্রীকৃষ্ণকে সততই বিমুগ্ধ করেন, সেই শ্রীমতী একটী বাক্যও না বলিয়া নীরবে চলিয়া আসিলেন, ইহা কি তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয় বা লজ্জাশীলতার পরিচয়? বোধ হয় তাহা নহে। ইহা কি তাঁহার মানের পরিচয়? বোধ হয় তাহাও নহে। তবে কি ক্রোধের

পরিচয়? তাহাও সম্ভবনীয় নহে। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতীর ভাব অপার,—সমুদ্র-গম্ভীর।

শ্রীমতী বিদগ্ধা, সুচতুরা, বিনীতা, লজ্জাশীল, মধুরা ও করুণাপূর্ণা। এ স্থলে তাঁহার বিশেষগুণ প্রকটিত হইয়াছে। উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় শ্রীমতী ধৈর্য্যশীলা হইয়াও অধীর হইয়া পড়িতেছেন, তথাপি তিনি অনাদরে রাসস্থলীতে অন্যান্য রমণীদের সহিত যোগ দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মোহন রূপমাধুর্য্য তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় ব্যাকুল ও তাপিত করিয়া তুলিতেছে, তথাপি তিনি প্রেম-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া শ্যামজলধরের সাধারণ রাসে যোগ দিবেন না। জয়-দেবের এই "লীনা দীনা" বিরহোৎকণ্ঠা অথচ সুমর্য্যাদাশালিনী শ্রীমতীর ভাব বৈষ্ণবসাহিত্য ভিন্ন অন্যত্র বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের একটা মর্য্যাদা আছে। সেই মর্য্যাদাই প্রেমের প্রাণ। যাঁহারা ধর্ম্মের "উদার ভাব" উদারভাব" বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা প্রেমের এই মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীমতী জানেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-তমা, তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর আদরের ধন তাঁহার আর নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাকে যোগজিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যান্য ব্রজবধূদিগের সহিত রাসোৎসবে মাতিয়া পড়েন, তবে শঠের এই ব্যবহারে দুঃখ না হয় কাহার? একদিন নান্দীমুখী বলিয়াছিলেন, "সুবদনি, আমি কত যত্ন করিলাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার মিলন করাইতে পারিলাম না, আমি আর কি করিব, এখন নিজের জীবন রক্ষার উপায় কর।" তাহার উত্তরে শ্রীমতী বলিলেন "রাধা-চাতকী বরং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে মরিয়া যাইবে, তথাচ কৃষ্ণমেঘ-মুক্ত অমৃতবর্ষণ ব্যতীত অন্য জীবনোপায় কল্পনা করিবে না"

ইহাই প্রেমের প্রাণ। এখানেই প্রেমের আবদার। রসিক-মহানু

ভাবাগ্রগণ্য শ্রীজয়দেব "দীনা লীনা" বিরহক্ষীণা অথচ সুমর্য্যাদাশালিনী শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধার অমৃতময়ী স্নিগ্ধ গম্ভীর প্রতিচ্ছবি এখানে তদীয় প্রেমিক পাঠকবর্গের ভক্তিপূত মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীমতীর এই ভাবময়ী মূর্ত্তির চরণতলে পড়িয়া সহস্র সহস্র ভক্ত প্রেমতীর্থে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাব বলা যাইতেছে। ঐ অবস্থায় শ্রীমতী প্রাণপ্রিয়তমা সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যের কথা বলিতেছেন। রাসে, তিনি অনন্ত মাধুরীময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ রাসবিলাস আস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা একে একে স্মৃতিপথে আসিয়া তাঁহার মনের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, আর আকুলা কুররীর ন্যায় নয়নজলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের বর্ণনা করিয়া সখীকে শুনাইতেছেন। তাঁহার রাসবিলাসের সকল কথাই মনে পড়িতেছে। তিনি তাঁহার মানসনেত্রের সমক্ষে দেখিতেছেন—

> সঞ্চরদধর- সুধামধুরধ্বনি- মুখরিতমোহনবংশং,
> বলিতদৃগঞ্চল- চঞ্চলমৌলি- কপোলবিলোলবতংসম্।
> চন্দ্রকচারু- ময়ূরশিখণ্ডক- মণ্ডলবলয়িতকেশং,
> প্রচুরপুরন্দর- ধনুরনুরঞ্জিত- মেদুরমুদিরসুবেশম্।

তাঁহার মানসনেত্রে শ্যামসুন্দরের এই ভুবনমোহন রূপ প্রতিভাত হইতেছে, আর চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসা তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি বলিতেছেন "সখি, আমি কি করি, বল? আমার মন যে কিছুতেই সেই বহুবল্লভ শঠকে ভুলিতে পারিতেছে না লম্পট আমাকে ছাড়িয়া অপর গোপবধূদিগের সহিত রাসরসে মত্ত হইয়াছে, আমার মন তথাপি তাহার দোষ না দেখিয়া গুণই গণিতেছে,

ভ্রমেও তো তাহার প্রতি আমার ক্রোধ হইতেছে না? আমি এখন কি করি, বল? আমি ত এখন আর তিলার্দ্ধও তাহার অন্তরালে থাকিতে পারিতেছি না।"

শ্রীমতী অন্তরালে থাকিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু শঠের সমীপে যাইতেও পারিতেছেন না। এ বাধা কিসের? ইহা মানের বাধা নহে, ক্রোধের বাধা নহে, ঈর্ষার বাধাও নহে। এ বাধা প্রেমমর্য্যাদার। এ মর্য্যাদা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ মর্য্যাদা কি পদার্থ তাহা ভাষায় ফুটিবে না। শ্রীমতী বিরহব্যাকুলা, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার মৃণাল কোমল ভুজে প্রাণবল্লভের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিরহ-জ্বালা নিভাইতে পারেন, কিন্তু দুরবগাহ শ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলার সেরূপ তাৎপর্য্য নহে।

শ্রীমতী তখন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

সখিহে কেশিমথনমুদারম্
রময় ময়া সহ মদনমনোরথ- ভাবিতয়া সবিকারম্।

অর্থাৎ "সখি আমি উৎকণ্ঠায় অধীর হইতেছি, আজ উদার প্রিয়তম কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করিয়া দাও।"

মিলনের জন্য শ্রীমতী সখীর শরণপন্ন হইলেন। যিনি কৃষ্ণময়ী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা, তাঁহার বিরহই বা কেন? এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত যে মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা ;—

রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পাই।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

সখী ব্যতীত লীলার বিস্তার হয় না, সখী ভিন্ন লীলার পুষ্টি হয় না। সুতরাং শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য সখীর শরণাপন্ন হইলেন। সখী কে?

আত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বন্ নান্যান্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥

অর্থাৎ যিনি অকপটে আপনা হইতেও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রেম করেন, আর যিনি বিশ্বাস-স্থান, এবং বয়স বেশাদিতে শ্রীরাধিকা সদৃশ, তাঁহাকে সখী বলে।

শ্রীমতী তাই সখীকে সম্বোধন করিয়া নিষ্কপটে হৃদয়ের কথা বলিতে লাগিলেন, প্রাণবল্লভের দেখা পাইলে কিরূপে তাহার সহিত কেলি-বিলাস করিবেন সে সকল কথা প্রাণ খুলিয়া সখীর নিকট বলিতে লাগিলেন:—

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভস-রসেন হসন্তম্।

সখিহে কেশিমথনমুদারম্
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ ॥

"সখি আজ সেই উদার প্রিয়তম কেশিমথনকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করিয়া দাও। প্রাণবল্লভ আমার মনোভাব বুঝিবার জন্য নিশিতে নিভৃতকুঞ্জে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবেন, আমি তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া চারিদিকে চকিতের ন্যায় অবলোকন করিব, আর তিনি আমার উৎকণ্ঠা দেখিয়া রসভরে হাস্য করিবেন। আমি মদন-মনোরথে উৎকণ্ঠান্বিত হইব, আর আমাকে দেখিয়া তাঁহার মনোবিকার উদিত হইবে। সখি, এ সুখ-আস্বাদনের জন্য আমার মন ব্যাকুল হইতেছে, তাঁহার সহিত অবিলম্বে আমার মিলন করিয়া দাও।"

ঐশ্বর্য্য ব্যতীত মাধুর্য্যের বিকাশ ঘটে না। মাধুর্য্য বিকশিত করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি প্রয়োজন, সুতরাং শ্রীমতী এখানে নিজ ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুর কথা মনে করিলেন। যে ভুজের প্রবল প্রভাবে একদিন দুরন্ত কেশী রাক্ষস নিহত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহুর কথা মনে করিতে করিতে প্রিয়তম কেশিমথনের বিশাল ভুজের কথা শ্রীমতীর মনে পড়িল, তাই তিনি বলিলেন ;—

"কেশিমথনমুদারম্"

প্রথম সমাগমে তিনি কিরূপ লজ্জিত হইবেন, কিরূপ মৃদুমধুর স্মিত ভাষায় সম্ভাষণ করিবেন, তাঁহার কুসুমাকুলকুন্তলগুলি শ্লথ হইলে তাঁহার প্রাণবল্লভ কিরূপে তাঁহার আদর করিবেন, এই সকল ভাবতরঙ্গ বায়ুতাড়িত মৃদুল তটিনীতরঙ্গের ন্যায় বন্ধুসমাগমের মোহন আশায় তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি তন্ময় হইলেন, ভাবে বিভোর হইলেন। এই সকল অভিলাষ আকাঙ্ক্ষার কথা বলিতে বলিতেই শ্রীমতীর দিব্যোন্মাদ উদিত হইল। তিনি ভাবে নিমগ্ন হইলেন,

দেখিতে পাইলেন তাঁহার সম্মুখেই যেন তাঁহার প্রাণবল্লভ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাসোল্লাসে মত্ত হইয়াছেন এবং মাথা উঁচু করিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই প্রেমাবেশে তিনি বিহ্বল ও বিবশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হাত হইতে মোহনবাঁশী পড়িয়া গেল, গলদেশ ঘর্ম্মসিক্ত হইল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীমতী বলিলেন "সখি, এই না আমার সেই মনচোরা শঠকে এখনই দেখিতে পাইয়াছিলাম, দেখিলাম ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছেন, সকলেই উৎফুল্লনয়নে তাঁহার রূপসুধা পান করিতেছেন, তখন সহসা আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি সতৃষ্ণভাবে আমার দিকে তাকাইলেন, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার লজ্জা হইল, লজ্জামাখা মুখে বন্ধু হাসিলেন। সখি, বন্ধুর লজ্জা ও হাসিমাখা মুখখানি কি সুন্দর! তিনি বিবশ হইলেন, হাত হইতে বাঁশীটী খসিয়া পড়িল, মণিমুক্তার মোহনমালার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে তাঁহার গণ্ডস্থল ঝলমল করিতে লাগিল। আমাকে দেখিয়া বন্ধুর এমন হইল, ইহা মনে করিয়া বড়ই আনন্দ হইতেছে। সখি, আমার শ্যামসুন্দর এখন কোথায়, এই অশোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবস্তবক এবং উদ্যান ও সরোবরের শীতল বায়ুতে আমার মনের ব্যথা দ্বিগুণ করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে ভ্রমরগুলি গুঞ্জরণ করিতেছে দেখিয়া প্রাণবল্লভের জন্য আমার প্রাণ আরও ব্যাকুল হইতেছে। সখি, বন্ধুয়াকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করিয়া দাও।"

এইরূপে দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভ হইয়াছে। এই সর্গের উপক্রমে শ্রীরাধার সম্ভোগ অভিলাষ অতি মধুর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ভাব যেমন কোমল, ভাষাও তেমনি কোমল। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম-উপভোগের জন্য শ্রীরাধার তৃষ্ণা যেমন বলবতী—সম্ভোগের প্রকার গুলিও তেমনি সুন্দর। আমার ভাষায় উহা পরিস্ফুট হইবে না—এক বলিতে অন্যরূপ

হইয়া পড়িবে। তাহাতে অপরাধের আশঙ্কা আছে। জন-সাধারণ এই সম্ভোগ-অভিলাষ গুলি পাঠ না করেন, ইহাও আমার সবিশেষ অনুরোধ। বহু জন্মের সঞ্চিত সংস্কার আমাদের চিত্তে এমন ভাবে বিজড়িত থাকে যে ঐ সকল সংস্কার সহসা তিরোহিত করিয়া দেওয়া ভগবৎকৃপা ও তদ্ভক্তকৃপা ভিন্ন সম্ভবপর নহে। বদ্ধমূল পাশব সংস্কার লইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের রহঃকেলি পাঠ অতীব অকর্ত্তব্য; বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের রহঃকেলি বর্ণন একবারেই গুহ্যাতিগুহ্য।

অতঃপরের শ্লোকটীতে শ্রীরাধা স্ফূর্ত্তিতে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহারই বর্ণনা। শ্রীরাধার ভাবের ছায়া,—অমরকবি জয়দেবের ভক্তি-সমুজ্জল স্বচ্ছহৃদয়ে উদিত হইয়াছেন; শ্রীরাধার ভাব-স্ফূর্ত্তি ভক্ত কবির হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছেন। তিনি উঁহারই আলোক-চিত্র পাঠকপাঠিকাগণের প্রেম-তৃষ্ণ নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন—ওগো, দেখ দেখ, আমি নিকুঞ্জ-কাননে গোপীবৃন্দসমাবৃত শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন করিতেছি এবং দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে প্রমত্ত হইতেছি। ব্রজবালাগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাস-বিভ্রমে হাতের বাঁশীটী খসিয়া পড়িতেছে। ব্রজবধূরা তাহার প্রতি কুটীল ভ্রূভঙ্গী নিঃক্ষেপ করিতেছে। ভরপুর আমোদ—যেন ভাদ্রের ভরা যমুনা,—কুলে কুলে সে প্রেমানন্দ সলিলের পূর্ণ প্রবাহ—এখনই বুঝি দুকূল ভাসাইয়া সে প্রবাহ মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করিবে। এমন সময়ে আমি উপস্থিত হইলাম। সহসা আমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন। এই অবস্থায় ঈষৎ হাস্যে তাহার মুখখানি আরও মধুর হইয়া উঠিল।"

শ্রীমতীর এই দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শন নয়—স্ফূর্ত্তির দর্শন। ভাগ্যবান্ ভক্তগণ এইরূপ স্ফূর্ত্তির দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। ধ্যানের পরিপাকে

প্রগাঢ় ভাবনা স্ফূর্ত্তিতে পরিণত হয়। মহাবিরহে এই স্ফূর্ত্তিতেই জীবন রাখিয়া দেয়—নচেৎ বিরহের দুরন্ত মরুমরীচিকায় জীবন রাখাই—অসম্ভব হয়।

পরক্ষণেই শ্রীমতীর এই স্ফূর্ত্তির অবসান হইল। চিত্তে আবার বিরহের তুষানল জ্বলিয়া উঠিল—তখন আবার সেই দীর্ঘ-শ্বাস সেই হা-হুতাশ দেখা দিল। তখন তিনি মনের ভাব মনে কতকটা চাপা দিয়া বলিলেন—সখি নব নব স্তবকে ভূষিত সেই অশোক লতাগুলিকে আরতো এখন দেখিতে পাইতেছি না। উপবনের ও সরোবরের স্নিগ্ধ শীতল মধুর বায়ুতেও আমার জ্বালা দ্বিগুণ বাড়াইতেছে। আমের মুকুলগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভ্রমরীগুলি চারিদিক ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে—ইহাতে আমার যাতনাই বাড়িতেছে। শ্রীগোবিন্দ-বিরহে সুখের বস্তুগুলি দুঃখকর হইয়া উঠিতেছে—বল দেখি এখন আমার উপায় কি ?

এই ভাবের অবতারণা করিয়া প্রেমিক কবি দ্বিতীয় সর্গের পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। কবিবর অল্পাক্ষরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা বর্ণন করিয়াছেন। এই উৎকণ্ঠা বর্ণনে আবেগময় অভিলাষ বর্ণিত হইয়াছে—প্রবল অনুরাগের অনুধ্যানে যে স্ফূর্ত্তির উদয় হয়। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যে সম্ভোগ-অভিলাষ জাগিয়া উঠে, এই সর্গে তাহার অতি পরিস্ফুট বর্ণনা করা হইয়াছে। স্ফূর্ত্তির অবসানে বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার মর্ম্ম-যাতনা যে কি জ্বালাময়ী, কবি অতীব সংযত ভাষায় এই সর্গে তাহারও আভাস দিয়া শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা ভাবের চিত্র পাঠকগণের মানসনেত্রের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াই তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগ না থাকিলে প্রেমের স্ফুরণ হয় না। শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ও

তেমনই শ্রীরাধার জন্য ব্যাকুল হইলেন। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির সারাৎসার-রূপা—

হ্লাদিনীর সার-প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—হয় মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপিণী—রাধা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণময়ী রাধা—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥

গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যাকুলতায় শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই মনে হইতেছে। সে ভাব তরঙ্গ এখন চাপিয়া রাখাই ভাল। সুবিধা পাইলে আবার বলিব। এস্থলে এই প্রসঙ্গাধীন শ্রীচরিতামৃত হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয়। শ্রীপাদ রাম রায় মহোদয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে শ্রীরাধাপ্রেমের মাহাত্ম্য বলিতে গিয়া—শ্রীগীতগোন্দির তৃতীয় সর্গের প্রথম দুই শ্লোকেরই অবতারণা করিয়াছেন। উহার মুখবন্ধ এইরূপ যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

রায় কহে তাহাঁ শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে প্রলাপ করিয়া॥
এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠি যেন অমৃতের খনি॥
শত কোটি গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা-পাশ॥

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটীল প্রেমে হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা—রাসলীলা।
রাসলীলা—বাসনাতে রাধিকা—শৃঙ্খলা॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিত॥
ইতস্তত ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইঞা।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং অখিল রসামৃত মূর্ত্তি-সাক্ষাৎ আনন্দ ঘন-বিগ্রহ। কিন্তু শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ একবারেই নির্নিরানন্দমাত্র।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে অতি গুহ্য এক সূক্ষ্মতত্ত্ব লিখিত আছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ অতীব প্রয়োজনীয়; উহা এই :—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন॥
আমা হৈতে যার হয় শতশত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥

আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একাকী রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যত্মপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোররূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশী-গীতে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যত্মপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণে হরে রাধার অঙ্গগন্ধ॥
যত্মপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অঙ্গের রসে আমা করে বশ॥
যত্মপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমায়—করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুভব করেন। এই জন্যই শ্রীরাধা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রগাঢ় ব্যাকুলতা। শ্রীপাদ জয়দেব তদীয় গীতগোবিন্দ কাব্যের তৃতীয় স্বর্গে শ্রীরাধার বিরহে শ্রীকৃষ্ণের যে ব্যাকুলতার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই ব্যাকুলতা-জনক। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বিরহ ব্যাকুল হইয়া কলিন্দ-নন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষাদ-তমসাবৃত মানসে যে বিলাপ করিয়াছিলেন, অজয়তটের অমর কবি তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি গোপ-বধূবৃন্দে পরিবৃতা ছিলেম—আমায়

এই অবস্থায় দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; আমি তাঁহার নিকটে অপরাধী, লজ্জায় তাঁহার সম্মুখে যাইয়া অনুনয়টুকু পর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন আমি তাঁহাকে অনাদর করিয়াছি। আমি যদি বলিতাম, প্রিয়ে তুমি যেও না—তা'হলে তিনি হয়ত যাইতেন না। কিন্তু আমি যে অপরাধী!—ভয়ে ভয়ে সে সাহস পাইলাম না। তিনি অনাদরে চলিয়া গেলেন। জানিনা এই বিরহ ব্যাকুলতায় তিনি কি করিবেন, বা কি বলিবেন? কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমিই বা কি উত্তর দিব? তাঁহাকে ছাড়া ধনেই বা আমার কি হইবে? যদি বল ধন বিনা পরিজন প্রতিপালন হয় না, শোকই হউক, আর যাই হউক, পরিজনের জন্য ধন চাই,—আমি বলি, তাঁকে না পাইলে পরিজন দিয়াই বা কি করিব! যদি বল পরিজন ভিন্ন জীবনইবা কিরূপে রক্ষা পাইবে, সেবাই বা কে করিবে? আমি বলি, তাঁহাকে ছাড়া আমার গার্হস্থ্য-জীবনেরও কোন প্রয়োজন নাই—জীবনেরই যদি প্রয়োজন না থাকিল, তবে গৃহেরই বা প্রয়োজন কি? তাঁহাকে ছাড়া আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমি অনুক্ষণ তাঁহার কোপ-কুটীল মুখখানিরই ধ্যান করিব। এই প্রিয়াহীন স্থানে বিলাপেরই ফল কি? আমি কি বনে বনে তাঁহার অনুসরণ করিব, তাইবা করিব কেন? এই যে তিনি আমার সম্মুখে, তিনি তো আমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান।"

যখন এই স্ফুর্ত্তির অবসান হইল, তখন আবার বিরহ-ব্যথা প্রবল হইল; তখন তিনি আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন—হা প্রিয়ে, আমার মনে হইতেছে তোমার হৃদয় ঈর্ষায় খিন্ন হইতেছে। তুমি যে কোথায়, তাহাতো জানি না, তাই তোমার নিকট অনুনয় করিতেও যাইতে পারিতেছি না।

আবার স্ফুর্ত্তিতে দর্শন পাইয়া তিনি বলিতেছেন হে প্রাণেশ্বরি, এই

যে তুমি আমার সম্মুখ দিয়াই যাতায়াত করিতেছ। তুমি পূর্ব্বে যেমন আমায় দেখিলেই আলিঙ্গন দিতে, এখন সেরূপ আলিঙ্গন না দিতেছ কেন? হে দেবি, ক্ষমাকর, আর কখনও এরূপ অপরাধ করিব না।" বিরহ-ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধা চিন্তা করিতে করিতে রাধাধ্যানে মগ্ন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাকে দর্শন করিতেছিলেন। এই ভাবটী অতি প্রগাঢ়। একটি প্রাচীন পদ্যে লিখিত আছে :—

প্রাসাদে সা পথি পথি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা।
পর্য্যঙ্কে সা দিশি দিশি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য॥
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি তে কাপি সা সা
সা সা সা সা জগতি সকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ॥

অর্থাৎ প্রাসাদে রাধা, পথে পথে রাধা, সম্মুখে রাধা, পশ্চাতে রাধা, পর্য্যঙ্কে রাধা, দিকে দিকে রাধা বিরাজমানা। হে চিত্ত, তোমার আর কোনও অপরা প্রকৃতি নাই, সমগ্র জগতের সর্ব্বত্রই কেবল রাধা রাধা রাধা রাধা দেখিতেছ—এ কেমন এক অদৈতবাদ।

স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকারই বিরহি-বিরহিণীর বিরহ-তপ্ত জীবনের ক্ষণিক শান্তিপ্রদ। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে স্ফূর্ত্তি-ভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণের একটি উক্তি অতি চমৎকার; উহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—

হৃদয়েশ্বরীর সেই স্পর্শসুখ, সেই তরলস্নিগ্ধ দৃষ্টিবিভ্রম, সেই বদন-পঙ্কজের সৌরভ, সেই অমৃতনিস্যন্দিনী বাক্‌চাতুরী, সেই বিম্বাধর-মাধুরী—পূর্ব্বানুভূত সেই সকল বিষয়ই মনে জাগিতেছে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ নাই, ইহা সত্য। কিন্তু মনতো প্রাণেশ্বরীর শ্রীমূর্ত্তি চিন্তাময় সমাধিতেই মগ্ন রহিয়াছে, তথাপি বিরহ-যাতনা বাড়িতেছে কেন?

এই কেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক পক্ষে খুবই সহজ, অপর পক্ষে

খুবই কঠিন। সুখের দিন গুলি উপভোগ্য-সুখ-সম্ভোগ লইয়া চলিয়া যায় কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকে। পূর্ব্বানুভূত বিষয় মনে উপস্থাপিত হওয়াই স্মৃতি। স্মৃতি যদি অভাবজ্ঞাপিকা না হইত, তাহা হইলে যাতনার কোনও কারণ থাকিত না। প্রগাঢ় ধ্যানে এই স্মৃতি—স্ফূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এই স্ফূর্ত্তি যখন প্রগাঢ় সাক্ষাৎদর্শনের অবস্থায় পরিণত হয়, তখনই উহা প্রত্যক্ষানুভবের ন্যায় কার্য্য করে; সেই অবস্থায় অভাব-জ্ঞান থাকে না, অভাব-বোধ-জনিত যাতনাও থাকে না। ধ্যানের ঘনীভূত অবস্থা ভিন্ন এই ভাব লাভ করা যায় না। কবিবর এখানে যে সমাধির কথা বলিতেছেন, তাহা স্মৃতিরই কতকটা উচ্চ অবস্থা মাত্র—উহা পূর্ণাবেশময় সমাধি নহে। এই অবস্থায় প্রিয়তমার অভাববোধ বিদ্যমান থাকে। স্মৃতি কেবল অতীত সম্ভোগের ব্যাপারগুলি মনের দ্বারে সমুপস্থাপিত করিয়া দিয়া যাতনারই বৃদ্ধি করে।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যাকুলতা বর্ণন করিয়াই প্রেমিক কবি এই সর্গের উপসংহার করিয়াছেন। এই দুই অধ্যায়ে আমি শ্রীরাধা ও গোবিন্দের উভয়েরই প্রেমের প্রগাঢ়তা ও বিরহ-ব্যাকুলতার আতিশয্য বিশদ-রূপেই বুঝিতে পারিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়ের দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাতীরে বেতস-কুঞ্জে বিষণ্ণভাবে উন্মত্তবৎ উপবিষ্ট—বিরহ-বেদনায় তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। শ্রীরাধিকার এক নর্ম্ম সখী সেখানে সহসা উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধার অবস্থা বলিতে লাগিলেন :—মাধব, আমাদের সখীর অবস্থা আর কি বলিব, তিনি অনঙ্গের শরভয়ে তোমার ধ্যানে ধ্যানে যেন তোমাতেই লীনা হইয়া রহিয়াছেন। মলয়-সমীর ও চাঁদের কিরণ তাঁহার এখন বিষবৎ বোধ হইতেছে। তোমার ভাবনায় ভাবনায় তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি তাহার হৃদয়ের দেবতা; সেই হৃদয়ে অনবরত মদনের শর নিঃক্ষিপ্ত

হইতেছে। পাছে বা সেই শরা-ঘাতে তোমাকে যাতনা পাইতে হয়, এই ভয়ে তিনি পদ্মপাতায় বক্ষ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সুকোমল কুসুম-শয্যা তাঁহার পক্ষে এখন শরশয্যা তুল্য হইয়াছে। মুখকমলে অবিরল নয়ন-জলধারা বহিতেছে। তিনি সততই বলিতেছেন, মাধব, তোমার চরণে পড়িয়া বলিতেছি, তুমি আমায় বিমুখ হইও না। তুমি এখন সাক্ষাৎ দর্শনের অতীত; তাই শ্রীমতী তোমার ধ্যানে বিভোরা— স্ফুর্ত্তিতে তোমার দেখা পাইয়া কত বিলাপ করিতেছেন। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় কখন বিলাপ করিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন বা বিষণ্ণ হইতেছেন, কখন বা রোদন করিতেছেন, কখনও বা স্ফুর্ত্তিতে তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন—

"বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্"

গীতের শেষে কবি জয়দেব বলিতেছেন যদি কৃষ্ণপ্রেমে চিত্ত অভিষিক্ত করিতে চাও তবে শ্রীরাধার প্রতি এই সখীবচন পাঠ কর। এই সকল কথায় গম্ভীরামন্দিরস্থ শ্রীগৌরাঙ্গের চিত্রই মনে পড়ে। সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর শ্রীগৌর সুন্দর রাধা-প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কত ভাবই প্রকটন করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবসাগরে প্রবেশ করিতে হইলে গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবলী মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। শ্রীগৌরচন্দ্রও কখন বিলাপ করিতেন, কখন বা হাসিতেন, কখন বিষণ্ণ থাকিতেন, কখনও রোদন করিতেন, কখনও চঞ্চল ভাবে ধাবিত হইতেন, কখন বা আহ্লাদে নৃত্য করিতেন।

মহামহোপাধ্যায় শঙ্করমিশ্র মহাশয়, শ্রীরাধার এই ভাবকে কিল-কিঞ্চিত ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং একই সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডলে এই সকল ভাব ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল কেন, তাহারও ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। তিনি তদীয় টীকায় লিখিয়াছেন শ্রীরাধা বলিতেছেন, "শঠ, এত কাল যাহাদের সহিত আমোদপ্রমোদে মত্ত ছিলে, এখন সেখানে যাও, এখানে কেন ?" এই বলিয়া তিনি রোদন করিলেন—তৎপরক্ষণেই মনে করিলেন আমার এই ভৎর্সনায় যদি প্রাণবল্লভ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যান—ইহা ভাবিয়া হাসিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার মনে হইল তাঁহার হাসি দেখিয়া যেন শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন —দাঁড়াইলেন বটে কিন্তু সম্মুখে আসিয়াও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন না বা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিলেন না—এই অবহেলা মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া বসিলেন, এবং কিরূপে ইহাঁকে বশীভূত-করা যায় ইহাই মনে বিচার করিয়া দেখিলেন রোদন ভিন্ন আর অবলার কি বল আছে—তখন অমনি ঠোঁঠ ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে রোদনেও শ্রীকৃষ্ণের ঔদাস্য গেল না—তখন তিনি উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে লাগিলেন, মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যাইতে দেখিলে হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিবেন। শ্রীরাধিকা স্ফূর্ত্তিতে তাহাই দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন আমি তোমারই চিরদিন,—চিরদিন তোমারই অধীন—এ চিরদিনের আশ্রিত-জনকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে ? শ্রীরাধা স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের এই অনুনয়ে নিজের হৃদয়ের তাপ দূর করিয়া প্রফুল্ল হইলেন। কিন্তু ইহা স্ফূর্ত্তির দর্শন। নিশার সুখের স্বপ্নের ন্যায় স্ফূর্ত্তির অবসান হইল—আবার যে বিরহ— সেই বিরহ,—আবার সেই মর্ম্মদাহিনী ভীষণ জ্বালা !

শ্রীরাধার হৃদয়ে আবার বিরহের অনল জ্বলিয়া উঠিল—নিজের দেহ তাহার নিকটে বিষবৎ বোধ হইল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন, সজল-মলিন নয়নে সতৃষ্ণভাবে এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মৃগী যেমন কোমল চঞ্চল সতৃষ্ণ নয়নে

চারিদিকে নিরীক্ষণ করে, শ্রীরাধার চাহনীতে সেই ভাব দেখা দিল। তিনি করতলে কপোল রাখিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় তাঁহার মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া পড়িল। তিনি হা হরি,—হা হরি বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন আর বলিলেন,—হরি হরি বলিয়া যদি মরণ হয়, তাহাও ভাল! 'অন্তে মতিঃ সা গতিঃ'—কেন না, এ জন্মে তো বিরহে বিরহেই মরিলাম, তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে যদি আর জন্মে তাঁহাকে পাই—তাহাও মঙ্গল। পর জন্মেও যেন এই নিঠুর শঠ লম্পটই—আমার বল্লভ হন,—এই অভিলাষময়ী প্রার্থনা করিয়া আমার মরণও মঙ্গল।"

শ্রীমতী রাধার বিরহের এই তীব্র বেদনা প্রেমিক কবি জয়দেব ব্রজ-রসে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াই লিখিয়াছেন। এই বর্ণনা—প্রত্যক্ষ তুল্য। অতঃপরে আর একটি পদ্যে বিরহের দশ দশা বর্ণিত হইয়াছে। সে পদ্যটি এই :—

> সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি।
> ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্যাতি মূর্চ্ছত্যপি॥
> এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিং তে রসাৎ।
> স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ॥

হে কৃষ্ণ, শ্রীরাধার বিরহ জ্বর অতীব গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তিনি কখনও রোমাঞ্চিতা হইতেছেন, কখনও চীৎকার করিতেছেন, কখনও বা বিলাপ করিতেছেন, কম্পান্বিতা হইতেছেন, কখনও বা খিন্ন হইতেছেন, ধ্যানের ন্যায় স্তম্ভিত হইতেছেন, ভ্রান্ত হইতেছেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইতেছেন; একবার শয্যা হইতে উঠিতেছেন, আবার ঢলিয়া পড়িতেছেন, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইতেছেন—হে কৃষ্ণ তুমি তো সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি-তুল্য—তুমি যদি রস-প্রয়োগ কর, তবে আমাদের সখী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন আর

তুমি যদি প্রসন্ন না হও, তবে আমাদের মুষ্টিযোগে এখন কোনও ফলের আশা দেখিতেছি না।

নৃপতি কুম্ভকর্ণ এই সকল অবস্থাকে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্রও প্রথমতঃ বিরহের দশ অবস্থার সঙ্গে সাম্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; দ্বিতীয় উপক্রমে সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় লক্ষণগুলির অর্থ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ এই বিরহজ্বরে শ্রীমতীর দশম দশার আশঙ্কা প্রদর্শন করিয়া কবিবর উপেন্দ্রবজ্রচ্ছন্দে অপর একটি পদ্য লিখিয়া বলিতেছেন—তুমি ধন্বন্তরি-তুল্য সদ্বৈদ্য—তোমার অঙ্গস্পর্শমাত্র আমাদের সহচরী আরোগ্য লাভ করিতে পারেন, তাও যদি না কর তবে বুঝিব তোমার হৃদয় উপেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠিন।

ইহার পরের পদ্যে সখী জানাইতেছেন, তোমার দেহ চন্দন হইতেও শীতল। এই ভীষণ জ্বরে শ্রীরাধা কেবল তোমারই ধ্যান করিতেছেন, কেবল তোমার ধ্যানেই প্রাণ রক্ষা করিতেছেন।

অতঃপরের পদ্যের ভাবার্থ এই যে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরাধা ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিরহ-ব্যথা সহ্য করিতে পারিতেন না; এমন কি নয়নের নিমেষ-কাল-টুকুও তাঁহার নিকট কোটিযুগ বলিয়া গণ্য হইত। তিনি এখন মুকুলিত আম্রশাখা দেখিয়াও যে জীবিত আছেন—ইহাই আশ্চর্য্য।"

শ্রীরাধার সখী দ্বারা এইরূপে শ্রীরাধার বিরহ যাতনা বর্ণনা করিয়া কবি এই অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। পঞ্চম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় নিবেদন করার জন্য শ্রীরাধার নিকটে সখীর গমন ও তাঁহার অনুনয়-জ্ঞাপন বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গে সখী, শ্রীমতী রাধাকে বলিতেছেন :—

সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী

দহতি শিশির-ময়ুখে মরণ মনুকরোতি।
পততি মদন বিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি॥

সখি তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। চন্দ্র দেখিলে তোমার মুখচন্দ্র তাহার মনে পড়ে; আর সেই নিদারুণ স্মৃতিতে তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়েন, মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করেন। ভ্রমরগুঞ্জনে কর্ণ আবরণ করেন, প্রতি নিশিতেই তাঁহার এ যাতনা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে,—

বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণী-শয়নে বহু বিলপতি তব নাম॥

তিনি মনোহর বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, দুগ্ধফেন-নিভ সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন এবং সর্ব্বদাই তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতেছেন। তোমাদের সেই বিলাস নিকুঞ্জই—এখন তাঁহার পক্ষে মন্মথ-মহাতীর্থ-পীঠ;—সেই পীঠস্থানে বসিয়া তিনি তোমার নামময় মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করিতেছেন, এবং দিবানিশি তোমারই শ্রীমুখ-পঙ্কজ-ধ্যানে বিভোর রহিয়াছেন। সুতরাং হে সখি তুমি আর গমনে বিলম্ব করিও না। বৃক্ষের মর্ম্মর-পত্র-রবেও তিনি তোমারই পদধ্বনি মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। তাহার চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কুঞ্জে ও কুঞ্জের বাহিরে গমনাগমন করিতেছেন এবং তোমার পথ-পানে চেয়ে আছেন। তুমি আর বিলম্ব করিও না, সঙ্কেত স্থানে সত্বরে গমন কর।" শ্রীকৃষ্ণের এই উৎকণ্ঠা-ভাব বর্ণনায় পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ-সর্গে শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জা নায়িকা'-অবস্থার বর্ণন। ইহাও অতীব কবিত্বময়। ইহা পাঠে বিরহিণীর হৃদয় অধীর ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ সর্গের দৃশ্য এই যে—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণানুরাগে উৎকণ্ঠিত ভাবে লতা-

গৃহে আসীনা। শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে যাইবার জন্ত অতি উৎকণ্ঠিতা হইলেও তিনি এত অধিক দুর্ব্বলা যে তাঁহার নিকটে যাইতে অত্যন্ত অসমর্থা। সখী শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে শ্রীরাধার এই অবস্থা বর্ণন করিতেছেন—হে কৃষ্ণ, শ্রীরাধা বিষণ্ণা ও অবসন্না হইয়া লতাগৃহে পড়িয়া রহিয়াছেন, সতৃষ্ণ নয়নে দশদিকে তোমায় দেখিবার জন্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন, সর্ব্বত্রই তোমায় দর্শন করিতেছেন।" এই স্থানে টীকাকার কৃষ্ণকর্ণ একটি প্রাচীন শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা এই :—

> সঙ্গম-বিরহ-বিবেকে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
> সঙ্গে সাপি তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

অর্থাৎ বিরহিজনের পক্ষে সঙ্গম ভাল কিংবা বিরহ ভাল, ইহার বিচার করিতে হইলে সঙ্গ অপেক্ষা বিরহই ভাল; কেননা, সঙ্গে কেবল এক স্থানেই একমাত্র তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিরহে সর্ব্বত্রই প্রণয়ী প্রণয়িণীকে এবং প্রণয়িনী প্রণয়ীকে দেখিতে পান। এস্থলেও শ্রীমতী রাধার সেই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি বিষাদে অবসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি তোমায় দেখিবার জন্ত সাহস করিয়া যদি চলিতে উপক্রম করেন, তবে দু-এক-পা চলিয়াই পড়িয়া যান। কেবল তোমার পূর্ব্বানুভূত রতিকলা স্মরণ করিয়া সেই আশায় কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন। তিনি বারম্বার তোমার বেশভূষাদি পরিধান করিয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তুমিই যে তিনি,—তাহাই ভাবিতেছেন।"

প্রেমের এই অবস্থাটা কতকটা অদ্বৈতবাদীদের সোঽহং চিন্তার ন্যায়। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। যিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, তাঁহার বিরহে সর্ব্বদাই তাহার কথা মনে পড়ে। তখন তাহার ভাবটিই সমস্ত জ্ঞানবৃত্তি অধিকার করিয়া লয়; বাহ্য জ্ঞান—এমন কি আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত

তিরোহিত হইয়া যায়; তখন কেবল সেই প্রিয়জনই জ্ঞানের একমাত্র বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন। এই অবস্থার নাম তন্ময়ত্ব। এই অবস্থায় প্রেমিক বা প্রেমিকার পক্ষে প্রিয় জনের অনুকরণ লালসা বলবতা হইয়া উঠে। রসশাস্ত্রে ইহারই পারিভাষিক নাম—লীলা। তাই কবিবর লিখিয়াছেন—

মুহুরবলোকিত মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥

শ্রীগোবিন্দকে ভাবিতে ভাবিতে "সেই গোবিন্দই আমি"—এইরূপ ভাবনা হয়। ইহাও "সোঽহং" ভাবনার ন্যায়। ইহাকে ভক্তি শাস্ত্রে "অহং-গ্রহোপসনা" বলে। কিন্তু ভক্তগণ তাহা চাহেন না, প্রত্যুত উহার নিন্দাই করেন। যদিও ভাব বিশেষের প্রবাহে অভেদ কল্পনার উদয় হয় কিন্তু সেই অভেদে ভেদের জ্ঞান প্রবলভাবেই থাকিয়া যায় অথচ সর্ব্বভাবেই কেবল প্রিয়জনের ভাবনাই বলবতী হইয়া চিত্ত-ক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া লয়। ব্রজরসোপনায় নির্ভেদ অদ্বৈতভাবের স্থান নাই। প্রিয়ানুকরণ কেবল প্রেমাধিক্যেরই তন্ময়ত্বময় ফল। ইহার পরেই লিখিত আছে :—

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পম্।
হরি রূপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥

শ্রীমতী ঘোর অন্ধকারকেই শ্যাম জলধর মনে করিয়া—'এই আমার হরি আসিয়াছেন' ইহাই ভাবিয়া অন্ধকারকেই চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন।" এই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের অবস্থা চিন্তা করিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। ইহাও দিব্যোন্মাদের লক্ষণই বলিতে হইবে। সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম—যে প্রেমে এইরূপ অবস্থা জন্মাইয়া প্রেমিককে বা প্রেমিকাকে ইহজগৎ হইতে প্রেমময় জগতে তুলিয়া লইয়া কেবল প্রেমেরই প্রসার

বিস্তার করে। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম যেন জাম্বুনদ হেন
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥

মেঘ দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভ্রমের কথা অনেক স্থলে দেখা যায়। এস্থলে প্রথমতঃ অন্ধকারকে শ্যাম-মেঘ মনে করা হইয়াছে, শ্যামমেঘকে আবার স্বয়ং শ্যামসুন্দর মনে করিয়া শ্রীরাধা উহাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন—একবারেই ভীষণ ভ্রান্তিমৎ চিত্ততা। এ ভাবের তুলনা নাই!

কবিবর এই সর্গে বাসকসজ্জা নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। রসশাস্ত্রে বাসকসজ্জা নায়িকার যে সকল লক্ষণ আছে—সেই সকল লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কবি এই ষষ্ঠ সর্গ রচনা করিয়াছেন। এই গীতটীর অন্তিমেও লিখিত হইয়াছে—"বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা" অর্থাৎ বাসকসজ্জা শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন ও রোদন করিতেছেন" বাসকসজ্জা নায়িকার লক্ষণ রসালঙ্কারগ্রন্থমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারগণের মধ্যে নৃপতি কুম্ভকর্ণ ও শঙ্কর মিশ্র বাসকসজ্জার লক্ষণ দিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র রসার্ণব সুধাকর গ্রন্থ হইতে একটী লক্ষণ দিয়াছেন সে লক্ষণটী তত ভাল বোধ হইল না। কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত লক্ষণটী মন্দনয় উহা এই :—দূতীমহরহঃ প্রেক্ষ্য সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
যস্যা ন মিলতি প্রেয়ান্ সা হি বাসকসজ্জিকা॥

বাসগৃহে সজ্জিত হইয়া যিনি দূতীর অপেক্ষা করিতেছেন অথচ প্রিয় প্রণয়ীর আগমন হইতেছে না; এই অবস্থায় স্থিতা নায়িকা বাসকসজ্জা নামে কথিতা হয়েন—

১। সাহিত্য দর্পণকার লিখিয়াছেন—

কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সাতু বাসকসজ্জা স্যাদ্‌বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥

২। কবি কর্ণপুর তদীয় অলঙ্কার কৌস্তুভে লিখিয়াছেন—

বাসগেহে বেশভূষাতাম্বুলবসনাদিভিঃ।
সুসজ্জাঽপেক্ষতে কান্তং সা স্যাদ্বাসকসজ্জিকা ॥

বেশভূষাতাম্বুল ও বসনাদি দ্বারা সুসজ্জিতা হইয়া যে নায়িকা বাস গৃহে কান্তের অপেক্ষা করে তাহাকে বাসকসজ্জা কহে।

২। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয়-কৃত উজ্জল নীলমণি গ্রন্থ হইতেও বাসক-সজ্জার লক্ষণটী দেওয়া যাইতেছে—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥
চেষ্টাচাস্যাঃ স্মরক্রীড়া সঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণং।
সখীবিনোদ বার্ত্তাচ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥

শ্রীমৎ নারায়ণ কবিরাজ তদীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী টীকাতেও ইহার একটী লক্ষণ দিয়াছেন :—

যা বাসবেশ্মনি সুকল্পিততল্প-মধ্যে
তাম্বু বনপুষ্পবসনৈঃ সমমস্তি সজ্জা
কান্তস্য সঙ্গসময়ং সমবেক্ষমানা
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসকসজ্জা

বাসকসজ্জা নায়িকার—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ গুলি পূর্ণরূপে প্রকাশের জন্য কবি অন্য একটি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন :—

অঙ্গেষ্বাভবরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণী
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।

ইত্যাকল্পবিকল্প-তল্প-রচনা-সঙ্কল্প-লীলা-শত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥

অর্থাৎ তিনি পুনঃপুনঃ অঙ্গে আভরণ ধারণ করিতেছেন, গাছ হইতে পাতা পড়িলে সেই শব্দে চকিত হইয়া তুমি আসিয়াছ—ইহাই মনে করিয়া শয্যা করিতেছেন, দীর্ঘ সময় তোমার ধ্যান করিতেছেন। তিনি এই প্রকারে তোমার আগমন-আশা করিয়া তদুচিত বেশ-বিন্যাস ও শয্যা রচনা ও নানাবিধ সঙ্কল্পচিন্তায় আসক্ত থাকিয়াও তোমার বিরহে কোনও প্রকারে নিশা অতিবাহিত করিতে পারিতেছেন না।

কবি ষষ্ঠ অধ্যায় বাসকসজ্জা-নায়িকার অবস্থা বর্ণনে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ইহাতেও বিরহের ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। বিরহে যখন মিলনের আশার সঞ্চার হয়, তখন প্রাণেশ্বরের আগমনের সম্ভাবনা করিয়া প্রাণে কতই কর্ত্তব্যতার উদয় হয়, এ অবস্থাটী বিরহেও কতকটা আশার অবস্থা।

কবি এই অবস্থার পরেই সপ্তমসর্গে বিপ্রলব্ধার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সপ্তম সর্গের প্রথম দৃশ্য—চন্দ্রোদয়। চন্দ্র স্বীয়-সুধাংশু-কিরণে শ্রীবৃন্দাবন-বিপিন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন; শ্যামল বনানী চন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চন্দ্রোদয়ে মনে হইল দিক্ সুন্দরীর বদন মণ্ডল শ্রীখণ্ড তিলকে পরিশোভিত হইয়াছে। মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রে কলঙ্ক দেখিয়া ইহাও মনে হইল যে যিনি অপরের অমঙ্গল করেন, তাঁহাকেও সেই পাপে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করিতে হয়।

শ্রীরাধা দূতী পাঠাইয়াও শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া হতাশ হইলেন—তাঁহার মনে কত প্রকার দুর্ভাবনা হইতে লাগিল। তিনি নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন—"আমার প্রাণ বন্ধু এখনও আসিলেন না কেন,—আমি তাঁহার আগমন-আশায় কত আশা করিয়া সঙ্কেত কুঞ্জে

অপেক্ষা করিতেছি, সখীও তাঁহাকে তাহা জানাইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাকে না দেখিয়া ক্ষণার্দ্ধও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। যদি তিনিই না আসিলেন তবে আমার এই রূপেই বা কি প্রয়োজন, যৌবনেই বা কি প্রয়োজন? আমি এখন কি করি, কোথায় যাই—কাহারই বা শরণ গ্রহণ করি—আমি কি আগুনে প্রবেশ করিব, কিম্বা জলে ঝাঁপ দিব—যমও তো আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। সখী বলিয়া গেলেন, তুমি এই সঙ্কেত স্থানে অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণেশ্বরকে লইয়া আসিতেছি। সখীরা আমায় আশা দিয়া অভিসার করাইয়া বনে আনিলেন—এখানে আনিয়া তাঁহারও কি আমায় প্রতারণা করিলেন? যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, যাঁহারা দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী, যাহাদের নিস্বার্থ ভালবাসা, যাঁহারা সমবয়স্কা এবং হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারেন তাঁহারাই সখী। যাহাদিগকে এমন সখী বলিয়া মনে করি, তাহারাও আমায় বঞ্চনা করিলেন? তবে এখন কি উপায় করি? যাহার মিলন আশায় এই ঘোর নিশিতে এই গহন কাননে আসিলাম—সেই প্রাণের সখা আর তো আমায় দেখা দিলেন না! এখন আমার মরণই ভাল, এ জীবনের আর প্রয়োজন কি? আর যে আমি এ বিরহ-যাতনা সহিতে পারি না! এ বিষম দুঃসহ বিরহ আমি কি প্রকারে সহ্য করিব? এই জোছনা-হাসিনী মধু-যামিনী আমার আরও অধিকতর যাতনার কারণ হয়ে উঠেছে। সেই রমণী পুণ্যবতী যিনি আজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখ আস্বাদন করেন। আমি এই বলয়াদি অঙ্গভূষণ আর অঙ্গে ধারণ করিব না। শ্যাম-বিরহানলে এই সকল ভূষণ আমার নিকট অতীব যাতনাজনক হইতেছে। আমার এই কুসুম-সুকুমার দেহ এখন যেন ফুলের মালাতেও বিষম স্বভাব কন্দর্প শরের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। কন্দর্প-শরের আঘাত যে কি ভীষণ, তাহা বুঝাইবার যো নাই, অন্য অস্ত্রের আঘাতে দেহে চিহ্ন হয়, কিন্তু

কন্দর্পের ভীষণ শরে মনে যে যাতনা হয়, অন্য কেহ তাহা দেখিতে পায় না, ইহার স্বভাব এমনি বিষম। আমি তাঁহারই তরে ঘোর নিশিতে কণ্টকিত কাননে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু তিনি এখন আমার কথা একটীবার মনেও আনিতেছেন না। আমায় ধিক্।"

শ্রীবৃন্দাবন-লীলা-কাব্যের মহাকবি যে বৃন্দাবনীয় পদ-মাধুর্য্যে এই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, সেরূপ শব্দমাধুর্য্যে ইহার অনুবাদ অসম্ভব। বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষার অতি নিকটবর্ত্তিনী—সুকোমলা আত্মজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—সেই বঙ্গভাষা ও মূলের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া জয়দেবের কাব্য-সুধার পদমাধুর্য্য বাঙ্গালী পাঠকদিগের জ্ঞানগোচর করিতে অসমর্থা। যদিও বাহুল্য ভয়ে আমি অন্যান্য পদগুলি উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করি নাই—কিন্তু এই সুধামধুর গীতিটি উদ্ধৃত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। ইহার আবৃত্তিতেও ভক্তি-রসে ও প্রেম-মাধুর্য্যে হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। শ্রীমতী বলিতেছেন :—

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং
মম বিফলমিদ মমল রূপমপিযৌবনম্।
যামি হে কমিহ শরণং সখীবচনবঞ্চিতা॥ ১ ॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয় মিদমসমশর-কীলিতম্॥ যামি হে ২॥॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিতি বিষহামি বিরহানলমচেতনা।
মামহহ বিধুরয়তি মধুরা মধুযামিনী।
কাপি হরি মনুভবতি কৃত-সুকৃত-কামিনী॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহু দূষণম্॥

কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু-শর-লীলয়া ।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা ।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী ।
বসতু হৃদি যুবতীরিব কোমলকলাবতী ॥

কবি জয়দেবের পদমাধুর্য্যের তুলনা নাই—কেবল শব্দবিন্যাস-লালিত্যই ইহার অসাধারণ গুণ নহে—শব্দমাধুর্য্যের অনেক উপরে বিরাজমান—ইহার ভাব-রসমাধুর্য্য। যাহারা এ ভাবরস-মাধুর্য্যে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে কাব্য পাঠ বা কাব্য সমালোচনা এক মহা বিড়ম্বনা। শ্রীবৃন্দাবন প্রকৃতপক্ষেই মহাকবির কাব্য-কুঞ্জ। শ্রীবৃন্দাবন-লীলাও কাব্য-রসের চরম বিষয়। যিনি শ্রীবৃন্দাবন-কাব্যের নায়ক, তিনি স্বয়ং চিরগৌরবার্হ—সেই পরব্রহ্মতত্ত্বের চরমসিদ্ধান্তপ্রতিপাদ্য নিখিল রস-সার—"রসো বৈ-সঃ"—সেই শ্রীশ্রীঅখিলরসামৃতমূর্ত্তি-প্রেমিকভক্তমানস-সরো-বিহারী শ্রীগোবিন্দ। এই কাব্য মরজগতের কাব্য নহে—মানবের অসম্পূর্ণ ভাষায় ইহার মহিম-গরিমা অভিব্যক্ত হইবার নহে—পাশব মানব বুদ্ধিবৃত্তি এই কাব্য-মাধুর্য্যের ত্রিসীমাতেও প্রবেশ-লাভ করিতে অধিকার পায় না। আমি এই অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কাব্যপাঠে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলাম না। আমার চিরবিরহের জীবন। ইহার উপরে উঠিবার আমার আর অধিকার নাই। বিপ্রলব্ধা অবস্থা পর্য্যন্তই আমার পাঠের অধিকার। উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহা বিপ্রলব্ধা অবস্থারই বর্ণনা। রসশাস্ত্রকারগণ বিপ্রলব্ধার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণে লিখিয়াছেন—ভাষার বিভিন্নতা অবশ্যই আছে, কিন্তু মূল ভাবের বিভিন্নতা নাই।

১। সাহিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন :—

প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সঙ্কেতং যস্যাঃ নায়াতি সন্নিধিং।
বিপ্রলব্ধাতু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা॥

২। নৃপতি কুম্ভকর্ণের টীকায়—

প্রেক্ষ্য দূতীং স্বয়ং দত্বা নিকেতং নাগতঃ প্রিয়ঃ।
যস্যাস্তেন বিনা দুস্থা বিপ্রলব্ধাতু সা মতা॥

৩। শঙ্কর মিশ্রের রসমঞ্জরী টীকায়—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দয়িতে ব্যথিতা তু যা।
বিপ্রলব্ধেতি সাপ্রোক্তা বুধৈরস্তাস্ত বিক্রিয়া॥

৪। পূজারী গোস্বামীর বালবোধিনী টীকায়—

অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং
সরভসমভিধায় কাপি সাঙ্কেতিকং যা
ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈব-যোগাৎ
বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাম্।

৫। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাৎ জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনিষিভিঃ।
নির্ব্বেদচিন্তাখেদাশ্রুমূর্চ্ছা-নিশ্বসিতাদিভাক্॥

৬। শ্রীমৎকবিকর্ণপুরকৃত অলঙ্কার কৌস্তুভে—

দূতিভিঃ প্রার্থ্যমানোঽপি গন্তাস্মীত্যুক্তবানপি।
দৈবান্নায়াতি যৎকান্তো বিপ্রলব্ধেতি সাস্ম॥

অর্থাৎ দূতীগণের দ্বারা প্রার্থ্যমান হইয়া এবং স্বয়ং গমনের অঙ্গীকার করিয়াও যাঁহার কান্ত দৈবাৎ আগমন না করেন, সেই নায়িকাকে বিপ্র-

লজ্জা বলা যায়। ইহার অনুভাব—নির্ব্বেদ, চিন্তা খেদ, অশ্রু মূর্চ্ছা দীর্ঘ নিশ্বাস ও হাহুতাশাদি।

শ্রীকৃষ্ণের আগমন বিলম্বে শ্রীরাধার মনে নানাপ্রকার আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। শ্রীরাধা ভাবিতেছিলেন তাহার তো আসিবারই কথা—কোন্ দৈবঘটনায় যে তিনি এখনও আসিলেন না, তাহাতো বলা যায় না। এই সময়ে তাঁহার চিত্তে সংশয়ের যে সকল হেতু হইয়াছিল—শ্রীপাদ কবিবর তাহাও যুক্তিযুক্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

তৎকিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিম্বাকলাকেলিভি
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃত-মঞ্জু-বঞ্জুললতা-কুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ!

শ্রীকৃষ্ণ মঞ্জুবঞ্জুললতা-গৃহে আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াও এলেন না কেন? তিনি কি অপর কোন কামিনীর অভিসারে গমন করিয়াছেন কিম্বা কলাকেলি-রসেই কোথাও মগ্ন হয়েছেন? অথবা বন্ধুগণের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছেন কিম্বা ঘনতর তরুচ্ছায়ায় নিবীড় অন্ধকারে বন-পথে সঙ্কেত স্থান ঠিক করিতে না পারিয়া বনে বনেই ভ্রমণ করিতেছেন অথবা আমার বিরহে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন সেইজন্য চলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। বোধ হয় শেষেরটি ঠিক।"

আহা শ্রীরাধার প্রণয়-মাধুর্য্য ও প্রেমৌদার্য্য কি মধুর, কি সুন্দর, কি চমৎকার! দ্বিতীয় সর্গে বলা হইয়াছে ঃ—

গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে।
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ॥
যুবতিষু বলৎতৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্?

সখি, আমার চিত্ত এখনও সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্যই ব্যাকুল. বল দখি এখন করি কি ? আমিতো বুঝিতেই পারিতেছি, কৃষ্ণ গোপী যুবতিতেই আসক্ত—আমাতে তার মন নাই ; তথাপি আমার চিত্ত তাহাকেই চায় ! চিত্তও প্রতিকুল হইয়াছে। কৃষ্ণ শত অপরাধে অপরাধী কিন্তু তাহার দোষ ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার গুণগুলিই দেখিতেছি, ভ্রমেও তাঁহার প্রতি কুপিত হইতেছি না। তাহার প্রতি চিত্ত অসন্তুষ্ট না হইয়া পরিতুষ্টভাবই প্রকাশ করিতেছে ; তাহার দোষগুলি দূরে পরিহার করিতেছে।

ইহা উৎকণ্ঠিতা ও উৎকা নায়িকার লক্ষণ। তাহা এই যে :—

১। উদ্দাম-মন্মথ মহাজ্বর-বেপমানং
রোমাঞ্চ কণ্টকিতমঙ্গকমাবহন্তীম্
সংবেদ বেপথুঘনোৎকলিকাকুলাঙ্গীং
উৎকণ্ঠিতাং বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ
উৎকা ভবতি সা যস্যা বাসকেনাগতঃ প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্ত্যাকুলা যথা॥

সপ্তম সর্গ হইতে উদ্ধৃত "তৎকিং কামপি" ইত্যাদি শ্লোকটী উৎকার লক্ষণ। "গণয়তি" ইত্যাদি শ্লোকটী দ্বিতীয়সর্গ হইতে উদ্ধৃত। উহা উৎকণ্ঠিতার লক্ষণ। দ্বিতীয়সর্গে এই পদ্যের পরের গীতিকাটী উৎকণ্ঠিতা নায়িকার উদাহরণ। আমি প্রথমতঃই সেই উৎকণ্ঠা ভাবের বর্ণনার মর্ম্ম বলিয়াছি।

২। সাহিত্য দর্পণে—
আগন্তুং কৃতচিত্তোহপি দৈবান্নায়াতি চেৎপ্রিয়ঃ॥
তদনাগমদুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥

৩। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপোবেপথুর্হেতুতর্কণম্
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ।

৪ অলঙ্কার কৌস্তুভে

প্রিয়ানুরাগা প্রাগেব লব্ধসঙ্গাপি হৈতুকে,
বিরহে বর্দ্ধিতোকণ্ঠা বিরহোৎকণ্ঠিতা মতা ॥

সপ্তম সর্গের শেষভাগেও বিরোৎকণ্ঠার ভাবময় পদ্য দৃষ্ট হয় যথাঃ—

রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলঃ
বিষমিব সুধারশ্মি র্যস্মিন্ দূনোতি মনোগতে।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ
কুবলয় দৃশাং বামঃ কামো নিকামো নিরঙ্কুশঃ।

অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার প্রতি নির্দ্দয়, কিন্তু আমার চিত্ত তাহাকেই চায়। এ দোষ আমার নিজের ভিন্ন আর কাহারও নহে। যাহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সখীরা শত্রুর ন্যায় হইলেন, সুস্নিগ্ধ সমীরণ বহ্নির ন্যায় হইল, চন্দ্রের শীতল কিরণ বিষের ন্যায় যাতনাজনক হইল, সেই নিঠুর হরির প্রতি যখন আমার চিত্ত সবেগে আকৃষ্ট হইতেছে, তখন নিঃসন্দেহেই বুঝা গেল—বিচার বুদ্ধি না থাকায় স্ত্রীদের প্রিয় সঙ্গাভিলাষ অতীব দুর্দ্দমনীয় ও প্রতিকূল।

শ্রীকৃষ্ণের অনাগমনে শ্রীরাধার প্রিয় সখী যখন বিষন্না হইয়া পড়িলেন তখন শ্রীরাধা বলেন :—

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠ স্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দো বহুবল্লভঃ স রমতে কিংতত্র তে দূষণম্?

পশ্চাদপ্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ
রুৎকণ্ঠার্ত্তি-ভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি।

হে সখি, হে দূতি, সেই নিঠুর শঠ লম্পট হরি আসিল না বলিয়া তুমি দুঃখ করিও না। সে শতঘরিয়া বহুবল্লভ লম্পট নাগর যেখানে সেখানে রমণ করুক, তাহার না আসায় তোমার দোষ কি? তুমি,— এই দেখ না কেন,—সেই প্রিয়তমের গুণে আকৃষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠার আবেগে আমার চিত্তই প্রিয়সঙ্গমার্থ চলিয়া যাইতেছে।

উৎকণ্ঠিতার শেষ কথা :—

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহংপুনরাশ্রয়িষ্যে
কিংতে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া, তরঙ্গৈ
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ।

মলয়ানিল, আর এখন আমি তোমায় ভয় করি না, যত পার, পীড়া দাও; পঞ্চবাণ, তোমার ভয়েও ভীত হইতাম, কিন্তু এখন তুমি তোমার সংমোহন, ক্ষোভন, দহন, শোষণ ও উচ্চাটন এই পঞ্চবাণ দ্বারা আমার পঞ্চ প্রাণ হরণ কর;—আর তোমার জ্বালার ভয় রাখি না; যমভগিনী যমুনে, তোমারই বা আর এখন দয়ার প্রয়োজন কি? এই কৃষ্ণ উপেক্ষিতা রাধার আর জীবনে প্রয়োজন নাই; তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি আমায় তোমার গর্ভে নিমগ্ন কর,—এ পোড়াদেহ চিরদিনের মত একবারে শীতল হউক।

শ্রীগীতগোবিন্দের আলোচনায় আমি আর অধিক অগ্রসর হইব না। এই পর্য্যন্তই আমার অধিকার। সম্ভোগরসে এই চিরবিরহিণীর অধিকার নাই। এই চিরবিরহের জীবনের শেষ-কথা শ্রীগীতগোবিন্দে যাহা পাইলাম,

তাহা নিবেদন করিলাম; উহাই আমার আত্মনিবেদন বলিয়া সহৃদয়গণ গ্রহণ করুন। *

---

* এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে গীতগোবিন্দগ্রন্থের যে কয়েকখানি টীকার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তৎপরে আরও কতিপয় টীকার অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মান্ পণ্ডিত আউফ্রেক্ট-সঙ্কলিত গ্রন্থ তালিকা (Catalouge) হইতে উহাদের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

	টীকার নাম—	টীকাকারের নাম
১।	বাসনা-মালিকা। ...	... ...
২।	ভাব বিভাবনা—	উদয়নাচার্য্য।
৩।	রত্নমালা—	কমলাকর।
৪।	... ...	কৃষ্ণদাস।
৫।	অর্থরত্ন—	গোপাল।
৬।	... ...	চৈতন্যদাস।
৭।	... ...	পীতাম্বর।
৮।	রসকদম্ব কল্লোলিনী—	ভাগবত দাস।
৯।	... ...	ভাবাচার্য্য।
১০।	মাধুরী—	রামতারণ।
১১।	... ...	রাম দত্ত।
১২।	সদানন্দগোবিন্দ—	রূপদেব।
১৩।	... ...	লক্ষণ ভট্ট।
১৪।	শ্রুতি রঞ্জিনী—	বিশ্বেশ্বর ভট্ট।
১৫।	... ...	বন মালী ভট্ট।
১৬।	শ্রুতি রঞ্জিনী—	লক্ষণ সূরি।
১৭।	গীতগোবিন্দ প্রথমাষ্টপদবিবৃতি—	বিঠ্ঠল দীক্ষিত।
১৮।	... ...	শালিক নাথ।
১৯।	সাহিত্য-রত্নাকর—	শেষরত্নাকর।
২০।	পদভাবার্থ চন্দ্রিকা—	শ্রীকান্তমিশ্র।
২১।	... ...	শ্রীহর্ষ।
২২।	গীতগোবিন্দতিলকোত্তমা—	হৃদয়াভরণ।

আমার—বিরহের প্রাণ! শ্রীগীতগোবিন্দপাঠে সে যাতনা কমিল না, আরও বাড়িয়া উঠিল। হে গুরুদেব হে, গোবিন্দদেব, হে গুরুগোবিন্দদেব, গীতগোবিন্দপাঠে তুমি আমায় যাহা বুঝাইয়া দিলে, তাহা ভাল রূপেই বুঝিলাম। আমি তো তোমায় কখনই পাইব না। তবে আর কত কাল সে দুরাশা হৃদয়ে পুষিব? দর্শন পাওয়া তো দূরের কথা, তোমার কৃপা-পত্র-লাভও আমার ভাগ্যে ঘটিবে না।" এ বিশাল সংসারে ক্ষুদ্রের কথা মনে ভাবেন, এমন লোক অতি বিরল। কিন্তু আমিতো কোন লোকের মুখপ্রেক্ষিণী নই। যেদিন ব্রহ্মচারিণী মাতা তিরোধান করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মানবীয় সঙ্গ আমার ভাগ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। গুরুদেব আমার,—নরাকার শ্রীভগবান্। সে বিষয়ে তো কখনই আমার মনে সংশয় হইবে না। কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা কথা পড়িয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে আমার আর কি আশা আছে?

যে শ্রীরাধা তাহার শ্রীচরণে দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-আত্মা—সকলই সমর্পণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সকলই তাঁহার শ্রীচরণে সঁপিয়া দিয়া একবারেই তন্মনস্কা, তচ্চিত্তা, তদ্‌গতাত্মা হইয়া দিবানিশি তাঁহার ভাবনায় বিভোরা থাকিতেন, সেই শ্রীমতী রাধার দশাও তো প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত (inspired) কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাঠ করিলাম। বিরহে বিরহে

ইতঃপূর্ব্বে ১৩ খানি টীকার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তালিকায় ১২ খানি এবং তদ্ব্যতীত শ্রীমৎ নারায়ণ কবিরাজ কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক খানি,—এই তের খানি এবং এই তালিকায় ২২ খানি সমষ্টিতে ৩৫ খানি টীকার নাম জানাগিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনখানি মাত্র টীকা মুদ্রিত দেখিয়াছি। অপর কয়েকখানির মধ্যে কতিপয় পাণ্ডুলিপি পুঁথিও দেখিয়াছি, তদ্ব্যতীব অধিকাংশ টীকায় আমার নয়নগোচর হয় নাই। —সম্পাদক।

জর্জ্জরিতা হইয়া অবশেষে তিনি মরণই মঙ্গল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারই যদি এই দশা,—আমি কোথাকার তুচ্ছকীট—যে আমি তাঁহার কৃপা-স্মৃতির পাত্রী হইব? আর তিনি কৃপা-পত্রী লিখিয়া আমায় সান্ত্বনা দিবেন! সে আশা একবারেই দুরাশা।

এখন দিবানিশি তাঁহার আদেশমত উপাসনা করাই আমার এক মাত্র জীবনব্রত। কিন্তু উপাসনাও তো চিত্তের একাগ্রতাপেক্ষ। তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে চিত্তের যে একাগ্রতার প্রয়োজন, সে একাগ্রতাও আমার নাই। তিনি যে অর্চ্চনা জপ ধ্যান ও ধারণাদির আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমি আমার মনের স্থিরতা রাখিতে পারি না। কিন্তু তিনি যদি এমন আদেশ করিতেন যে, তুমি আর কিছু করিতে পার,—আর নাই পার, কেবল আমারই ধ্যান করিও, তাহা হইলে আমার জীবনের কর্ত্তব্যতা-ব্রত কত কটা সহজ হইত। তাহার শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে, তাঁহার দর্শন-লাভের পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তিও প্রতিচ্ছবির ন্যায় আমার চিত্রপটে প্রতি ফলিত হইতেন। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন যে আমি নরদেহে আবার তোমায় দর্শন দিব। তিনি সত্যসঙ্কল্প। কার্য্যতঃ তিনি তাহাই করিলেন। গুরুদেব আমার,—নরকার পরব্রহ্ম—নরাকার স্বয়ং ভগবান্। সেই তিনিই—এইরূপে আমায় কৃপা করিতে আসিয়াছেন—ইহাতে আমার সংশয় নাই। এখন এইরূপই আমার ধ্যেয় বিষয়—আমি ভেদবাদ বুঝি না, অভেদ বাদও বুঝি না—ভেদাভেদবাদও বুঝি না, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদও বুঝি না। প্রত্যাভিজ্ঞতা দ্বারা আমি স্পষ্টতঃই জানিয়াছি য়াছি,—"সোঽহয়ম্"। যিনি সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া মৃত্যু হইতে আমায় রক্ষা ছিলেন—নরদেহে আবার আসিব বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—সোঽহয়ম্—ইনিই তিনি।

বিরহই যাহার জীবনের বিধান—ধ্যানাভ্যাসই তাঁহার জীবন-রক্ষার একমাত্র হেতু—ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীপাদ শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষদর্শনের আশা যখন আমার পক্ষে অতি দুরাশা,—তখন সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন পরিহার করিয়া কেবল ধ্যানেই সুদীর্ঘ সময়-যাপনের প্রয়াস পাইতাম—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধ্যানটা সহজেই আমার আয়ত্ত হইয়াছিল—উহা শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছিল। নিরন্তর-অনবচ্ছিন্নতৈলধারাবৎস্মৃতিসমূহের—প্রবাহই—ধ্যান। এই ধ্যানই প্রগাঢ় অবস্থায় স্ফূর্ত্তিতে পরিণত হয়। নিবীড়-স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি শ্রীমদ্রামানুজ আচার্য্য তদীয় বেদান্ত-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় এই তথ্যটিকে ভালরূপেই বুঝাইয়াছেন। আমি নিজে ইহা অতি উত্তমরূপেই অনুভব করিয়াছি।

সময়ে সময়ে শ্রীপাদগুরুদেব এমনই ভাবেই এক একবার দর্শন দিয়া চলিয়া যান। তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 'যদিও তুমি আমার সংবাদ সহসা জানিতে পারিবে না কিন্তু আমি তোমার সংবাদ জানিতে পারিব।' আমি যখন ধাঁদার মত তাঁহাকে ধ্যানাবস্থায় দেখিতে পাই, খুব সম্ভবতঃ তখন তিনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ংই সমাগত হন। কিন্তু আমার যেন মনে হইত—উহা ধাঁদা। এখন বুঝিতে পারিতেছি উহা ধাঁদা নয়, তাঁহারই সাক্ষাৎকৃপা। কিন্তু ঐ স্ফূর্ত্তি-দর্শনে আমার আনন্দ হয় না—উহা প্রতিচ্ছবির ন্যায় মনে হয়। এই স্ফূর্ত্তির পরের অবস্থা যে প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার—সে অবস্থা সহজলভ্য নহে। সেরূপ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে আমার হৃদয়ে শান্তি আসিল না—তদ্বিপরীতে হৃদয়ের আবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। শ্রীরাধার আবেগময়ী উৎকণ্ঠা আমার হৃদয়ের আবেগ আরও বাড়াইয়া তুলিল। শ্রাবণের বরষার

ধারার ন্যায় নিরন্তর নয়ন-সলিল-প্রবাহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়া গেল—আমি চিত্তের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতাম—এ রোদনের অর্থ কেহ কেহ বুঝিত—কেহ কেহ একবারেই বুঝিত না। অনেকেই মনে করিত, আমার মস্তিক বিকৃত হইয়াছে। এইরূপে হা-হুতাশে ও হাহাকারে অনেক দিন অতীত হইল।

এ জগতে শ্রীপাদ গুরুদেব ব্যতীত আমার খবর লওয়ার অন্য কেহই নাই। কিন্তু তিনি যে কি ভাবে আমার খবর রাখেন, তাহা তিনিই জানেন; আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। ধাঁদার দেখা যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমায় দেখা দিয়া যান। শুনিয়াছি শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্নেহময়ী জননীর কোল শূন্য করিয়া সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে বাস করেন, তখন মধ্যে মধ্যে স্নেহময়ী শচীমাতাকে এইরূপে দর্শন দিতেন। নিমাই বাস্তুশাক ভাল বাসিতেন—স্নেহময়ী শচীদেবী বাস্তুশাক রন্ধন করিয়া নারায়ণের ভোগ দিতেন, আর সেই প্রসাদ সম্মুখে লইয়া নিমাইএর কথা স্মরণ করিয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতেন—নয়নজলে নয়ন-কোণ ভাসিয়া যাইত,—তখন তিনি যেন দেখিতে পাইতেন নিমাই আসিয়া প্রসাদ ভোজন করিতেছেন, তিনি আনন্দচিত্তে সে ভোজন দর্শন করিতেন। কিয়ৎক্ষণপরে তাঁহরে সে স্ফূর্ত্তির অবসান হইত। কিন্তু অন্নের থালায় একটিও অন্ন নাই,—ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে সংশয় হইত। তিনি কি আদৌ ভোগের জন্য প্রসাদ পরিবেশন করেন নাই—কিংবা করিয়াছিলেন, উহা কি বিড়ালে ভক্ষণ করিল?—কিম্বা বাস্তবিকই তাঁহার হারানিধি গৃহে আসিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া গেলেন। শচীমাতা অনেকবার এইরূপ সংশয়ের যাতনা ভোগ করিতেন।

আমারও দুই চারবার এইরূপ সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। জ্ঞানরূপে প্রেমরূপে গুরুদেব সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে বিরাজমান আছেন। স্ফূর্ত্তিতে তিনি বহুবার আমায় জানাইয়াছেন, ইহা খুব সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি। আমি অজ্ঞ অধম অবলা,—আমার কোনও জ্ঞান নাই—প্রেমভক্তিও নাই—কিন্তু তাঁহারই প্রেরণা সততই হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। আমি এই জ্ঞান ও প্রেম লইয়া সন্তোষ পাইতেছি না—আমি তাঁহার সেই প্রেম প্রতিভা-সমুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল। স্ফূর্ত্তির দর্শনে আমার তৃপ্তি নাই। তাঁহার ধ্যানে দিন যামিনী যাপন করিয়াও মনে আনন্দ অনুভব করিতে পারি না। যোগীরা ও ধ্যানীরা কিরূপ ভাবে কাল-যাপন করেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না; শুনিয়াছি—যোগাদ্‌যোগী পরমোবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ" তাহা হইলে যোগীর চিত্তও প্রথমতঃ খুবই বিরস। ধ্যেয় বস্তুর পূর্ণপ্রত্যক্ষ না হইলে কেবল ধ্যানে বা সাময়িক স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ-লাভ হয় না।

এই দুঃখে সময় সময়ে আমার আশা পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার কৃপা-লিপি পাইয়াছিলাম। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে আর কোনও সংবাদ না পাইয়া চিত্ত ক্রমেই অধিকতর চঞ্চল হইতেছিল—কোনও ক্রমে মনে শান্তি আনিতে না পারিয়া এক শুক্ল একাদশীর উপবাস দিবসে গৃহকার্য্যাদি হইতে অবকাশ লইলাম, জপ অর্চ্চনাদি নিত্য কর্ম্মগুলি সমার্পণ করিয়া একাগ্র মনে কেবল শ্রীপাদগুরুদেবের ধ্যানে বিভোর হইলাম। দিবাভাগে ধ্যানের অবস্থা কিছুতেই প্রগাঢ় হইল না; ধ্যানে বসিলাম,—ধ্যানের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে কেবলই অশান্তি ও শোকের মত অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা আসিল, যদিও শুক্লা একাদশী, কিন্তু আকাশ যেন মেঘমলিন হইয়া পড়িল। কোন প্রকারে সান্ধ্য আরত্রিকাদি শেষ করিলাম। উপবাস দিবসে

প্রয়োজনমত যৎকিঞ্চিৎ ফলাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। আজ শ্রীচরণামৃত এক বিন্দুমাত্র পান করিলাম; শ্রীমন্দিরেরই এক কোণে আসন লইয়া বসিলাম। বাড়ীটা ধীরে ধীরে নীরব হইয়া পড়িল। আমার মনে এখন অনেকটা শান্তি আসিল; চিত্ত ক্রমেই ধীরে ধীরে ধ্যানে নিমগ্ন হইল, প্রগাঢ় অবস্থায় দেখিতে পাইলাম,—আমি যেন শ্রীযমুনাতটে একটি ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুচ্ছায়াবিশিষ্ট উপবনে বসিয়া গুরুদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। এই উপবনটি একটি সমুচ্চ পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত—উপবনের পশ্চিম দিকে দক্ষিণদিগ্‌বাহিনী যমুনা মৃদুলরঙ্গে বহিয়া যাইতেছেন, সান্ধ্যরবির রক্তরাগ শ্রীযমুনার সুনীল জলে তরঙ্গে তরঙ্গে এবং শ্যামল বন বিটপীর পাতায় পাতায় নাচিয়া বেড়াইতেছে। কলকণ্ঠ বিহগ কুল সান্ধ্যউপাসনার সুস্বর গীতি লহরীতে বনভুমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। এই সময়ে সহসা এক সমুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি পশ্চাৎদিক্ হইতে আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; চাহিয়া দেখি—প্রেমপ্রতিভা সমুজ্জ্বল শ্রীগুরুদেব;—তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলে সান্ধ্যরবির রক্তিম কিরণ যেন এক অভিনব মাধুর্য্যরাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। জগতের কোনও মানুষে সেরূপ মাধুর্য্য কখনই সম্ভবপর নয়। তাঁহার দক্ষিণহস্তে সুরঞ্জিত সুগন্ধি কুসুমের একটি সুন্দর মালা; চম্পককলির ন্যায় সুকোমল অঙ্গুলিতে সেই মালা দুলিতেছিল। স্নেহময় দয়াময় গুরুদেব উহা উভয় হস্তে ধরিয়া—বলিতে লজ্জা হয়, ভয় হয়,—এ অভাগিনীর গলদেশে পরাইয়া দিলেন। দেখামাত্রই তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রণত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি তাহা না করিয়া অজ্ঞান অচেতনের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডলের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। যখন মালা পরাইয়া দিয়া বলিলেন—তুমি এত দূর দেশে আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছ,—তখন আমার চমক

ভাঙ্গিল, শ্রীচরণে প্রণত হইয়া পড়িলাম। দয়াময় আমার মাথা ধরিয়া তুলিলেন; আমার দেহটা যেন কাঁপিতে কাঁপিতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। গুরুদেব স্নেহ-কোমল হস্তে আমায় ধরিয়া তুলিলেন, চেতনা পাইলাম—তখন তাঁহার শ্রীচরণের উপরে মাথা লুটাইলাম; নয়ন-জলে অনিবার্য্য ভাবে তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা এ অভাগিনীর মুখখানি মুছাইয়া বলিলেন—তুমি ভাব-দেহে আমার জন্য এত দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য-দেশে আসিবে, পূর্ব্বে তাহা মনে করি নাই, কিন্তু আজই অপরাহ্নে তাহা জানিতে পারিয়াছি। নানাকার্য্যে আমাকে বিব্রত থাকিতে হয়; অনেক সময়ে অতিআবশ্যকীয় কার্য্যও অসম্পাদিত থাকিয়া যায়। এই জগতের কেবল পারত্রিক বিষয়ে নহে—ঐহিক বিষয়েও আমাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; সমাজনীতি রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে হয়। বহুলোকের বাসনায় বহুকার্য্য বিব্রত হইয়া পড়ি। তিন মাসের মধ্যে তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু তিন সপ্তাহ হইল তোমায় এক অতি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছি। অনেকদিন হইল তাহা ডাকে পাঠাইয়াছি। তুমি যে স্থানে আসিয়াছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বত—এই স্থানটী শ্রীযমুনার উদ্ভব-স্থল—ইহার নাম যমুনোত্রী। এই স্থানটী সাধুমহর্ষি-মুনিগণের ভগবদুপসনার স্থান। মহাভাগ্যক্রমে এই মহাতীর্থে আসিয়াছ। কিন্তু নারীগণের পক্ষে এস্থানে অধিকক্ষণ অবস্থানের অধিকার নাই। তোমার কথা সর্ব্বদাই আমার মনে হয়; মনে করিও না যে, আমি তোমায় ভুলিয়া যাই। তুমি ধ্যানে আমায় দেখিতে পাও, স্ফুর্ত্তিতে তোমায় দেখা দিই—কিন্তু ঐ অবস্থায় অধিকক্ষণ বাক্যালাপ চলে না। এখনও আমি অধিকক্ষণ তোমার নিকটে থাকিতে পারিব না। ঐ যে সমুখে তুষারমণ্ডিত গিরিশিখর দেখিতে পাইতেছ—উহারই কিঞ্চিৎ নিম্নে

এক মহর্ষির পুণ্যাশ্রমে দুই একদিন অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইব। তুমি অত ব্যাকুল হইওনা—আবার সময়ে নিশ্চয়ই তোমায় দেখা দিব। তোমায় যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছি, তিন দিনের মধ্যেই তাহা পাইবে। ধীরে ধীরে পাঠ করিও। বিষয়টি কঠিন হইলেও উহাতে জগতের উপকার হইবে। যাহাতে আধুনিক লোকেরা বুঝিতে পারে এমন ভাবে লিখিয়াছি। ইয়োরোপীয় শিক্ষিত লোকদের গবেষণাও উহাতে দেওয়া হইয়াছে। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে শিক্ষা প্রচার করিয়া সমাজকে উন্নত করিতে হইবে। তোমাদ্বারাও এই সকল কার্য্যের কতকটা সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে।

তুমি দিবানিশি কেবল আমাকে ভাবিয়া ব্যাকুল হইও না। আমি চিরদিনই তোমাকে স্নেহ করিব—কখনই ভুলিব না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তবে সাক্ষাৎদর্শন কখনও যে হইবে না—সে কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এ জীবনে অল্পক্ষণ মাত্রই মধ্যে মধ্যে দেখা হইবে। ভাবী জীবনে আমার নিত্যানন্দময় নিত্যধামে আমার সন্নিধ্যে স্থান পাইবে। এই বলিয়া তিনি আমার মস্তকে শ্রীকরকমল-প্রদান করামাত্রই আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম—সে অবস্থাটী বাস্তবিকই অচেতনের অবস্থা। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা পাইলাম—তখন দেখিলাম রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। আমি আমার কুটীরে শ্রীমন্দিরের কোণে মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছি—কিন্তু কেমন একটা জ্যোতিতে ও সুগন্ধে শ্রীমন্দির যেন পরিপূরিত হইয়াছে!

পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই জাগরণে আমার কি দুরবস্থা হইল। আমার দেহটি বিবশ হইয়া পড়িল, কোনও কাজে মন গেল না, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, ইহা সেরূপ নয়,—প্রাণারাম হৃদয়সখা ক্ষণিক দেখা দিয়া চলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়

ইহা সেরূপও নয়—কখনো যেন মনে হইতে লাগিল—আমি সেই হিমালয়ে শ্রীযমুনোত্রীর উপবনে শ্রীপাদগুরুদেবের চরণতলেই বসিয়া রহিয়াছি—কখনও যেন সে ভাবনা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল—এই অবস্থার আনমনাভাবে নিত্যক্রিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা ও গৃহ কার্য্যাদি করিলাম বটে। কিন্তু এইরূপে সারাদিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। ঐ ভাবনাতেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতের পূর্ব্বে একবার তন্দ্রায় সেই দৃশ্যের আভাসই দেখিতে পাইলাম। উহাতে বেশীর ভাগ এই যে শ্রীগুরুদেব যেন আমার মাথায় শ্রীকর-স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "শান্তভাবে ভজন কর—"শান্তঃ উপাসিত" ইহাই বেদের বাক্য।" বিস্ময়ের কথা বলিতে কি—ইহার পরেই মনটা যেন শান্ত হইল।

পরদিন বেলা ১২টার পরে ডাক পিয়ন আসিয়া ডাকিয়া বলিল—ওগো তোমাদের একটা রেজিষ্টারী বুকপ্যাকেট আছে গো"—আমি জানি শ্রীগুরুদেব সত্যসঙ্কল্প—তিনি দয়াময়; সর্ব্ববস্থাতেই তাঁহার বাক্য অতি সত্য। দরজার নিকটে যাইয়া রসিদে দস্তখত করিয়া অতি বড় বৃহৎ প্যাকেটটি লইয়া আনন্দে ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্রীবিগ্রহের খাটের নিকটে ভক্তিপূর্ব্বক উহা রাখিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণচিন্তাপূর্ব্বক গলায় বসন জড়াইয়া প্রণত হইলাম। তখন আর উহা খুলিলাম না। যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যছিল তাহা শেষ করিয়া অপরাহ্ণ দুইটার সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া উহা খুলিলাম—যেন শ্রীহস্তে ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ লিখিয়া এ অভাগিনীর নিকটে পাঠাইয়াছেন। মনে করিলাম—দয়াময়ের এই দয়া অসীম ও অপরীমেয়। স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্রের বিচার নাই—খুলিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ।

Moscow, Russia, March 13.
মস্কাউ, রাসিয়া ১৩ই মার্চ্চ।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দ-পরায়ণা
শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী পরমস্নেহাস্পদাসু।

শ্যাম-সোহাগিনি—কাশ্মীর ঋষভাশ্রম হইতে তোমায় পত্র লিখিয়া উহার দুইদিন পরেই আমি সবিশেষ কোন কার্য্যের জন্য তিব্বতে যাত্রা করি। এখানে একজন প্রসিদ্ধ লামার আশ্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার জন্য আমেরিকা ও ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে কতিপয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে আমার প্রিয় ছাত্র ডাক্তার হনিস-বার্গও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সবিশেষ অনুরোধেই আমাকে এখানে আসিতে হয়। মানবসমাজে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানবিস্তারের জন্য সঙ্ঘ-স্থাপনই—এই সমিতির উদ্দেশ্য। আমাকেই সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব হয়। আমার বলবতী অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই কার্য্যভার অগত্যা আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। আমি সর্ব্ব-প্রথমেই সমাগত সুদূরস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সুশিক্ষিত সমাজহিতৈষী মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমক্ষে একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করি। তাহা এই যে, জগতের যদি হিতসাধন করিতে হয়, এবং যদি মানবসমাজের সুখশান্তি-প্রবর্দ্ধন করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবানে ভক্তি ও অনুরাগময়ী জীব-সেবাও এই কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।" ইহা লইয়া কিছু তর্কবিতর্ক হয়। এই তর্কে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ডাক্তার ফার্গুসন, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ স্মিথ, লণ্ডনের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক রেভারেণ্ড জেমস, ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক্ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ফাদার ড্যামিয়ো প্রভৃতি অনেকেই আমার উক্তির সমর্থন করেন। মস্কা-উয়ের নব্যজন-তন্ত্রের নায়ক লেনিনের প্রিয়অনুচর রেটিন্ ও ম্যাক্সীম গর্কীর শিষ্য বল্কোভিচ্, বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে মানববুদ্ধি-বৃত্তির স্বাধীনতা নষ্ট হয় এবং উহাও একটী কুসংস্কার সুতরাং এই কুসংস্কারের উন্মূলনই প্রয়োজনীয়—তাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত করেন। আমি প্রথমতঃ প্রতি-বাদীদিগকে তাঁহাদের সমগ্র যুক্তি অবতারণা করার জন্য অনুরোধ করি। তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করেন। ইঁহারা সন্দেহ বাদী (Sceptic) অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic), জড়বাদী (materialist), স্বাধীন-চিন্তাশীল (Free thinker) এবং আধুনিক নাস্তিক্যবাদী (modern Athiest) প্রভৃতির সিদ্ধান্তিত বহুযুক্তির অবতারণা করিয়া ভগবদস্তিত্ববাদ (Thiesm) খণ্ডনের প্রয়াস পান। উহারা বলেন, ভগবদস্তিত্ববাদ যে কেবল বৃথা অলীক ধারণা, তাহাও নহে—উহাতে মানব চিত্তের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, স্বাধীন চিন্তাশীলতায় বাধা পড়ে, সুতরাং উহাতে সমাজের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হয়, এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

ইঁহাদের কথা শেষ হইলে, খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্যগণ ইহাদের প্রত্যেক কথার প্রত্যুত্তর দিয়া উহাদের তর্ক খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। ইহাদের খণ্ডন-যুক্তি সর্ব্বাংশেই যুক্তযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইল না ;—উভয় পক্ষের তর্ক-বিতর্ক শেষ হইলে পর আমি দুই পক্ষের উক্তি সমূহ পুনর্ব্বার উল্লেখ করিয়া সন্ধ্যা সাতটায় সবিশেষ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবিধ উক্তি-প্রত্যুক্তির সার মর্ম্ম আমি কাগজে টুকিয়া লইয়াছিলাম। একটি একটি করিয়া আলোচনা করিতে করিতে যখন রাত্রি ৩টা বাজিয়া

গেল, তখন লেনিনের অনুচর এক ব্যক্তি অতীব বিনীতভাবে বলি· লেন,—মহাত্মন্ "আমি দেখিতেছি, আপনার জ্ঞানেব ভাণ্ডার অতি বিশাল, আমরা আপনার যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলি শুনিতে শুনিতে এতই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে,—আমাদের কাহারও বিরক্তি বোধ হয় নাই। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতেপারিয়াছি,—আপনারনিকট আমাদের শুনিবার অনেক বিষয় আছে। আপনি জগতের বর্ত্তমান আর্থিকঅবস্থা, শ্রমজীবীদের ও দরিদ্রদের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই আমাদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল। Socialism বিষয় যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে উহার ভাল-মন্দ দুইদিকই দেখাইছেন, Cmmunism সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের মতেরই প্রতিবাদ। আপনি বলিয়াছেন জনসাধারণের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই অর্থাভাবজনিত সামাজিকবিপ্লবপ্রসূত অশান্তি চলিয়া যায়।" জনসাধারণের ধনবৃদ্ধির উপায় আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অবিদিত নহে। ভগবান্ ও তৎপ্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আপনার যুক্তিও উক্তিগুলি অতি সুসঙ্গত হইলেও এই বিষয় আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আপনার নিকটে শুনিলাম। কিন্তু এখানে ক্রমাগত সপ্তাহকাল এই ভাবে বলিলেও আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে না। আপনার নিকটে আমাদের একটি প্রার্থনা আছে ;—উহা এই যে, আপনাকে এক বার আমাদের সঙ্গে রাশিয়ার একটা প্রধানসহর—মস্কাউ নগরে যাইতে হইবে। মস্কাউ নগরই এখন পূজ্যপাদ লেনিনের (Lenin) আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। Third Internationale ব্যাপারে আমাদের যে সকল সিদ্ধান্ত হইয়াছে— আপনি সে সকল সিদ্ধান্ত অবশ্যই জানেন। ধর্ম্মান্দোলন আমাদের

জ্ঞানের সীমাতীত। কিন্তু আপনি এখানে উহা যেরূপ ভাবে ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে উহা আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আজ রাত্রি প্রায় অবসান হইল; আপনি বিশ্রাম করুন। মস্কাউ নগরে আপনাকে লইয়া আমরা এক সভা করিব। সেখানে আমরা সকলেই আপনার উপদেশ সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিব এবং আমাদের বক্তব্যগুলিও আপনি শ্রবণ করিবেন। আগামী কল্য প্রাতে এগারটার পরে আবার আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত হইব। কিন্তু কৃপা করিয়া আপনাকে মস্কাউ নগরে অবশ্যই যাইতে হইবে; এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়, আমরা তাহা আগ্রহ সহকারে জানিতে চাই।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ইহারা আমার কথায় এরূপ প্রীতি লাভ করিবেন, প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, এবং শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ইহা কখনও আমার মনে উদিত হয় নাই। শুধু তাই নয়, আমাকে রাসিয়ায় যাওয়ার জন্য ইহারা অনুরোধ করিবেন ইহা এক বারেই অদ্ভুত। আমি বলিলাম, আপনারা এই দীর্ঘ সময় এতটা ধৈর্য্য সহকারে আমার কথা শ্রবণ করিয়াছেন ইহাতে আমি সুখী হইলাম। আপনাদের অনুরোধ সম্বন্ধে আগামী কল্য আমার অভিমত জানাইব। খুব সম্ভবতঃ আমার অভিমত আপনাদের এই প্রস্তাবের অনুকূলই হইবে। কেননা জগতের হিতসাধনই আমার জীবনের ব্রত। তবে আপনাদের অভিমত কার্য্য প্রণালীর সহিত আমার অভিপ্রায় অনেকাংশেই মিলিবে না। সে জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।" মস্কাউর কমিউনিষ্ট দলের সভ্যগণ আমার বাক্যে খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রি শেষে পরামর্শ সভাভঙ্গ করিয়া সকলেই বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা সকলেই আবার তিব্বতে ডুলাং লামার সুবৃহৎ বৈঠকখানায় সমবেত হইলাম। বৌদ্ধ, খৃষ্টান স্বাধীনচিন্তা-

শীল, সোসিয়ালিষ্ট, মেটেরিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলেই সমবেত হইলেন। রাসিয়ার অগ্রগামীদলের সদস্যগণের নেতা জেইজেফ্ (Zaizeff) প্রথমতঃ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রুস-সম্রাটের শাসনে রাসিয়ার জনসাধারণের যে কি দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন,—আপনাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। রুস-সম্রাট নিজকে অপরিমিত শক্তিশালী সম্রাট (Autocrat of unlimited power) বলিয়া মনে করিতেন। রাশিয়ার ন্যায় প্রজানিপীড়নের এমন ভীষণ উদাহরণের কুস্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। অতিমূর্খ ও প্রকৃত পাষণ্ড শ্রেণীর লোকেরা চরের কার্য্যে (Detective police) নিযুক্ত হইত। তাহারা যাকে-তাকে রাজদ্রোহের অপরাধী সন্দেহে ধৃত করিয়া রাজদ্বারে আনয়ন করিত, উহারা অবিচারে অতি কঠোর কারাদণ্ডে নির্ব্বাসনে অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। প্রজারা শরীরের রক্ত জল করিয়া শস্য জন্মাইত, কিন্তু উহারা এক সন্ধ্যাও পেট পুরিয়া খাওয়ার জন্য দুই মুষ্টি তণ্ডুল ও উৎপীড়ক রাজপুরুষের গৃধ্র দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। রুস প্রজার ঘরে ঘরে পুলিশের লৌহ-শাসনের অভিনয় হইত। স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অনবরতই পুলিশ মাজিষ্ট্রেটের শাসনে নিষ্ঠুর ভাবে নিগৃহীত হইতেন। এই সকল অত্যাচারের ফলে রাসিয়ায় নিহিলিষ্ট (Nihilist) টেররিষ্ট (Terrorist) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয় এবং দিন দিন রাষ্ট্রবিপ্লবদলের (Revolutionist) প্রভাব ও প্রসার-প্রতিপত্তির সূত্রপাত হয়। এই অত্যাচারের ফলেই Rural Commune এবং Cossack Commune প্রভৃতি কমিনিউষ্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়; ইহাদিগকে লইয়া Herzen, এবং Cerniscevsky প্রভৃতি সুলেখক স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মগণ Socialist সম্প্রদায় সংগঠিত করিয়া তোলেন। ইহাদের উত্তেজনাময়ী লেখার প্রভাবে রাসিয়ায় জনসাধারণের চিন্তাধারার প্রসুপ্ত-

সিংহ জাগিয়া উঠে। অতঃপরে মহাত্মা লেনিন Lenin প্রাদুর্ভূত হইয়া রুস রাজনীতি ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সাধন করিতেছিলেন, তাহা আপনাদের সকলেরই সুবিদিত। ভারতের এবং অন্যান্যদেশের শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলশেভিক আন্দোলনের সম্বন্ধে হয় তো ততটা অনুকূল অভিমত সম্পোষণ করেন না; কিন্তু ইহারও যে প্রয়োজনীয়তা আছে, জগতের নৃপতি ও ধনপতিগণের শক্তির অপব্যবহার দেখিলে তাহারা অবশ্যই তাহা স্বীকার করিবেন।"

এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তাঁহারা সভাস্থ সকলকেই মস্কাউ নগরের Internationale ব্যাপারে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। আমরা সকলেই তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রযোজনীয় আলোচনান্তে সভা ভঙ্গ হইল। আমরা মস্কাউ নগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তত হইলাম। ইহাদের আলোচনায় আমি স্পষ্টতঃই বুঝিলাম,—কেবল রাজনীতিক বিপ্লব-সাধনই ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। দেশের রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধন করা ইহাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হইলেও কেবল তাহাই ইহাদের বিপ্লব-সাধন ব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; সর্ব্বপ্রকার বাধ্য বাধকতার উচ্ছেদ-সাধনই এই সকল নিহিলিষ্ট, সোসিয়া-লিষ্ট, ও কমিউনিষ্টগণের উদ্দেশ্য। সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ভগবদ্‌বিশ্বাসকেও ইহারা চিত্তবন্ধের হেতু বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ভগবদ্‌বিশ্বাসরূপ কুসংস্কার হইতেও চিত্তের মোক্ষসাধন করা ইহাদের কর্ত্তব্যতা-ব্রত। রাজাকে রাজসিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেই যে ইহাদের কর্ত্তব্যতার পরিসমাপ্ত হইবে তাহা নহে, ভগবানের অস্তিত্ব-জ্ঞানটাকেও বিনাশ করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বৌদ্ধদিগকে বৈনাশিক বলিতেন। এখন দেখিতেছি—কেবল বৌদ্ধগণই বৈনাশিক নহেন। বৌদ্ধগণেরও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম আছে। ইহারা কিন্তু

কোনও নিয়মে বাধ্য হইতে রাজী নহেন—স্বীয়প্রবৃত্তি-অনুসারে চলাই ইহারা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। ইহাকে স্বপ্রবৃত্ত্যনুবর্ত্তিতা বা Individualism বলা যাইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর, মায়া হইতে মুক্তিসাধনের উপদেশ দিয়া ঈশ্বরকে মায়িক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন সুতরাং ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানের বিনাশপূর্ব্বক কেবল চিন্মাত্রে অবস্থানই তাঁহার মতে মোক্ষ। কিন্তু এই সকল আধুনিক সম্প্রদায়ের মোক্ষ-সাধনের উপায় কেবলই স্ব-স্বপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। আমিই একমাত্র আমার জীবনের কর্ত্তা; ঈশ্বর স্বীকার করা—কুসংস্কার এবং ঐরূপ জ্ঞান রাখাও একটা বন্ধনমাত্র। বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর বাধ্য হইয়া চলা—এবং স্ত্রীর পতির অনুবর্ত্তন করা, বা তাহার বশে থাকা—সেও একটা ঘোরতর বন্ধন—এই জ্ঞানেরও উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য। সামাজিক নিয়মে বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করিয়া চলাও জ্ঞানের একটা বন্ধন বিশেষ; তাহারও উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে; ইহারই নাম—বৈনাশিকতা বা Nihilism। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা ইংরাজী ভাষায় খুব স্পষ্টরূপেই লিখিত আছে তাহা এই—

Nihilism is a struggle for the Emancipation of intelligence from every kind of dependence. The fundamental principle of Nihilism is absolute Individualism—it is a powrful and passionate reaction, not only against political obligation but against the moral obligation that weighs upon the private and inner life of the individual,

সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাধ্য-বাধকতার মূলোচ্ছেদ-সাধনই ইহাদের লক্ষ্য। তন্মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসনটি চুড়মার করিয়া দেওয়াই ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ মনে করেন—কেননা ঈশ্বর ইহাদের বিরুদ্ধে একটি

অঙ্গুলিও উত্তোলন করেন না। রাজ-সিংহাসনের উচ্ছেদ-সাধনে নিজ-দের বহুশোণিত ও জীবন নষ্ট হইয়া যায়—সে কার্য্যটা তত সহজে হয় না। যে পথ সহজ, তরল পদার্থ সে পথেই চলে; Line of ieast resistance বা নির্ব্বাধ গতির দিকটা ক্ষুদ্র জীবাণুও—এমন কি অচেতন প্রকৃতও খুঁজিয়া লয় এবং সেই পথে চলে। রুস বিপ্লব কারীরা ঈশ্বরের সিংহাসন ভাঙ্গিয়া দেওয়াটাই প্রাথমিক সহজ কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে জার্ম্মেন পণ্ডিত Fecner "জড় ও শক্তি" (Force and matter" নাম দিয়া এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া—খৃষ্টধর্ম্ম ও ভগবদ্‌বিশ্বাসের মুখ উন্মূলন করার পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। রুস নিহিলিষ্টগণ উহাই বেদবৎ মান্য করিয়া তাঁহাদের সমাজে উহারই উপদেশই নানাপ্রকারে প্রচার করিয়া ভগবদ্‌বিশ্বাস উচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস পান। জনসাধারণ সাধারণতঃ কেবল প্রথামাত্রে ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেছ কিন্তু তাহারা ধর্ম্ম-শিক্ষার পরিবর্ত্তে নাস্তিকতারই শিক্ষা পাইতেছে। ধর্ম্মবিশ্বাস পুরাতন ভগ্নকুটীরের ন্যায় স্বতঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের একান্ত অভাব হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল অবস্থা শুনিয়া মস্কাউ নগরে একবার যাইয়া সেখানকার লোকদের তর্কযুক্তি শুনিয়া সেখানে এ সম্বন্ধে কিছু বলা—ভাল মনে করিলাম। রুসসদস্যগণকে বলিলাম—আপনাদের অনুরোধে আপনাদের দেশে যাওয়াই স্থির করিয়াছি। আমি প্রস্তুত আছি, আপনারা প্রস্তুত হইলেই যাওয়া হইবে। তাঁহারা বলিলেন যদিও আমাদের চীনে ও জাপানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আপনাকে লইয়া সত্বরেই সোজাপথে রওনা হই-তেছি। ভুলাং লামাকেও বলা হইয়াছিল কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না।

আমরা পরদিনেই মস্কাউ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু

রাসিয়ায় প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃই—মস্কাউতে না যাইয়া রাসিয়ার কয়েকটী প্রধান নগর দেখিয়া—সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। ইহাদের দলপতি লেনিনের সহিত আলাপ হইল। লেনিন সমগ্র জগতে এখন বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার সম্বন্ধে তোমায় কিছু জানাইতেছি।

ইহার পুরা নামটা এক ভীষণ শব্দ-সঙ্ঘ-বিশেষ; উহা এইরূপ—ভ্যালাডিমির ইলাইক ই-উলাইনভ লেনিন্—(Vladimir Ilyiec Ulyanov Lenin)। লেনিন পদটী উপাধি—যেমন ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ইত্যাদি। উপাধিটীই এই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামের পরিচায়ক। ১৮৭০ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ইনি ইহ জগতে ছিলেন। ইনি ৫৪ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বিপুল বিশাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইনি সোভিয়েট-জনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল সম্প্রদায়ের প্রধানতম আচার্য্য, এবং Marx নামক স্বাধীন চিন্তাশীল জার্ম্মাণদার্শনিক পণ্ডিতের প্রধান শিষ্য, বলশেভিক সম্প্রদায়ের নেতা, এবং রুস রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধানতম ঘটক। ১৮৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল ইনি সিমবাস্ক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানটীর আধুনিক নাম—উলায়েলভস্ক। ইঁহার পিতার নাম—ইলায়া নাইকোলিভিচ, মাতার নাম আলেকজেন্দ্রা ড্রোভনা। ইনি একটি ডাক্তারের কন্যা। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ১৮৬৬ সালে "নরডো-ভলটজ" নামক সমিতিতে যোগদান করেন। এই পদের অর্থ জন-সাধারণের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন সমিতি। ইংরাজেরা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—

"Narodovoltz was a revolutionary terrorist society"

এই সমিতিতে সদস্য হইয়া ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রুসসম্রাট

তৃতীয় আলেকজেণ্ডারকে নিহত করার প্রয়াসে যোগ দিয়াছিলেন। এই অপরাধে ইহাকে নিহত করা হয়। তখন উহার বয়স ২২ বৎসর মাত্রছিল। ইহারা ছয় ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি তৃতীয়। ইহার ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের কথা ইহার হৃদয়ে চিরদিনের তরে অঙ্কিত হয় এবং উহাই ইঁহার ভাবি-জীবন গঠনের সহায় হইয়া দাঁড়ায়।

১৮৮৭ সালে লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ আরম্ভ করেন কিন্তু ছাত্রসমিতিতে যোগ দেওয়ায় তাঁহাকে পল্লীগ্রামে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৮৮৮ সালে পুনর্ব্বার আইন পাঠের অধিকার দেওয়ার জন্য ইনি বহুবার দরখাস্ত করেন কিন্তু সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়। ১৮৮৯ সালের শরৎকালে তাঁহাকে আবার কাজানে আসিতে অনুমতি দেওয়া হয়। দেশে আসিয়া ইনি Marxএর গ্রন্থ ও তৎপ্রবর্ত্তিত কার্য্যাদিতে মনোযোগ করেন। ১৮৯২ সালে লেনিন সেণ্টপিটার্স বর্গের বিশ্ববিদ্যালয়েরর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সামারা নগরে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি অনেক অপরাধীর পক্ষে ওকালত নামা গ্রহণ করেন। কিন্তু মার্কসের প্রবর্ত্তিত অর্থনীতি ও রাজনীতিতেই তাঁহার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হয়—সেই সকল নীতি কার্য্যে পরিণত করাই তাহার জীবন ব্রত হইয়া দাঁড়ায়।

১৮৯৫ সালের পরে লেনিন শ্রমজীবীদের ক্লেশ-অপনোদন এবং তাহাদের উন্নতি-সাধনার্থ যথেষ্ট শ্রম ও চিন্তা করেন এবং এই জন্য সভা সমিতিও সংস্থাপন করেন। এই সকল কার্য্যে তিনি জনসমাজে ক্রমেই সমাদৃত ও খ্যাতি লাভ করেন। এই সকল কার্য্য সাধনার্থ তাঁহাকে দেশের আইনবিরুদ্ধ বহুল ভীষণ কার্য্য করিতে হয়। তজ্জন্য ইনি ১৮৯৬ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৮৯৭ সালে তাদৃশ অপরাধের জন্য তাহাকে পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ইয়েনেসী প্রদেশে তিন বৎসরের জন্য

নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৮৯৮ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নীর নাম—এন্ কে, ক্রুপস্কায়া! তিনি সর্ব্বতোভাবেই পতির সহধর্ম্মিণী হইয়া পতির সহিত এক যোগে ২৬ বর্ষকাল দেশের কার্য্যে জীবন যাপন করেন। লেনিন তদীয় নির্ব্বাসন-কাল ব্যাপিয়া এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া পরিসমাপ্ত করেন। উহার নাম—The development of Capitalism in Russia. এই গ্রন্থ তাঁহার গভীর অধ্যয়নেরই ফল। ১৯০১ সালে তিনি Thc spark অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ নামে একখানি রাজ-দ্রোহী সাময়িক পত্র মিউনিক নগরে থাকিয়া প্রকাশ করেন। ইহার উদ্দেশ্যজ্ঞাপক সারসংক্ষিপ্ত বাণী ছিল From spark to flame অর্থাৎ "স্ফুলিঙ্গ হইতে জ্বলিত অনল'।

Social Democrat সম্প্রদায়ের রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব নীতি প্রচারই এই সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। নিপীড়িত প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া রাজশক্তির বিনাশ সাধনার্থ লেনিন বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন এই কাগজখানি এই ভীষণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়।

এই সময়ে রাসিয়ার জননায়কগণ প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন—বলশেভিক এবং মেনশেভিক। কৃষক ও শ্রম জীবী প্রভৃতি লইয়াই—বলশেভিক সমাজ গঠন করা হয়। মেনশেভিক সম্প্রদায় সৎকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ভদ্র সন্তান ও (Liberal Bourgesisie) ছিলেন। লেনিন প্রথম দলেরই নেতৃত্ব করেন। মেনশেভিকগণ—সুসময়ের প্রতীক্ষক ও সুধীরভাবে কার্য্য-সাধক কিন্তু বলশেভিকগণ সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে নারাজ,—পাশবিক বলে বিপ্লব ঘটাইয়া স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর। ১৯১৮ সালে Social Domocrat সম্প্রদায় Communist আখ্যায় অভিহিত হয়। ১৯০৫ সালে লেনিন রুস সম্রাটের বিরুদ্ধে মহাবিপ্লবের সৃষ্টি করেন। ১৯১৭ সালে শ্রমজীবিগণকে, কৃষকগণকে,

এবং ইতর জনসাধারণকে সম্রাটের নিষ্ঠুর শাসন হইতে বিমুক্ত করিয়া লেনিন রুশজনসাধারণের এক স্বতন্ত্র শাসন-রাজ্য গঠন করেন—ইহার নাম—সভিয়েট-গবর্ণমেণ্ট বা সভিয়েট্-ষ্টেট।

লেনিনও কিছুদিন পর্য্যন্ত সুসময়ের প্রতীক্ষক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—যদিও লেনিন্ কিছু দিন সুসময়ের ও সুবিধার প্রতিক্ষক ছিলেন কিন্তু তখনও তাহার মনে দুর্দ্দমনীয় বিপ্লব-সাধন-বাসনা বর্ত্তমান ছিল। *

অবশেষে সময় আসিল। ১৯০৫ সালে যে ভীষণ বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, ১৯১৫ সালে সেই অঙ্কুর মহামহীরূহে পরিণত হইয়া ফলবান্ হইল—তাহারই ফলে মস্কাউ নগরে সোভিয়েট ষ্টেট্ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২০ সালে সোভিয়েট কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে, লেনিন সোভিয়েট ষ্টেটের বহু উন্নতির উল্লেখ করিয়া এক রিপোট প্রকাশ করেন। এই সময়ে সভ্য জগৎ জানিতে পারিলেন যে বলশেভিকগণ কেবল যে একটী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছেন তাহা নহে, এই রাষ্ট্রে নব ভাবের তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত করা হইয়াছে। (Socialism is a Soviet government plus electrification.) লেনিনই এই ষ্টেটের প্রতিষ্ঠাতা।

অসাধারণ শ্রমে শ্রমে লেনিনের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার মাথার ধমনীতে শোনিতগতি মন্দ ও মন্থর হইয়া পড়িতেছিল। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে পীড়া ক্রমেই প্রবল হইল, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল। কিছু দিন পরে আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেল বটে কিন্তু উহা স্থায়ী হইল না। ১৩ই ডিসেম্বর তাহার দক্ষিণাঙ্গে বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এই পীড়ায় ১৯২৪ সালের ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মস্কাউর

---

* He was for sometime an implacable revolutionary at bottom, while yet remaining a Realist who made no mistakes in choice of Methods and Means.

নিকটবর্ত্তী গর্কী নামক স্থানে লেনিন মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার অভাবে শোক প্রকাশ করিতে সমাগত হন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় এমন ব্যাপারের বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে আর জানা যায় নাই।

লেনিন উৎপীড়িত মানবসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। জনসঙ্ঘ গঠনে তাঁহার দক্ষতা প্রকৃতই অতুলনীয়। লেনিনের বাহ্য প্রকৃতিতে সরলতা ও বলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার আকার নাতিদীর্ঘ ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে সাধারণ শ্রেণীর লোকের ভাবই প্রতিফলিত ছিল—কিন্তু নয়ন-যুগল সমুজ্জ্বল ও অন্তর্দর্শিতার ভাবব্যঞ্জক বলিয়াই প্রতিভাত হইত। প্রসরতর ললাট ও বৃহদাকার মস্তকে তাঁহার মানসিক ক্ষমতা ও শাসন-দক্ষতা-চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যাইত। লেনিন অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার চিত্ত, সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকিত। লেখায় বা বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই তাঁহার ভাষা অতীব সরল ছিল। তাঁহার চরিত্রে কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় নাই, তিনি বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন; নিপীড়িত, দুর্ব্বল ও শিশুদের সহিত তিনি অতি মিলিয়া মিশিয়া আলাপ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই অতি সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করিতেন; পানাহারে অতি সংযত ছিলেন, সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিতেন, কোনও বিষয়ে তাঁহার জাকজমক ছিল না। সর্ব্বদাই তিনি দেশের হিত-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এই নিমিত্ত ক্ষণ কালের জন্যও তাঁহার মনে বিলাস-বাসনা আসিত না—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি নিপীড়িতগণের দুঃখ-মোচনের উপায় বিধানে যত্নবান্ ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার জীবনে ধর্ম্মভাবের কোনও চিহ্ন কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। নেপোলিয়ানের ন্যায় নরশোণিতে

বসুধা কর্দ্দমিত করিয়াও নিজের অভীষ্ট সাধনে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের ধর্ম্মে ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস ছিল। ইঁহার সেরূপ ছিল না। রাসিয়ার রাষ্ট্র বিপ্লবের ভীষণ অনর্থ উৎপাদন না করিয়া তিনি যদি রাসিয়ার রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে পারিতেন, তবে আমি তাঁহার ধন্যবাদ করিতাম। লেনিন পাশবিক শক্তির উপাসক ছিলেন—সেই শক্তির প্রভাবেই তিনি রাসিয়ার প্রজার হিতসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—তিনি রাসিয়ায় যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে চিরদিনই জগতের অশান্তি-বৃদ্ধি হইবে। ধর্ম্মবলই প্রকৃত বল। কমিউনিষ্ট বা বলশেভিকগণ সে জ্ঞানে বঞ্চিত। রাক্ষসী দুর্ব্বাসনা, পরশ্রী-কাতরতা, দাম্ভিকতা এবং পাশব বল-প্রিয়তা এই সকলই কমিউনিষ্টগণের হৃদয়ের প্রধান বৃত্তি বলিয়া অনেকের ধারণা। যদি তাহাই হয় তবে ইহা একেবারেই সুনিশ্চিত যে বলশেভিকগণ জগতের সুখ শান্তি প্রদান করিবে না—করিতেও পারে না। অধুনা জগতে এই এক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে—অধুনা ভারতবর্ষেও এ তরঙ্গের অভিঘাত অনুভূত হইতেছে। এদেশীয় সরল বুদ্ধি যুবকমণ্ডলীর হৃদয়ে এই আদর্শ স্থান পাইতেছে। ইহারাও ঈশ্বরের সিংহাসন তুলিয়া দিতে স্পষ্টতঃই বাসনা প্রকাশ করিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়বিজ্ঞানের অসম্যক্ আলোচনা করিয়া জড়বাদের সমর্থন করিতেছে। এদেশের যুবকগণের ততটুকু শিক্ষাও নাই—কোনও শিক্ষা নাই বলিলেও চলে—তথাপি ইহারা পাষণ্ড পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারত ভূমি দেবতার দেশ—রাক্ষসের দেশ নহে—এখানে দানবীয় খেলার স্থান নাই—এই জন্য ইহাদিগকে বিড়ম্বিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে।

মস্কাউ নগরে এই সকল ভগবদ্‌দ্রোহী, রাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের মধ্যে আমাকে যে বক্তৃতা করিয়া এই সকল অভিমতের প্রতিবাদ

করিতে হইয়াছে, তাহাও অতঃপরে তোমায় জানাইব। এখন আরও দুই একটি এই জাতীয় কর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত তোমায় জানাইতেছি। ইহারা সুশিক্ষিত হইয়াও কিরূপ ভ্রমপথে পরিচালিত হইয়াছে, এবং অন্যান্যকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা ইহাদের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে। রাসিয়ার কৃষকদের অত্যন্ত দুঃখ ছিল ইহা সত্য। কিন্তু পাশব বলে তৎপ্রতীকার মঙ্গলজনক নহে।

অন্য এক শ্রেণীর রাজদ্রোহীরা নিজ স্বার্থে রাজদ্রোহের বিপদ আগ্রহ করিয়া মাথায় লইত না—নিঃস্ব পিপীড়িত ক্ষুধার্ত্ত প্রজার দুঃখ দূর করার জন্যই এই শ্রেণীর পরদুঃখকাতর যুবকগণ আগ্রহের সহিত নিজদের মাথায় বিপদের বোঝা গ্রহণ করিত, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত, কারারুদ্ধ হইত, নির্ব্বাসিত হইত, সাইবেরিয়ার জনমানবশূন্য সর্ব্বপ্রকার অসুবিধাপূর্ণ কারাবাসে নিঃক্ষিপ্ত হইত, প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত হইত।

রাসিয়ার প্রজাদের যেরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা শুনা যায়, ভারতবর্ষের প্রজাদের প্রতি ইংরাজরাজ অধুনা তাদৃশ অমানুষোচিত অত্যাচার করেন না। এদেশে তাদৃশ রাষ্ট্রবিপ্লবের কোনও প্রয়োজনীয়তাও পরি লক্ষিত হয় না। রাসিয়ার অনুকরণ ভারতবাসীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। কমিউনিষ্টগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। ভারতের রাজনীতিকআন্দোলনকারিগণকে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, সেই গড্ডালিকা-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে—এরূপ নির্ব্বোধ অনুকরণ—অর্ব্বাচীনেরই যোগ্য হইতে পারে।

অধুনা ভারতবর্ষে ইহাদেরই অনুকরণে জাতীয় মহাসভায় প্রকাশ্য-ভাবেই ধর্ম্মোচ্ছেদের মন্তব্যপ্রকাশের অভিপ্রায় করা হইতেছে, প্রকাশ্য সভাতে ভারতীয় মহিলাদের সতীত্বধর্ম্মের উচ্ছেদ করার জন্য সর্ব্বজন-সমক্ষে নির্লজ্জ নির্ভীকভাবে মহিলারাই বক্তৃতা করিতেছে। ধর্ম্মদ্রোহ

রাজদ্রোহ মর্য্যাদাদ্রোহ এবং সামাজিক চিরন্তন-সুনিয়ত সদাচারদ্রোহ—বর্ত্তমান রাজ-নীতিক আন্দোলনের মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রাসিয়ার বল্‌শেভিক ভাবের প্রবাহ খুব প্রবল বেগেই ভারতে প্রবেশ করিতেছে। রাজনীতিকসমিতি-বিশেষের সদস্যগণের অনেকেই পরোক্ষভাবে এই সকল বিপ্লব মতের পোষক ও প্রচারক।

রাসিয়া এই বিপ্লব ভাব-সাগরের কেন্দ্রস্থলী। মস্কাউ সহরই অধুনা এই সম্প্রদায়ের রাজধানী। আমি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলাম। ইহাদের ক্রিয়া-কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল দেখিবার জন্যও ইচ্ছা ছিল। ঘটনাক্রমে ইহাদের দ্বারাই আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছি; ইহাদিগকে কিছু বলিবারও সুবিধা পাইয়াছি। এখানে অনেক কথাই বলিয়াছি,—তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তোমায় লেখার পূর্ব্বে ইহাদের উদ্দেশ্য ও অভিমত এবং অপর শ্রেণীর হিতৈষী বিপ্লবকারী-দের কার্য্য এবং দুই একজনের জীবনী সম্বন্ধে তোমাকে কিছু আভাস দিতেছি।

ইহাদের কথা এই যে ভোগবিলাসী রাজা প্রজার দুঃখ কষ্ট বোঝেন না। প্রজারা অনবরত পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে, রাজা ও মহাজনগণ তাহাদের সেই মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়। ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হয়; ইহাদের শিশুসন্তান গুলি পর্য্যন্ত অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, রাজা বা সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়াও দেখেন না, সে দুঃখের কাহিনী তাঁহাদের কর্ণগোচর করিলেও তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন না—দরিদ্রের অর্জ্জিতধন কাড়িয়া লইয়া তাহারা বিলাস উদ্যমে ব্যয় করেন।

এই সকল ক্ষুধার্ত্ত নরনারীগণের কাতর আর্ত্তনাদ ও তাহাদের দুঃখের

হৃদয়-বিদারী করুণ রোদন, তাহাদের যুগযুগান্ত সঞ্চিত দুর্দ্দশা দৈন্য ও দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের বিলাপ—হৃদয়বান্ মনুষ্যমাত্রেরই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ-জনক। ইহাদের লজ্জানিবারণের কাপড় নাই, শীত-নিবারণের বস্ত্র নাই, পেটে ভাত নাই, মাথা রাখিবার কুটীর নাই—সারাদিনরাত্র হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও রাজার, মহাজনের ও পুলিশের অত্যাচারে ইহারা একটি কপর্দ্দকও নিজদের দৈনন্দিন অভাবমোচনের জন্য হাতে রাখিতে পারে না। ক্ষুধায় উহাদের দেহ জীর্ণ শীর্ণ; পরিশ্রমে পরিশ্রমে দেহ—কঙ্কালসার;—দেশের ধনীদের জন্য নিঃস্বার্থ দাসত্ব করিতেই যেন ইহাদের জন্ম। ইহাদের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—কেবল ধনীদের ভোগলালসাময়ী রাক্ষসী বাসনার পরিপূরণার্থই ইহাদের অনবরত দৈহিক শ্রম। রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি—যে যখন ইচ্ছা করে, সেই ইহাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করে, ইহাদের শ্রমার্জ্জিত ধন লুণ্ঠন করে এবং ইহাদের স্বাধীন বাসনা পদ-দলিত করে। ইহারা গর্ত্তে পড়িয়া মরিলেও কেহ হস্তোত্তলন করিয়া ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা পায় না—কেহই ততটুকু দয়া করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এমনই দেশের দুরবস্থা। ১৮৬০ সালের অনেক পরেও রাসিয়ায় এই অবস্থা দেখা গিয়াছে।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে অতঃপরে এই মরুভূমিতে মাঝে মাঝে নয়ন-রঞ্জন কুসুমসুষমাপূর্ণ কাননের সৃষ্টি হইতেছিল—পরদুঃখকাতর উদ্যমশীল সম্ভ্রান্তবংশ যুবক যুবতীগণ—দুঃখীদের দুঃখমোচনার্থ বদ্ধপরিকর হইতে লাগিলেন। এই পতিত-দুর্গতগণের উদ্ধারার্থ ইহারা হস্ত প্রসারণ করিলেন, কি প্রকারে ইহাদের দুঃখ-দুর্গতি দূরীভূত হইবে, তাহার উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এই দুঃস্থদুর্গতদের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে করুণ-কাতরতা জাগরিত হইতে লাগিল—তাহাদের ললাটে উদ্যম উৎসাহের তেজো-

রেখা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। দুঃখিগণের দুঃখমোচনের জন্য, নিপীড়িতগণের অত্যাচার উন্মূলনের জন্য ইহাদের নয়নে উন্ম-মের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফূর্জ্জিত হইতে লাগিল। জনসমাজের দুঃখ দূর করার জন্য ইহারা বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং ইহাদের ক্লেশাপনোদনের জন্য ইহারা ইহাদের দেহ, বল ওজ,—এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কার্য্যতঃ রাজার নিগ্রহে শত শত নরনারী চিরদিনের তরে নির্ব্বাসিত,—শত শত যুবক, কেবল দেশের লোকের দুরবস্থা-বিমোচনার্থ রাজদণ্ডে রাজার কোপানলে স্বীয় প্রাণের আহুতি প্রদান করিলেন। দীন দুঃখীর দুঃখমোচনে নিজের আত্মা নিবেদিত করিয়া এই সকল নরনারী জগতের ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া এজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বুদ্ধদেব জগতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিপুল বিলাসোপভোগযোগ্য বিশাল বৈভবের আধিপত্য তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কৌপীন পড়িয়া ভিক্ষুর বেশ ও ভিক্ষুর ভাব ধারণা করিলেন। রাসিয়ার যুবকগণ, তত উচ্চ উদ্দেশ্যে না হউক, দেশের দুরবস্থা দূর করার জন্য নিজদের বসন-ভূষণ বিলাসভোগ ও বিলাসশয্যা ত্যাগ করিয়া কৃষকের বেশে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের দুঃখ,—তাহাদের দৈন্য,—তাহাদের অভাব,—তাহাদের ক্লেশ সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন, বিলাস বৈভব-ময় পিতৃআবাস ত্যাগ করিয়া কুটীরবাসী হইলেন, রাজপুত্র পথের ভিখারী সাজিলেন—মনে করিলেন, যে দেশে আমারই মত রক্তমাংসের মনুষ্যের এত দুর্দ্দশা, সেস্থলে আমি কোন্ যুক্তিতে সুখের আবাসে বিলাস ভোগ করিব? ইহাঁরা বিলাস-পালঙ্ককে কলঙ্কের ন্যায় মনে করিয়া দুঃখীদের সহিত পথের ধুলায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। সম্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিলাসের কোমল কোলে লালিত পালিত হইয়া

ইহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রমজীবীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া উহাদের দুঃখ-দুর্গতি অত্যাচার-উৎপীড়ন নিজেরা ভোগ করিয়া উহাদের দুরবস্থা-মোচনের জন্য উৎপীড়কের শক্তি সংহনন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সরকারী উৎপীড়কগণ তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আসে আসুক, তাঁহারা তাহাতে ভীত নহেন! নির্ব্বাসন—সাইবেরিয়ায় কঠোর কারাদণ্ড,—এমন কি, সরকারী বিচারে ভীষণ মৃত্যু দণ্ডকেও ইহারা প্রীতি-নির্ম্মাল্য জ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহই সহ্য করিয়া কর্ত্তব্যতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৭২-৭৪ সালে রাসিয়ায় এই শ্রেণীর রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সম্প্রদায় (Revolutionary Socialist) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারও পূর্ব্বে সুবিখ্যাত লেখক, বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রাসিয়াবাসীদের জন্য বিপ্লব-ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রুধন (Proudhon), ফুরিয়ার (Fourier), আউয়েন (owen) প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের সঙ্গে আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ নেতার নাম অতি সুপ্রসিদ্ধ।

সারনিসেওয়েস্কীর নাম পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। গভীর চিন্তাশীলতায়, অর্থনীতি জ্ঞানে এবং উপন্যাস-লেখায়,—ইনি রাসিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহারই লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া রাসিয়ার প্রজাগণ ও জনসাধারণ এমন সমুত্তেজিত হইয়াছিলেন যে রাজদ্রোহ উত্তেজিত করার অপরাধে ইঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ডব্রোলিনবফ্ (Dobrolinboff) নামক অপর একজন সুলেখক ও তীব্র সমালোচক তদীয় লেখার প্রভাবে সমগ্র রাসিয়াকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; ২৬ বর্ষ বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। মিকেইলফ্ (Micailoff) নামক একটি অধ্যাপক ও লেখক তাঁহার লেখা ও বক্তৃতার জন্য দীর্ঘ

কাল ব্যাপিয়া কারাগারে দণ্ডিত হন। রুস রাষ্ট্রবিপ্লবকারিগণ রাসিয়ায় বসিয়া রাসিয়ার মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি প্রচার করিতে পারিতেন না। এই জন্য হার্টজেন (Hertzen) এবং ওগারেফ্ (Ogereff) নামক দুই জন সুলেখক রুস ভাষায় 'কলকল' (Kolokol) নামক এক খানি সাময়িক পত্র লণ্ডন হইতে প্রকাশ করেন।

এইরূপে এই সময়ে রাসিয়ার লেখক ও বক্তৃবর্গ সোসিয়ালিজম্ (Socialism) এবং রাজদ্রোহের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন। ফ্রান্সের প্যারীস কমিউন্‌ও অভিনব রুসবিপ্লবের পথ প্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছিল। সমগ্র জগতে উহার নামধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—রাসিয়ায় জনসাধারণের হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই এজন্য কতকটা প্রস্তুত হইতেছিল। প্যারিসের জনসাধারণের অভ্যুত্থান-নীতির অভিনব মদিরায় রাসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবকারীরা প্রচুরতর উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়; সে তরঙ্গ সুদূর পল্লীতে কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রবেশ করে।

১৮৬৬ সালের পর হইতে জনসাধারণের উন্মাদনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। পাশব বলের প্রভাব ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে রাজ-শক্তির ও রাজপুরুষদের শক্তির অপব্যবহার কমিতে পারে, এরূপ আশাই রহিল না। অসন্তোষের অনল সকলদিকেই প্রধূমিত হইতেছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন কারণে—উহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। উত্তেজনায় উত্তেজনায় কৃষক ও শ্রমজীবীদের হৃদয় শুষ্ক পত্রের ন্যায় মর্ম্মর হইয়া উঠিল, কোন প্রকারে একটুকু স্ফুলিঙ্গ-স্পর্শ হইলেই সমগ্রদেশে রাজদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিবে, রাজপুরুষদের মনেও এরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছিল।

১৮৭১ সালে মস্কাউ নগরে "ডলগাসেঞ্জী" (Dolguscenzi) নামে এক সমিতির সৃষ্টি হইল। ইহার পর বর্ষে সেণ্টপিটার্স বার্গেও

"সিয়াইকভ্জি" নামে উহাদের আর একটি সমিতি গঠিত হইল। মস্কাউ, ওডেসা, ওরেল এবং কিফ্ সহরেও সিয়াইকভ্জি' সমিতির শাখা সমিতি সংস্থাপিত হইল। এই সকল সমিতির প্রচারকগণ, সমিতি গুলির উদ্দেশ্য ও নীতি সুদূরস্থ গ্রামে গ্রামে কৃষক ও শ্রমজীবীদের ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জনসাধারণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উৎপীড়কদের হস্ত হইতে সমাজের পরিত্রাণের জন্য আর একটি বিপুল বিশাল জনসঙ্ঘের সৃষ্টি হয়; উহা অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। যে ভাবটী ইয়োরোপে প্রায় প্রত্যেকের হৃদয়ে হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হইতেছিল, এই সময়ে উহা ইন্টারন্যাশেনেল Internationale) সমিতি নামে ঘনীভূত, প্রবর্দ্ধিত ও সম্যক্ বিকশিত অবস্থায় প্রকাশ পাইল।

এই ব্যাপারে মাইকেল ব্যাকুনিনের (Michael Baeunin) নাম চির প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইনি Anarchial বা ফিভারেলিষ্ট ইণ্টারন্যাশনেলের (Federelistic Internationale) প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুল গ্রন্থের সুবিখ্যাত প্রণেতা। পিটার লেভরফের (Peter Levroff) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেমন সুলেখক, তেমনই দার্শনিক পণ্ডিত। লেভরফ, ভিপিরিয়ড্ (Vperiod অর্থাৎ onward) বা অগ্রসর নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। লেভারফ্, বেকুইনের ন্যায় উগ্রতন্ত্রের লোক ছিলেন না। উভয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল কিন্তু লেভরফ অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে গন্তব্য স্থান-প্রাপ্তির প্রয়াস পাইতেন। উভয়েই বিপ্লববাদী,—উভয়েই সুলেখক—উভয়েই কর্ম্মঠ।

রাসিয়ার এই আন্দোলনে ইণ্টারন্যাশনেল সমিতির প্রচুর প্রভাব ছিল। রাসিয়ায় মহিলাদের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যুত বহুল প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের প্রধান সহর

জুরিক নগরে ইণ্টারন্যাশনেল সমিতির কার্য্যবিধানে স্ত্রীশিক্ষার পথ অতীব প্রসরতর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাসিয়ার বালিকাগণ এই স্থানে যাইয়া প্রুঢন, ফুরিয়ার, মার্কস্ প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিতেন—এই সকল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতেন। জুরিক নগর ইউরোপীয়ান্ সোসিয়ানিজ্‌ম্ (European Socialism) শিক্ষার এক মহাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। রাসিয়া হইতে সহস্র সহস্র নর নারী এই সম্মিতিতে যোগদান করিতেন।

রাজদ্রোহীর ক্রিয়াকলাপ অধিকদিন গবর্ণমেণ্টের অবিদিত রহিল না। ৩৭টী প্রদেশে রাজদ্রোহের বীজ ১৮৮০ সালের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িল। গ্রামে গ্রামে পুলিশ চর নিযুক্ত হইল, গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল। লেখক ও বক্তারা নানাপ্রকারে দণ্ডিত হইতে লাগিলেন পুলিশ কত লোককে যে গ্রেপ্তার করিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। ১৯৩ জন আসামীর বিচার এক সঙ্গে চলিভে ছিল। চারি বৎসরের মধ্যেও এই বিচার শেষ হইল না। ইহাদের বিচার হইতে না হইতেই এইরূপ অপরাধে এক হাজার আসামীকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইল। অবশেষে রাজনীতিক অভিযুক্তের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিল যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল আসামীকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত করার আদেশ শিথিল করিলেন।

গবর্ণমেণ্টের মনে ধারণা ছিল যে ইহাদের দণ্ড দেখিয়া জনসাধারণ ভীত হইবে—তাহারা আর এরূপ অপরাধ করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এ ধারণা অতীব ভ্রমাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। অপরাধীরা দেশের দিকে চাহিয়া,—দশের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল মুখে, নির্ভীক ভাবে সর্ব্বপ্রকার কঠোর দণ্ড উচ্ছ্রিত মস্তকে গ্রহণ করিল—সে দৃশ্য দেখিয়া ইহাদের শত্রুরাও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইহাদের

ভাবগতির প্রশংসা ও ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই—প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—They are saints—ইহারা সাধু পুরুষ—ইহারা ধন্য। সুতরাং গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত দণ্ডের বিপরীত ফলই ফলিতে লাগিল।

এই মোকদ্দমায় যে ১৯৩টি আসামীকে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয় স্বার্থশূন্য ছিল, ইঁহাদের প্রত্যেকেই দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, দেশের হিত সাধনে স্বকীয় আত্মাকে নিবেদিত করিয়াছিলেন। উহাদের হৃদয়ে স্বার্থ-লাভের গন্ধমাত্রও ছিল না। ইহারা প্রকৃত পক্ষেই দেশের মঙ্গলের জন্য কঠোর বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিয়া, মহাত্যাগী ও মহাযোগীর জীবনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, অতর্কিত অদৃশ্য ভাবে ঠিক সেই উপদেশেই যেন ইহাদের জীবন গঠিত হইয়াছিল।—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

ঠিক এই ভাবেই কর্ম্মফলের অভিসন্ধি অনাশ্রয় করিয়াই ইহারা কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেবল ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন গীতার বৈরাগ্য ও ত্যাগস্বীকার সম্বন্ধে সকলগুলি উপদেশই যেন ইহাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইঁহাদের দলে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় প্রকার ত্যাগী কর্ম্মযোগী ছিল। *

---

* অনেক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :—

For sevral years, indeed, evcn absolute ascetccism was ardently maintained among the youth of both sexes. The propagandists wished nothing for themselvcs They were the purest personification of Self-denial. The

প্রজ্ঞা-প্রতিভাময়ি—এস্থলে এই শ্রেণীর কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীদের উদাহরণ প্রদর্শনার্থ দুই একটি স্ত্রী ও পুরুষের সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা প্রথমতঃ তোমায় জানাইতেছি। অতঃপরে মস্কাউনগরে আমি এই Revolutionary Socialist এবং আধুনিক কমিউনিষ্টদিগের (Communist) নীতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে যে প্রতিকূল অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছিলাম,—সংক্ষেপে তাহা তোমাকে জানাইব।

১। পিটার ক্রেপট্‌কিন্

ইউরোপের লোকেরা ইহাকে নিহিলিষ্টসম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া জানেন; বাস্তবিক পক্ষে ইনি ইহাদের নেতা ছিলেন না। রাসিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লব-ব্যাপারে ইহার কোনও পরিচালন ক্ষমতা ছিল না। কাগজে পত্রে বা কোন গ্রন্থাদি লিখিয়াও ইনি বিপ্লবের কোনও সাহায্য করেন নাই। ইনি সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন, তবে ফরাসী ভাষায় সময়ে সময়ে বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিতেন বটে কিন্তু উহাতে রুসদের কোনও উপকার হয় নাই, ক্রেপটকিন্ ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেন। এইরূপ লুক্কায়িত ব্যক্তিদের দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লবের সবিশেষ কোন সাহায্য হয় না। এই শ্রেণীর স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরা পুলিসের ভয়ে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ইটালীতে ও সুইজারল্যাণ্ডে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিতেন। কেন না, এই সকল স্থানে ধরা পড়িবার কোনও আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রাসিয়ায় বা অষ্ট্রীয়ায় থাকিবার সাহস কাহারও বড় হইত না।

---

type of these propagandists was religious rather than revolutionary. His faith was Socialism, his Lord—the people,

ক্রেপট্‌কিন্ একজন প্রাচীন পলাতক। ক্রমাগত ছয় বৎসর ইনি পলাতক অবস্থায় বাহিরে বাহিরে দিন যাপন করিতে ছিলেন। স্বদেশের লোকদের স্বাধীনতা-লাভের জন্য ইনি কিছুই করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহা অনেকেই জানেন যে রাজদ্রোহীদের মধ্যে ইনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইনি রাসিয়ার কোন অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রাসিয়ার অনেকের ইহাই ধারণা,—ক্রেপট্‌কিন্, বংশ-মর্য্যাদা-অনুসারে রুস-সম্রাট হইবার উপযুক্ত ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার হইতেও রাজসিংহাসনে তাঁহার দাবী বেশী ছিল। কেন না উক্ত সম্রাট জার্ম্মান বংশীয়। ক্রেপট্‌কিন্ পেজদিগের কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, এই সকল কলেজে কেবল রাজবংশীয়গণই প্রবেশের অধিকার পাইতেন।

১৮৬১ সালে ইনি অত্যন্ত সম্মান সহকারে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যয়নই ইহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাজসরকারে উপযুক্ত কার্য্য পাওয়ার প্রস্তাবনা সত্ত্বেও ইনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভু-তত্ত্ব (geology) সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য সাইবিরিয়াতে গমন করেন। সেখানে কতিপয় বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অতিবাহিত করিয়া অনেক প্রকার তথ্য অবগত হন। ইনি চীন দেশেও ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; তথা হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রত্যাগমন করিয়া তত্রত্য ভূগোল-সমিতির সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত হন। ইনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন তাহার সকলগুলিই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রশংসিত। অতঃপরে ইনি ফিন্‌ল্যাণ্ডের গ্লেসিয়ার্স সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যদিও রাজসরকারে কোন কার্য্য গ্রহণ করিতে ইহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রাজপরিবারের বিশেষ অনুরোধে ইঁহাকে সম্রাট্-পত্নীর চেম্বারলেন পদে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। এই কাজের দক্ষতার জন্য তিনি

অনেক প্রকার সম্মানসূচক রাজভূষণ প্রাপ্ত হন। ১৯৮২ সালে ইনি বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ড প্রদেশে গমন করেন। এই অঞ্চলে কমিউনিষ্টগণের ইন্টারন্যাশনাল সভার অধিবেশন হয়। এই সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া রাজনীতিসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বের উন্নত ধারণা আরও উন্নততর হয়। জনসাধারণ অর্থক্লেশে অনাহারে মরিয়া যাইবে অথচ সমাজের সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা কৃষক ও শ্রমজীবিদিগকে পদ-দলিত করিয়া তাহাদের রক্তে বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবেন; ইহা কখনই সুসঙ্গত নহে; ইহার বিরুদ্ধে সহৃদয় মানুষ মাত্রেরই দণ্ডায়মান হওয়া উচিত",—ইন্টারন্যাশনাল সমিতির এই সিদ্ধান্তে ক্রেপট্‌কিনের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তিনিও একজন ইন্টারন্যাশনেলিষ্ট হইয়া নিপীড়িতদের পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং গরম দলের চরম সিদ্ধান্তবাদীদের সঙ্গে যোগদিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হইলেন।

সুইজারল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাষ্ট্রবিপ্লববাদীদলের সদস্য হইলেন। এই দলের কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করার ভার তাঁহার উপর নিপতিত হইল। কি প্রকারে সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, সে পরামর্শের উপায়ও তাঁহাকেই বিধান করিতে হইল। ১৮৭২ সালের শীতকালে তিনি গুপ্তভাবে ইন্টারন্যাশনালের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। সোসিয়ালিজম্ (Socialis) এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের (Revolution) নীতি ও উদ্দেশ্যগুলি যে বর্ত্তমান জনপ্রিয় আন্দোলনের উপরেই অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি এমন সরল ভাষায় ও সরল ভাবে এই গুরুতর বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার প্রত্যেক কথাই জনসাধারণের হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে লাগিল, আলেকজাণ্ডার নেভেস্কি জেলার

অতি নিরক্ষর লোকগুলিও তাঁহার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যে সকল লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিত, তাহারা আপন আপন পল্লীগ্রামে যাইয়া সমব্যবসায়ী লোকদিগকে, রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রয়োজনীয় কথা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রেপট্‌কিনের রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল; রাজকীয় পুলিশ এই শ্রেণীর অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা এই বক্তাকে খুজিয়া বাহির করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই জেলায় ক্রেপট্‌কিন্ বর্‌ডিন্ নামে পরিচিত ছিলেন। এই নামেই লোকে তাঁহাকে জানিত। তিনি গুপ্ত সমিতিতে বক্তৃতা করেন, কখন যে কোথায় অবস্থান করেন, তাহা কেহ জানিত না। পুলিশেরা সহজে তাহার সন্ধান পাইল না। তিনি দুইমাস সময়ের মধ্যে তাঁহার এই বক্তৃতা শেষ করিয়া ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন পুলিশেরা তাঁহার অনুসন্ধানে ঘুরিতেছে। সুতরাং একস্থানে অবস্থান না করিয়া চিত্রকর ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তিনি কৃষকদিগের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকার চিত্র দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। বহুলোক তাঁহার অঙ্কিত সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিতে সমবেত হইত এবং মনযোগপূর্ব্বক তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিত।

পুলিশেরা বিশেষ কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া এক জন শ্রমজীবী লোককে গোয়েন্দা পদে নিযুক্ত করিল। এই লোকটি বর্‌ডিনকে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইল। এই বেতনভোগী গোয়েন্দা কয়েক মাস পরে কোন একটি গ্রামে ক্রেপট্‌কিন্‌কে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল। কিন্তু এই ব্যক্তিই যে প্রকৃত বর্‌ডিন্,—পুলিশ তাহা ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ক্রেপট্‌কিন্ পুলিশের নিকট তাঁহার নিজের

নাম প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু যে গৃহে তিনি বাস করিতেন, সে গৃহের অধিকারিণী পুলিশকে বলিয়া দিল,—রাজকুমার পিটার ক্রেপট্‌কিন তাহার ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন, তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুলিশ বর্‌ডিন্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছিল। এই গৃহ-স্বামিনীকে উহারা থানায় লইয়া গিয়া বর্‌ডিন্‌কে দেখাইল। সে বলিল "আমি ইহাকে চিনি—ইনি রাজকুমার পিটারক্রেপট্‌কিন্‌। আমার বাড়ীতে ইনি ঘর ভাড়া লইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিয়া-ছিলেন।" ক্রেপট্‌কিন্‌ তখন বাধ্য হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

পুলিশ যখন এই রাজপুরুষকে বিচারালয়ে উপস্থাপিত করে, তখন বিচারালয়ে একটা ভীষণ হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। স্বয়ং সম্রাট ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইলেন। বিচারে ক্রেপট্‌কিন্‌কে তিন বৎসরের জন্য সেণ্টপিটার্স বর্গে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। ক্রেপট্‌কিনের স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না। কারাবাসে উহার স্বাস্থ্য এমন খারাপ হইয়া উঠিল যে তিনি এক গ্রাস খাদ্যও মুখে করিতে পারিতেন না, চলাফেরার কোনও শক্তি ছিল না। এই অবস্থায় ডাক্তারের অভিমতে তাঁহাকে সেণ্টনাই-কোলাস্‌ হাসপাতালে রাখা হয়। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই স্বাস্থ্যভাব গোপন রাখি-বার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন; চলিতে হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় একখানি যষ্টি ভর দিয়া দু-এক-পা চলিতেন, অতি মৃদুস্বরে কথা বলিতেন,—যেন মুখব্যাদন করাই তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। তাঁহার এইরূপ করার একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বস্ত সুত্রে শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার সহকর্ম্মীরা হাঁসপাতাল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করার জন্য সবিশেষ চেষ্টায় আছেন। কারাগার অপেক্ষা হাসপাতাল হইতে উদ্ধার করা অনেক পরিমাণে সহজ। কেননা হাসপাতালে

তত তীব্রভাবে পাহারা রাখা হয় না। এই জন্য উদ্ধার না পাওয়া পর্য্যন্ত রোগের ছলে হাসপাতালে থাকাই তিনি সু-সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ সালে ক্রেপট্‌কিন্ তাঁহার নিজের মতলব অনুসারে হাসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াই ক্রেপট্‌কিন্ অন্যত্র চলিয়া যান। তিনি গুপ্তসমিতিতে আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষার উপায় জানিতেন। কিন্তু সে প্রতারণা-বুদ্ধি তাঁহার খুব কমই ছিল, সুতরাং রাসিয়ার গুপ্তসমিতিতে আত্মগোপন করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল; অথচ তিনি যে কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই কার্য্যে জীবন যাপন করা ব্যতীত অন্য কোনভাবে জীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পুনঃপুনঃ আবদ্ধ হইয়া কারাবাস করা একেবারেই নিস্ফল এই মনে করিয়া তিনি রাসিয়ার সিক্রেট্ সোসাইটী হইতে চলিয়া যাওয়া সুসঙ্গত মনে করিলেন।

ক্রেপট্‌কিন্ গুপ্তসমিতির কার্য্য করিতে সমর্থও ছিলেন না। গুপ্ত-সমিতির কার্য্যে যেরূপ আত্মগোপন, মন্ত্রণা-গোপন, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা, এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতিগুণ আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রে সে সকল গুণের অভাব ছিল। সত্যই—তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য-তিনি সুতীক্ষ্ণ সত্যান্বেষী ছিলেন। মন্ত্রণা-উদ্ভাবন করিয়া উহার যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাহার কোনও দক্ষতা ছিল না। গুপ্ত-সমিতির নেতা হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লব-ব্যাপারে গুপ্তসমিতির কার্য্য মহাসমর-ব্যাপারে গরিলা যুদ্ধের ন্যায় অতিক্ষুদ্র এবং নীচ কার্য্য। সামরিক সৈন্যের সংখ্যা যেখানে অতি অল্প, সেস্থলে প্রকৃত যুদ্ধ সম্ভবপর

নহে। কাজেই লুকাচুরি করিয়া শত্রুপক্ষের বধ-সাধন করিতে হয় কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে সহস্র সহস্র দেশহিতৈষী সমর-বীরগণ প্রকাশ্যে সমরক্ষেত্রে আত্ম-জীবনের আহুতি দিয়া দেশের মান ও দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে বীর-বেশে দণ্ডায়মান হয়। সে বীরত্ব-গরিমার সমক্ষে গরিলা-যুদ্ধ অতীব হেয় এবং অতীব অবীরযোগ্য। রণরঙ্গের রুদ্রতালে স্বদেশহিতৈষীর প্রতপ্ত প্রাণ উন্মত্ত-ভৈরবের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া উঠে এবং ভীমভৈরব-গর্জ্জনে সমরক্ষেত্র মুখরিত করিয়া তোলে। সে দৃশ্য এক মহা-গৌরবের দৃশ্য। ক্রেপট্‌কিন্ এইরূপ সমর-সঙ্কুল রাষ্ট্রবিপ্লবের অধিনায়কের অতীব যোগ্য ছিলেন। লেনিনের ন্যায় বৃহদাকারে বিপ্লব-যুদ্ধ-সংঘটন করিয়া তোলাই তাঁহার হৃদয়গত তীব্র কামনা ছিল। আন্দোলন-ব্যাপারে তাঁহার দক্ষতা প্রকৃতই অতুলনীয়। ওজস্বিনী ভাষায় তেজস্বিনী বক্তৃতায়—তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত হোমানলের ন্যায় বিস্ফুর্জ্জিত ও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিত, চক্ষু হইতে যেন অনলধারা বর্ষণ হইত; তাঁহার প্রত্যেক কথাই তড়িৎবেগে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিত—তাঁহার জিহ্বায় ভীমভৈরবী সমর-ভারতী সর্ব্বদাই যেন তাণ্ডবে নৃত্য করিতেন, হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে গভীর শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহার তেজস্বিনী ভাষা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ক্ষেত্রে রুদ্রতালে নৃত্য করিত; বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতৃজনতা দেখামাত্রই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন; তখন তাঁহার দুর্ব্বল দেহেও সিংহপরাক্রম জাগিয়া উঠিত, হৃদয়ের আবেগে সমগ্রদেহ বিকম্পিত হইত, হৃদগত প্রগাঢ় বিশ্বাসের প্রভাবে তাঁহার প্রমত্ত কণ্ঠ সবেগে উল্লসিত হইয়া উঠিত। শ্রোতৃবর্গ বুঝিতে পারিতেন যে এই ভাষা,—কেবল তাহার মুখের নয়—ইহা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলস্থিত

ঘনীভূত প্রগাঢ় ভাবের ভাষা। ভাব যখন হৃদয়ে আতিশয্য অবস্থায় ঘনীভূত হয়, তখন বক্তার বক্তৃতার বিষয় শ্রোতাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর উপরে তড়িৎ-প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়! ইহার বক্তৃতা যখন শেষ হইত, তখন সেই মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও পরিমৃদিত কমলের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িত। শ্রোতৃবর্গের প্রশংসা ধ্বনিতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া অসন্তুষ্ট ও বিষণ্ণ হইতেন।

স্বাভাবিক আলাপে-সংলাপেও তাঁহার কথার একটা উদ্বোধিনী ও আকর্ষিণী শক্তি ছিল। আইনে ও ইতিহাসে তাঁহার বিপুল অধিকার থাকায় সময়োপযোগী উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইত। সংবাদপত্র-সম্পাদনেও তাঁহার দক্ষতা সকলেরই প্রশংসিত ও চিত্তাকর্ষিণী ছিল। তিনি বালকের ন্যায় সরল ছিলেন ও সত্য বাক্যপ্রিয় ছিলেন, কাহারও সন্তোষের জন্য বা লাভের জন্য মিথ্যা কথা বলিতেন না। তাঁহার কথা সকলেই বিশ্বাস করিত। তিনি কোন কথা বলিতে বলিতে সময়ে সময়ে সহসা কথা-বন্ধ করিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং পূর্ব্বের উক্তিসমূহ যদি কোন প্রকার অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত, তৎক্ষণাৎ নিজেই উহার প্রতিবাদ করিতেন ; তর্কস্থলে তাহার কোন প্রতিবাদী সর্ব্বজন সমক্ষে যখন তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতেন, তখন তৎক্ষণাৎ তিনি বিরুদ্ধবাদীর অভিমতেরই পোষণ করিয়া বলিতেন— "আপনার কথাই সত্য"। এই সকল সৎগুণে পিটার ক্রেপট্‌কিন্‌ জন-সমাজের সর্ব্বত্রই সমাদৃত, বিশ্বস্ত ও পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্রেপট্‌কিনের নাম সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ ছিল। জার্ম্মেন পণ্ডিত ফ্রিটজ বেরল-ঝিমার (Fritz Berol Zheimer) বার্লিনের লিগাল ও ইকনমিক ফিলসফিক্যাল ইণ্টারনেশনাল সোসাইটীর সভাপতি। ইনি "জগতের আইন সম্বন্ধীয় দর্শন শাস্ত্র (The world's degal

philosophies) নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইনি এই গ্রন্থে ক্রেপট্‌কিনের অভিমতাদির উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রেপট্‌কিনের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম—La Conquet du pain। এই গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত। ইহাতে লিখিত আছে—প্রকৃতির গতির নিকটে মানুষ দুর্ব্বল। এই জন্য সঙ্ঘ ভিন্ন মানুষের আত্মোন্নতি সাধণের উপায় নাই—একজন দ্বারা যাহা সম্পন্ন না হয়, একটা সঙ্ঘ দ্বারা তাহা হইতে পারে। গ্রেভ, ম্যাকে প্রভৃতি এনার্কিষ্ট-তত্ত্ব-লেখকগণেরও এই অভিপ্রায়। ইহারা সকলেই সমাজে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এনার্কিষ্ট নিজের স্বাধীনতা যেমন মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন, অপরের স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তাঁহারা সেইরূপ সম্মানও সমাদরের ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন। ক্রেপট্‌কিন রাজত্ব-প্রথার ঘোরবিদ্বেষী অথচ ইনি স্বয়ং একজন সম্ভ্রান্ত রাসিয়ান্ রাজকুমার। আইনতঃ ইনিই রাসিয়ার রাজসিংহাসন লাভের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইনি রাজশক্তির অপব্যবহার দেখিয়া রাজত্বপদটাকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইনি ইহার গ্রন্থে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—রাজত্ব কেবল সঙ্ঘবদ্ধ পাশব বলের দুষ্টভাণ্ডারমাত্র—হিংসন ও প্রজা পীড়নই উহার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম—ডাকাতি ইহাদের সর্ব্বসম্মত অধিকার (Privilege)। একের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া অপরের উপকার করা—পরার্থে স্বকীয় স্বার্থ সাধন করা—এই রূপেই ষ্টেটগুলি চলিয়া আসিতেছে।" রাজাদের উপরে ক্রেপট্‌কিনের কিরূপ অভিপ্রায় ছিল, এইকথাতেই তাহা বুঝা যায়।

সুপণ্ডিত এম, এলেসি রিক্লাসও (M. Elisee Reclus) এই সময়ে জনসমাজে বিখ্যাত ছিলেন। এনার্কিষ্ট কমিউনিষ্টগণের মধ্যে তিনি বিদ্যাবুদ্ধি কর্ম্মনিষ্ঠায় ও প্রতিভায় প্রচুরপরিমাণে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ক্রেপট্‌কিন তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ের পরামর্শ করিতেন, এমন কি

ক্রেপট্‌কিনের এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির ভূমিকা রিক্লাসেরই লিখিত। এই ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—জড়ীয় প্রকৃতিতে আমরা যে সকল শক্তি দেখিতে পাই, সেই সকল শক্তি দ্বারা মানব সমাজের হিতকর কার্য্য সাধন করিয়া লইতে হইবে। ক্ষুধিতের অন্নসংস্থান, গৃহহীনের গৃহনির্ম্মাণ এবং জন-সমাজের সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গ্রেভ (Grave) তদীয় La Societe Future (ভবিষ্যৎ মানব সমাজ) গ্রন্থেও এই কথাই বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—পার্থিব দ্রব্য-জাত হইতেই আমাদের অভাব পরিপূরণ করিতে হইবে। পৃথিবীর সকল বস্তুকেই আমাদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সকল দেশেই ভূমির শুষ্কতা দোষে বহু পরিমিত ভূমি অনুর্ব্বর অবস্থায় পতিত রহিয়াছে, সেই সকল জমির উর্ব্বরতা সাধন করিলেই দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। অপর পক্ষে, নদীগুলি কেবল যে অপরিমিত জলরাশিই সমুদ্র গর্ভে ঢালিয়াদিতেছে তাহা নহে—উহার সঙ্গে উর্ব্বরত্বজনক বহুল পলিমাটি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ। উহার কুফলে আমরা এক দিকে যেমন প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি হারাইতেছি, অপর দিকে ঐসকল পলিমাটি দ্বারা নদীর গর্ভ ভরিয়া উঠিতেছে, তাহাতে নৌকাদি চলাচলের ব্যাঘাত হইতেছে। এইরূপে জগতের সহস্র সহস্র শক্তি নীরবে নীরবে অপব্যয়িত হইতেছে, সুধু অপব্যয় নয়—তদ্দ্বারা মানব সমাজেরও অনিষ্ট সাধিত হইতেছে,—এই সকল শক্তি দ্বারা সমাজের হিত সাধন করিয়া লইতে হইবে।" ক্রেপট্‌কিন্ এইরূপ বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কেবল যে রাজার রাজ-সিংহাসন চূড়মার করিয়া দিয়া অরাজকতার সৃষ্টি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা নহে; সমাজের হিতসাধনের জন্য তিনি বহুল চিন্তা করিতেন। তিনি কমিউনিষ্টিক্ এনার্কিষ্ট ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের

সুশিক্ষিত লোকেরা সমাজের হিতসাধনের জন্যই উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। দুঃখ-দারিদ্র্য-অত্যাচার-উৎপীড়ন ও দাসত্ব প্রভৃতি হইতে মানবসমাজের উদ্ধার-সাধনই ইহাদের জীবন-ব্রত। ১৮৪৮ সালে প্যারিস কমিউন প্রথমতঃ এই সকল কথার সূত্রপাত করেন। তাহারও অনেক পূর্ব্বে (১৭৬০-১৮২৫) সেণ্ট সাইমন মানব সমাজের মঙ্গলকামনায় রাজবিধি-ব্যবস্থা, রাজ-শক্তি, রাজদণ্ড প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক প্রতিবেশবাসী-দের বিশুদ্ধ পরস্পরপ্রীতি সৌজন্য ও সৎস্বভাবনিষ্ঠ ন্যায়শীলতার উপর আদর্শ-সমাজ-গঠনের কল্পনা করেন। শ্রমজীবীও কৃষকগণের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন দেখিয়া এবং নানাকারণে তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়—এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সেণ্টসাইমন রাজ শাসনের দোষ প্রদর্শন করেন। তিনি আইন-কানুনের কঠোরতা ও রাজশাসন উচ্ছেদ করিয়া সমাজ সংগঠনের (association organised withont lcgal or governmental Corcion) উপদেশ করেন। কমিউনিষ্টিক্ এনার্কিষ্টগণ রাজশাসন চাহেন না, আইন কানুনের দ্বারা সমাজ শাসিত করাও তাঁহাদের নীতি নহে। তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্ট, আইন, নীতি, মূলধন প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া আদর্শ-সমিতিগঠন করিতে হইবে। মানব সমাজের আত্মনিষ্ঠ কল্যাণ-বাসনায় যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাজে প্রকৃত সুখশান্তি ও কল্যাণ সাধিত হয়। রাজ-শা৭নে মানুষের স্বাভাবিক আত্মনিষ্ঠ পরস্পরের কল্যাণ কামনা কলুষিত হইয়া যায়।*

---

* With the abolition of Government, law and capital, men would regain their natural iunate good which the State has currupted.

ক্রেপটকিন এইরূপ অভিপ্রায় নিজ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তদনুসারে কার্য্য করিতেন এবং জনসাধারণকেও এই নীতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। পিটার ক্রেপটকিন সুবিখ্যাত রুসরাজ বংশ-সম্ভূত; তাঁহার ভূসম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল, জীবনের প্রথম ভাগে রুস-সম্রাটের পত্নীর দরবারে অতীব সম্মানসূচক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মনে করিলে রুসরাজ-সিংহাসনেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন; কেন না, সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার জার্ম্মাণ রাজ-বংশেজাত; বিশেষতঃ তিনি লোকেরও অপ্রিয় ছিলেন—এই অবস্থায় সর্ব্বজনপ্রিয় পিটার ক্রেপটকিন চেষ্টা করিলে রুসরাজ্যে রাজপুরুষদের ভোগবিলাসে, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া জগতের দৈন্যদুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়িত, রাজশাসনে নিগৃহীত নরনারীগণের দুঃখ দূর করার জন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিত-ব্রতে নিস্কাম সন্ন্যাসী হইলেন, রাজদ্রোহি-জীবনের অশেষ যাতনা মাথায় তুলিয়া লইলেন, কঠোর কারাবাস-দুঃখ অবলীলায় স্বীকার করিলেন, অনাহারে অনিদ্রায় দিবানিশি দেশের হিত-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন—দুঃস্থ দুর্গত দরিদ্র উৎপীড়িত জনগণের সেবায় আত্মজীবন নিবেদন করিয়া দিলেন। তাঁহার কার্য্য সর্ব্বানুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ত্যাগ-শীলতা মানুষ মাত্রেরই শ্রদ্ধাকর্ষিণী।

২। সোফিয়া—পেরোভস্কিয়া।

সুচরিতা ব্রজবালা,—এখন তোমার নিকট একটি আদর্শ রুস রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া জানাইতেছি। রুস-রাষ্ট্রবিপ্লবে এই যুবতী যে অসাধারণ অলৌকিক কার্য্য-শীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যপূর্ব্ব বা নিরতিশয় অদ্ভুত না হইলেও, নরনারীমাত্রেরই চিত্ত-চমৎকার-কারক। সরলতা, কোমলতা ও পবিত্রতার সহিত অসাধারণ ধীশক্তি ও বীরত্ব-ভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ,—লোক-চরিত্রকে নরনারীমাত্রেরই যে কিরূপ আন্তরিক গৌরবের বস্তু করিয়া তোলে, সোফিয়ার চরিত্রে তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি প্রতিনিয়ত যাঁহাদের চরিত্র চিন্তা কর, সেই নিত্য মধুময়ী প্রেম-রসময়ী গোপীচরিত্রের বিন্দুমাত্রও এই চরিত্রে দেখিতে পাইবে না—কিন্তু নিষ্ঠুর রাজশক্তির লৌহ-শাসনে নিস্পিষ্ট উৎপীড়িত অত্যাচারিত নরনারীগণের পরিত্রাণার্থ—তোমাদের ন্যায় একটি রমণী কেবল কর্ম্ম-দক্ষতা, নির্ভীকতা, ত্যাগস্বীভার, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে বিচারদক্ষতা, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ব্রহ্মচর্য্য, সৎসাহস, সুধীরতা, সমুচ্চ স্বদেশ প্রীতি, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা এবং জননায়কতা প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া অবশেষে প্রফুল্লমুখে নিষ্ঠুর রাজদণ্ডে কিরূপ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই চরিত্র-পাঠে তুমি নিশ্চয়ই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইবে। জগতের নরনারীর চরিত্র গৌরব ও জীবনের মহত্ত্ব বিবিধ রূপে প্রকাশ পায়। শ্রীভগবানের গুণ অনন্ত। তাঁহার সৃষ্ট জীবসমূহেরও চরিত্র অনন্ত। চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রতিভার বিকাশ ও কার্য্যে দক্ষতা,—সর্ব্বত্রই গৌরবভাজন। সোফিয়ার চরিত্রে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ বা ভগবৎ-অনুরাগের বিকাশ না হইলেও শ্রীভগবানের সৃষ্ট জীবদলের অনুরাগময়ী সেবা এবং তাঁহাদের ঐহিক যাতনা-প্রশমনের প্রচেষ্টা,—সোফিয়ার জীবনে পূর্ণমাত্রাতেই দেখিতে

পাইবে ; তোমার প্রিয়তম ভুবনমোহন বংশীবদন শ্রীগোবিন্দের অনন্ত সদ্গুণের কথাই তোমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে।

সোফিয়া পেরোভস্কিয়া,—সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু যে সৌন্দর্য্য দেখা মাত্রই চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়, সোফিয়া সেরূপ সুন্দরী ছিলেন না। কিন্তু যতই তাঁহার চরিত্রের আলোক লইয়া তাঁহাকে দেখা যায়, ততই তাঁহার সৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষি হইয়া উঠে। তাঁহার ললাট প্রসরতর;—সুনীল নয়ন-যুগল প্রতিভার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—দেখিলেই মনে হইত যেন প্রকৃতির গূঢ়রহস্যোদ্ভেদ করার জন্য উহা নিরন্তরই প্রকৃতির অন্তস্তলদর্শী; নাসাটী তিলফুলের ন্যায় সুন্দর, ওষ্ঠযুগল পক্কবিম্বের ন্যায় শোণিম ও মসৃণ, ঈষৎ হাসিতেই কুন্দকুসুমের রজত-শুভ্র দুপাঁতি দাঁত, সেই দন্তরুচি-কৌমুদি" প্রকাশে সমগ্র মুখমণ্ডলকে সহসা সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিত। স্বভাবতঃ ইঁহার বদন-মণ্ডলের এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি একবার সে মুখখানি দেখিত, উহাতে তাহার কিছুতেই তৃপ্তি হইত না। চাঁদের ন্যায় গোলাকার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই প্রতিভার জ্যোতি খেলিয়া বেড়াইত। যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন তাঁহার উঠন্ত যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে এমনই একটা সারল্যের ভাব বিদ্যমান ছিল, দেখিলেই মনে হইত সরলতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাতে বিরাজমানা। তাঁহার আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বালিকার হাবভাব, বালিকার সারল্য, ও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল; কিন্তু দেখিলে আঠার বৎসরের বেশী বলিয়া মনে হইত না। সোফিয়ার আকার মাঝামাছি রকমের ছিল, দেহ খুব হৃষ্টপুষ্ট ছিল না, কিন্তু উহাতে একটী অলৌকিক লাবণ্যজ্যোতি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন।

তাঁহাকে দেখিলেই যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হইত—তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা মুখে চোখে ও দেহে ফুটিয়া উঠিত। কণ্ঠের স্বর সুমধুর ও সুস্পষ্ট দৃঢ়তার ভাবব্যঞ্জক ছিল, তাঁহার কথায় কখন কেহ উদ্বিগ্ন হইত না। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সুমধুর আলাপে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন—সকলেই তাঁহাকে আপন জন বলিয়া মনে করিত। তিনি হাসি ছাড়া কথা বলিতেন না; হাসি যেন সর্ব্বদাই সেই মুখ খানিতে লাগিয়া থাকিত। এমন প্রাণভরা সরলতা মাখা অট্টহাসি অল্পবয়স্কা সরলস্বভাবা বালিকার পক্ষেই শোভা পায়। সোফিয়া পূর্ণ যৌবনেও অল্পবয়স্কা বালিকার সরলতায় হাসিয়া খেলিয়া গভীর চিন্তাশীল-রাজমন্ত্রীর ন্যায় এবং কঠোর দুশ্চর তপস্যাশীল মহাত্যাগী রাজনীতিক সন্ন্যাসীর ন্যায় গুরুতর জটিল কর্ম্ম-মীমাংসার সমাধান করিতেন।

পোষাক-পরিচ্ছদ-ব্যবহার-নির্ব্বাচনে সোফিয়ার কিছু মাত্র বিচার ছিল না। সাদাসিধে ভাবে বসনাদি পরিধান করাই তিনি ভাল বাসিতেন। কিন্তু দেহ গেহ ও পরিধেয় বসন সততই পরিষ্কৃত রাখার প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্ট কতকটা সুইস্ মেয়েদের মতই ছিল। সুইজারলণ্ডের মেয়েরা পরিষ্কৃত থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করেন—কিন্তু রুস মেয়েদের স্বভাব তেমন নয়।

ইনি শিশুদিগকে খুব ভাল বাসিতেন—কিছুদিন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগীর সেবা-কার্য্য ইহার খুবই প্রিয় ছিল। পরিচিত লোকের মধ্যে কাহারও অসুখ হইলে সোফিয়া শুনামাত্র সেখানে যাইয়া সেবায় নিযুক্ত হইতেন, প্রীতিভরে ধীরভাবে প্রফুল্ল মুখে সেবা করিতেন, কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না।

সোফিয়ার হৃদয় কুসুম-সুকুমার ছিল, কুসুমের ন্যায়ই তাঁহার এই কুসুম কোমল দেহে ও কুসুম কোমল হৃদয়ে লৌহের ন্যায় দৃঢ়তা ও সিংহের

ন্যায় ভীষণ পরাক্রম লুক্কায়িত থাকিত, প্রয়োজন হইলেই তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত—ইনি টেররিষ্ট সম্প্রদায়ের অতি কর্ম্মঠ সদস্যা ছিলেন।

১৮৮১ সালের মার্চ্চ মাসে রুস-সম্রাটের উপাংশুহত্যার জন্য যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, সেই ভীষণ ব্যাপারের পরিচালন-মন্ত্রণা ও পরিচালনার ভার সোফিয়ার উপরেই সমর্পিত হয়। কোন্ স্থানে কি প্রকারে সম্রাটকে ব্যাহত করিতে হইবে, কোথায় কোথায় কিরূপ ভাবে গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকদিগকে সংস্থিত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে সকল মন্ত্রণার ভারই সোফিয়া সুন্দরী নিজে গ্রহণ করেন। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই এই সঙ্কল্প সাধনের জন্য তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্থানের নক্সা ও কার্য্য-সাধনের প্রণালী ও প্রক্রিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ছিলেন। সম্রাটের গতাগতি-নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত লোক স্থানে স্থানে মোতায়েন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত সময়ে তাহার নিকটে সংবাদ দেওয়ার জন্য লোকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীদিগকে আপন আপন কার্য্য করার পরামর্শ দিয়া স্বয়ং ঘটনাস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ধীর স্থির প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

পাঠকগণ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে সোফিয়ার কুসুম-সুকুমার কোমল দেহে কি দানবীয় বল লুক্কায়িত ছিল। বিধাতা যেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী যুবতীর মস্তিষ্কটাকে ভীষণ কুটমন্ত্রণাসমূহের নিভৃত নীরব কেলিকুঞ্জরূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সোফিয়ার ইচ্ছাশক্তি লৌহের ন্যায় দৃঢ় ছিল। তিনি যাহা করিব বলিয়া মনে করিতেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই সম্পন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। উদ্যমশীলতা, ইচ্ছার দৃঢ়তা, ও কর্ম্ম-সম্পাদন-শক্তি পূর্ণমাত্রাতেই তাঁহাতে বিরাজমান ছিল। ইনিও ক্রেপট্কিনের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিটার দি গ্রেট সুদীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত রাসিয়ার সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এম্প্রেস এলিজাবেথ এই সম্রাটের কন্যা। রাস্নমভোস্কি বংশের এক সুবিখ্যাত ব্যক্তির সহিত এই এলিজাবেথের বিবাহ হয়। রোভেস্কি বংশ,—রাস্নমোভেস্কি বংশের ছোট শাখা। এই বংশে সোফিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ রাসিয়ার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। ইহার পিতা সেণ্ট্ পিটাস্ বর্গের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ইহার কাকার নাম কাউণ্ট প্রেরাভ্স্কি। ইনি অতি প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন এবং মধ্য এসিয়ার অনেকাংশ যুদ্ধে জয় করিয়া সম্রাট্ নিকোলাস্কে প্রদান করেন।

১৭৫৪ সালে সোফিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার তরুণ যৌবন দুঃখে দুঃখে অতিবাহিত হয়। স্ত্রীজন-সুলভ ইন্দ্রিয়-বিলাস-বাসনা কখনই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার পিতার হৃদয়ে স্নেহ বড় কম ছিল। তাঁহার মাতাও পতির নিকট তেমন আদর ও প্রীতি পাইতেন না।

সোফিয়া যখন মাতার নিকট থাকিতেন, তখন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে দীন-দরিদ্র-প্রপীড়িত ও উৎপীড়িতগণের প্রতি স্নেহ দয়া ও প্রীতির ভাব অঙ্কুরিত হইয়া ছিল; তখন হইতেই অত্যাচারী উৎপীড়ক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্বেষ-বীজ ক্রমেই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত, বিকসিত ও বিবর্দ্ধিত হইতেছিল। বাল্য হইতেই সোফিয়ার হৃদয়ে বিদ্যাশিক্ষার বাসনা বিশেষ রূপে বলবতী হইয়া উঠিয়া ছিল। যখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর, তখন রাসিয়ার স্ত্রীলোক দিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা হয়। তখন সোফিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা শুনিয়া নিরতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাসিয়ার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সমুন্নত ছিল না। এমন কি তাহাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হইত না। সোফিয়া এই নিগ্রহ সহ্য করা সঙ্গত বোধ করিলেন

না। তিনি বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন। কিয়দ্দিবস কতিপয় বন্ধুর গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পলায়নে তাঁহার পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। পুলিসের সাহায্যে কন্যাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সবিশেষ ফলবতী হইল না। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যার আশা ত্যাগ করিলেন। কন্যা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষায় মন দিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা গোপনে গোপনে তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ পাঠাইতেন। তিনি সার্ণিসেভেস্কি এবং ডব্রোলীনবভ্—এই দুই শিক্ষকের নিকট নব্য জনতন্ত্রতা ও সোসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে প্রচুর শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। তিনি এই যে দুইজন শিক্ষকের অধীনতায় থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে ছিলেন, তৎসময়ে সমগ্র ইউরোপে এই উভয় ব্যক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সোফিয়া শিক্ষকদের নিকট যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেন, সেই সকল জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন,—অর্থাৎ সমাজসংস্কার ও রাজকীয় শাসন-সংস্কার প্রভৃতি পুরুষোচিত কার্য্যে আগ্রহসহকারে চিত্ত নিয়োগ করিলেন। এই সময় রাসিয়ায় আরও অনেক মহিলা এইরূপ নবভাবে নবশিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাসিয়ায় গুপ্তসমিতি-স্থাপন অনেক দিন হইতেই প্রয়োজনীয় হইয়াছিল; কেননা, দেশের হিতসাধনে রাজার অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে হইলে গুপ্তসমিতির সংস্থাপন ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত না। এই কারণে রাসিয়ার স্থানে স্থানে অনেক গুলি গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সোফিয়া তাঁহার অভিমত কার্য্য করার জন্য এই সকল সমিতিতে যাতায়াত করিতেন, তাঁহার চারিত্রিক বলের দৃঢ় সঙ্কল্পতায় এবং কর্ম্ম-কুশলতায় অনেক নরনারী

উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। সমিতিস্থ যুবক-যুবতীগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং অবিচারে অতর্কিত ভাবে তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিত। সোফিয়ার হৃদয়ে একদিকে যেমন দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ কোমলতা, বিরাজ করিত,—অপরদিকে কর্ত্তব্যের কঠোরতা, কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ়তা, আলস্যে ঘৃণা প্রভৃতি সৎগুণে তাঁহার অনুচর সহচরগণ তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। সোফিয়া চারি বৎসর অতি সুশৃঙ্খল ভাবে কোন কোন গুপ্তসমিতির কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সমিতির সদস্যগণ সোফিয়ার চরিত্রে মহাবৈরাগ্য, কঠোরতা, ত্যগস্বীকার, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সোফিয়াকে অবতারের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। দার্শনিক পণ্ডিতের ন্যায় সোফিয়ার মাস্তিষ্ক শক্তি অতি প্রখরা ছিল। তিনি সবিশেষ বিচার করিয়া কার্য্যের সঙ্কল্প স্থির করিতেন। তাঁহার বিচারে যে সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইত, তাহা খণ্ডন করিতে কাহারও সামর্থ্য হইত না। তিনি যে কার্য্য করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, তাঁহার সেই সঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত হইত না। তিনি তাঁহার অনুচর সহচরগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব অভিমতের তর্কযুক্তি উপস্থাপিত করিতে আদেশ করিতেন; তাহারাও তদনুসারে প্রস্তুত হইয়া আসিত কিন্তু সোফিয়ার যুক্তির নিকটে তাহাদের যুক্তি টিকিত না। তাহারা সরল ভাবে ও মুক্তকণ্ঠে সোফিয়ার যুক্তি স্বীকার করিয়া লইত।

মানুষ কখন কখন স্বীয় উৎসাহে ও উদ্যমে যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে তাহার আপন কথা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। সোফিয়ার সেরূপ স্বভাব ছিল না। তিনি সত্যেরই সম্মান করিতেন। তাঁহার উক্তিতে গভীর যুক্তিতর্কস্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিত; যদি কেহ তাহার উপরে বিপরীত প্রবলতর তর্কযুক্তি দ্বারা অন্য কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ

করিত,—সোফিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের প্রকল্পিত কার্য্য-প্রণালী ত্যাগ করিয়া অপরের প্রদর্শিত সুসিদ্ধান্তিত প্রণালীতেই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতেন। প্রবলতর তর্কযুক্তির নিকটে তাঁহার নিজের উদ্যম ও উৎসাহ খর্ব্ব হইয়া পড়িত; ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষুব্ধ বা অপ্রতিভ হইতেন না। তিনি অতিরঞ্জন করিয়া কখন কোন কথা বলিতেন না, এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করিতেন না। বিনা কাজে সময় নষ্ট করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশজনক বোধ হইত। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া কেহই অলসভাবে এক মুহূর্ত্ত সময়ও অতিবাহিত করিতে পারিতেন না। সোফিয়ার জীবন কর্ম্ম-শক্তির সবিশেষ উদাহরণ।

সোফিয়ার জীবন যে গুরুতর কার্য্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কখন শান্তিতে থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই রাজদ্রোহ-রূপ আগ্নেয় গিরির তটের উপর দিয়া বিচরণ করিতেন। রাজশক্তির অত্যাচার, দুর্ব্বলের উপর সবলের পীড়ন প্রভৃতি অন্যায় অসঙ্গত কার্য্যের বিবরণ,—তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই তিনি স্বকীয় দলবলে তাহার প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইতেন। ইহাতে রাজপুরুষগণের কোপ-দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব হইল।

শ্রীমতী সোফিয়ার পক্ষে অতিক্রূত সেই বিপদের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের অপরাধে পুলিশ, ১৮৭৩ সালের ২৫শে নভেম্বর তাঁহাকে গ্রেফতার করিল। তাঁহাব সঙ্গে আরও কতিপয় শ্রমজীবী অভিযুক্ত ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ এই যে—তিনি অনেকগুলি লোক লইয়া আলেকজাণ্ডার-নেভেস্কি জেলায় সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইল। এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া বিচার চলিল কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

তথাপি তাঁহাকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হইল না। তাঁহার পিতার নিকট হইতে জামিন লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে ক্রিমিয়ায় তাঁহাদের পারিবারিক বাড়ীতে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। তাঁহার এই নির্ব্বাসনে গুপ্তসমিতির কার্য্যে অনেকটা বিশৃঙ্খলা হইল। তিন বৎসরকাল সোফিয়া ক্রিমিয়ায় নির্ব্বাসিতা ছিলেন। এই সময়ে পুলিশ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি নজর রাখিত। সুতরাং তিনি তাঁহার অভিমত কোন কাজই করিতে পারিতেন না। সোফিয়া চেষ্টা করিলে. ক্রিমিয়া হইতে পলাইতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার সহচর অনুচর আসামীগণের নিকট হইতে জামীন লইয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। যদি তিনি পলাইতেন তবে তাহাদিগকে বিচারে আবার নিগৃহীত ও কারারুদ্ধ হইতে হইত।

ইহারই অব্যবহিত পরে ১৮৭৭ সালে এক অতিবড় ষড়্‌যন্ত্রের মোকদ্দমার তারিখ পড়িল! এই মোকদ্দমায় ১৯৩ জন আসামী অভিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই সায়েকভজি (Ciaikovzi) সার্কলের সদস্য ছিল। সোফিয়াও তাহাদের মধ্যে একজন।

এই মোকদ্দমায় সোফিয়ার চরিত্রের অপর একটি সমুজ্জল সদ্‌গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৯৩ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয় কিন্তু বিচার অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। এই শ্রেণীর মোকদ্দমায় বিচারের পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষ অভিযুক্তদিগের দণ্ড বিধান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিতেন। এই মোকদ্দমায় বিচারার্থ প্রথমতঃ কেবল এক সোফিয়াকেই উপস্থাপিত করা হয়। সোফিয়া জামিনে মুক্ত ছিলেন। বিচারকগণের মনে একটা অভিসন্ধি ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন সোফিয়াই ষড়্‌যন্ত্রকারীদের নেত্রী। সোফিয়াকে কায়দায় আনিতে পারিলে অন্যান্য ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা খুব সহজেই হইতে পারিবে।

এই অভিসন্ধিতে ইঁহারা প্রথমতঃ সোফিয়াকেই বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিলেন। সোফিয়া অতিবুদ্ধিমতী ও সুচতুরা। তিনি দেখিলেন তাঁহার অনুচর সহচরগণ এই মোকদ্দমায় কি জবাব দিবেন, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাহাদের অভিমত ছাড়া নিজে কোন জবাব দেওয়া অসঙ্গত মনে করিলেন; বিশেষতঃ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ রখিয়া বিচারকেরা যদি ইঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন, সে মুক্তি একেবারেই ইনি স্বীকার করিতে পারিবেন না—এইরূপ চিন্তা করিয়া সোফিয়া কোনও জবাব দিলেন না। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গেল। বিচারকগণ সোফিয়াকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু শাসনকর্ত্তৃপক্ষ তখনই তাঁহাকে রাসিয়ার উত্তর প্রদেশে নির্ব্বাসিত (interned) করিলেন। এই নীতি এদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনীতিক সন্দিগ্ধ চরিত্র ব্যক্তিরা বিচারে মুক্তি পাইলেও শাসনকর্ত্তৃপক্ষীয়দের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। হাজত হইতে বাহির হওয়ামাত্রই পুলিশেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক ইহাদিগকে নির্ব্বাসিত করে, এবং উহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখে।

সোফিয়া নির্ব্বাসিতা হইয়া সর্ব্বদাই পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি রুসকর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণে এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন, যে ইহাদের প্রতি কোনও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। ছলে বলে কলে কৌশলে,—যেরূপেই হউক পলায়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য—কিয়দ্দিবস তিনি দিবানিশি কেবল এই ভাবনাই করিতেন। অচিরেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজের বুদ্ধি-চতুরতায় তিনি নির্ব্বাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সেণ্টপিটার্সবার্গ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখখানি হাস্যমাখা ও প্রফুল্ল—যেন তাঁহার সম্বন্ধে কোন আপদই ঘটে নাই। ফলতঃ তিনি কি

প্রকারে পলায়ন করিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহ কিছুই জানিতে পার নাই। তিনি সকলের নিকটেই আমোদ করিয়া পলায়নের কথা বলিতেন। তাঁহার পলায়নের বিবরণ শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইত।

১৮৭৮ সালে রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপারে আবার তিনি যোগ দিলেন। ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ এই চারি বৎসরের মধ্যে রাসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপারে প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। লোকের মতিগতি, দেশের অবস্থা, রাজ-পুরুষ দিগের শাসন পরিচালন প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা ভীষণ পরি-বর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। রাজদ্রোহীরা দেখিল—উগ্রচণ্ডা-শক্তি লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত না হইলে এই নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় পাশবঅত্যাচার-বিদলনের আর দ্বিতীয় উপাই নাই। বিদ্রোহীদল তখন সিংহ-বিক্রমে ভীমভৈরব হুহু-ঙ্কারে কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল,—মুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা যেন দলবলসহ রাসিয়ার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! রাজদ্রোহীদল রাজপুরুষদিগকে প্রকাশ্যে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল—এই বিভীষিকা কেবল গুপ্ত-মন্ত্রণায় নয়—কেবল তর্জ্জনে গর্জ্জনে নয়—বাস্তবিক কার্য্যেই পরিণত হইল। রুসগভর্ণমেণ্টকে ইহারা বুঝাইলেন যে তাঁহাদিগকে আর অধিক দিন নিরীহ দুঃস্থ দুর্গত প্রজার উপরে পৈশাচিক অত্যাচার করিতে হইবে না। সেরূপ করিলে কোনরূপে তাঁহারা আত্মকল্যাণের আশা রাখিতে পারিবেন না। রাসিয়ায় তখন প্রকৃতই ভীষণ বিভীষিকার দিন (Terrorism) উপস্থিত হইল।

সোফিয়া কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। তিনি নবউদ্যমে উহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। গবর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে এই ভীষণ বিভীষিকা উৎপাদন ভিন্ন দেশহিতৈ-ষীদের পক্ষে জনসাধারণের দুঃখ-নিবারণের আর অন্য উপায় ছিল না। সোফিয়া যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই কার্য্যেরই চরম উন্নতি

সাধন করিতেন—ইহাই তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল। এই গুরুতর ব্যাপারেও তাঁহার প্রতিভা আরও অধিকতর সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইল।

ইতঃপূর্ব্বে সার্কেল-আন্দোলন সম্প্রদায়ে তিনি প্রচুর সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। টেররিষ্টগণও তাঁহাকে পাইয়া নিজদিগকে নব বলে বলীয়ান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহাকেই তাঁহারা নেত্রীর গৌরবান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সোফিয়া—শক্তিরই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি বহু লোকের কার্য্য এক হাতে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মশীল অন্যত্র অতি বিরল। অবসাদ বা ক্লান্তি কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। দানব-যুদ্ধে ভগবতী দেবীর ন্যায় নিরন্তর দুর্দ্দমনীয় প্রোত্তমে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইতেন। তরুণ যুবক-গণের হৃদয়ে হৃদয়ে এই মহাশক্তি ঐন্দ্রজালিক প্রভাববিস্তার এবং অদম্য উত্তমের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। দলে দলে তরুণ যুবক তাঁহার আদেশে অবিচারে অতর্কিত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। তিনি উহাদিগকে কর্ত্তব্যতার নিগূঢ়লক্ষ্য বুঝাইয়া দিলেন। কর্ত্তব্যতার সমক্ষে মানব জীবনের অন্যান্য কার্য্য যে কিছুই নয়—এমন কি প্রাণপর্য্যন্তও যে কিছুই নয়—ইহা তাঁহারা বিসদ রূপেই বুঝিয়া লইল।

সোফিয়া কেবল নবযুবক-সঙ্ঘেই তাঁহার উদ্দীপনা বা উত্তেজনার কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখিলেন না; অবসর পাইলেই সুবিধা বুঝিয়া তিনি কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রবেশ করিতেন—ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। ইহারা তাঁহার সরলতা ও ব্যগ্রতা দেখিয়া তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি শ্রমজীবীদিগকে লইয়া একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন; উহার নাম—রেবোসিয়াইয়ে-ড্রুজিনা (Rebociaia drugina) ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ—এই :— "Working men's Terrorist Society" অর্থাৎ শ্রমজীবীদের ভীতি-

প্রদর্শিকা সমিতি। টমথী মাইকেইলফ্ এবং রিসাকফ (Tomothy Micailoff and Rissakoff) এই সমিতির সদস্য ছিলেন। সমিতি-সংগঠনে তাঁহার অসীম দক্ষতা ছিল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিময় কুশাগ্র-সূক্ষ্মবুদ্ধি সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিত; কোন্ প্রকার প্রণালী অবলম্বনে সাফল্য লাভ হইতে পারে, তাহা তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বুঝিয়া লইতে পারিতেন। কোনও ভীষণ বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি বিপুল পরিশ্রমে, সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা ও আত্ম-প্রভুত্ব দ্বারা (Self Command) কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রাক্প্রণালী গঠন করিয়া লইতেন। ইহার পরিণাম এই হইত যে, প্রায়শঃই তাঁহার কার্য্য বিফল হইত না। তিনি মহাযোগীর মত নিভৃত নীরবে কর্ত্তব্যকর্ম্মের চিন্তা করিতেন, কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সহসা কাহারও নিকটে কোন কথা প্রকাশ করিতেন না, কেননা প্রয়োজনীয় কার্য্য অন্যের লক্ষিত হইলে তাহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল কার্য্যে মন্ত্র-গুপ্তি এক প্রধানতম নীতি। সোফিয়া মনে মনে যাহা চিন্তা করিতেন, কেহ তাহা জানিতে পারিত না; তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী বন্ধুগণও উহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেন না। মাসের পর মাস চলিয়া যাইত, তিনি আপন মনে কত চিন্তা করিতেন, গোপনে গোপনে কত কার্য্য করিতেন, তাহার এক গৃহ-স্থিত ব্যক্তিরাও তাহার কোন সন্ধান পাইত না। স্ত্রীলোকদের স্বভাব, স্বভাবতই অতি তরল কিন্তু সোফিয়া ললনা-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও সুতীক্ষ্ণ সুসংযত সমরমন্ত্রী ও রাজমন্ত্রীর বহুল সদ্গুণ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজদ্রোহী জনগণের সহিত সুদীর্ঘকাল বসবাস করায়—তাঁহার আরও একটা মহতী শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। কোন্ লোক দ্বারা কোন্ কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে, তাহা তিনি সহজেই বুঝিয়া

লইতে পারিতেন। তিনি ছল-কপটতা অবলম্বনে কোন কার্য্য করিতেন না, তাহাতে তাঁহার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি লোকের উপরে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন, জনসাধারণ যে তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিত, তাহার একমাত্র কারণ—তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্ম-নির্ভরতা এবং নিরন্তর নিরলস কর্ম্মপ্রিয়তা। লোক-প্রবর্ত্তনার কৌশলে তাঁহার প্রচুর দক্ষতা ছিল। তিনি কখনও কাহাকে কঠোর কথা বলিতেন না—তিনি অতিশয় মধুর ভাবে, মধুর ভাষায় বিভিন্ন স্বভাবের লোকদিগকে আয়ত্তে আনিতেন। তাহারা প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বাক্যে বশীভূত হইত। চরিত্রের এই বিশিষ্টতা এক মহা সুকৃতির ফল। কেবল সাধনায় ইহা লভ্য নহে। ইহার উপরে তাঁহার নিজের চারিত্রিক প্রভাব অতীব উন্নত ছিল—তাঁহার চরিত্রে স্বার্থগন্ধ ছিল না, নীচতা ছিল না, জনহিতৈষণার প্রগাঢ় প্ররোচনায় তিনি সর্ব্বদাই সকল কার্য্যে ব্রতী হইতেন। তাঁহার বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র এবং নিষ্ঠা-ময়ী কর্ম্মানুরক্তি জনসাধারণের সমক্ষে সমুজ্জ্বল আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইত।

তাঁহার বুদ্ধি যেমন প্রখরা ছিল, ইচ্ছা-শক্তিও তেমনি শক্তিময়ী ও প্রগাঢ় ছিল। তিনি যে কার্য্য সাধনে ইচ্ছা করিতেন, কিছুতেই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচালিত করিতে পারিত না। রাসিয়ার তাৎকালিক অবস্থায় ষড়্‌যন্ত্রের জন্য অনবরত পরিশ্রম করিতে হইত। নারকীয় অনলের ন্যায় সে পরিশ্রমে দানবীয় শক্তিকেও ভস্মীভূত হইতে হইত, পদে পদেই অবসন্নতা আসিত, কিন্তু সোফিয়া কিছুতেই দমিত হইতেন না; অবসাদ—কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না, ক্লান্তি—কাহাকে বলে, তিনি তাহা বুঝিতেন না।

রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রকারীদের যে বিপুল শ্রম চিন্তা করিতে হয়—

ভারতবাসী রাজনীতিক নেতারা স্বপ্নেও সেরূপ শ্রম চিন্তা করিতে পারিবেন না। কুসুম-কোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়া, তকীয়ায় ঠেশ্ দিয়া, আলবোলার নলে ঠোঁঠ সংযোগ করিয়া তাম্রকুটের ধূম্র পান করিতে করিতে এবং আকাশ-কুসুমের তন্দ্রা দেখিতে দেখিতে কেহ কখনও দেশের দুরবস্থা দূর করিতে পারে না। রাসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর দানবীয় জীবন—পুরাণ-বর্ণিত দৈত্যজীবনের ন্যায় এক ভীষণ সৃষ্টি! ভারতের সে অবস্থাও নয়—তাহার প্রয়োজনও নাই। ভারতবর্ষ দেবতার দেশ—জ্ঞানের দেশ ও ভক্তির দেশ। দানবীয় বলে দানবীয় অত্যাচার-দলন এদেশের চিরন্তনী নীতি নহে। দেববলেই দানবীয় বল প্রদমিত করা—এই দেশের উপযুক্ত নীতি। যাঁহারা ইহার অন্যথা আচরণ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের জাতীয়তার (Indian Nationalism) প্রতিকূলে কার্য্য করিতেছেন—ইহাতে দৈব শক্তির সাহায্য-প্রাপ্তির আশা নাই—সাফল্যেরও আশা নাই—ইহাতে আমাদিগকে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া যাইবে।

যাহারা দানবীয় বলে দানবীয় অত্যাচার প্রদমন করে, তাহাদের কার্য্য-প্রণালী স্বতন্ত্র—দেহের গঠন স্বতন্ত্র—চিত্তের গঠনও স্বতন্ত্র। কেবল নাটকীয় ভীমসেনের ভৈরব গর্জ্জনে এবং তালপত্রের অসি-সঞ্চালনে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় না। যাঁহারা ভীষণ বিপ্লবের নারকীয় অনল প্রজ্জলিত করিয়া কার্য্য সাধন করিয়াছেন—তাঁহারাই সে সাধনার শ্রম-চিন্তার খবর দিতে পারেন। তাহাদের ইতিহাস—এক বিশাল আগ্নেয় গিরির ইতিহাস। ভূমির নীচে—গভীর গহ্বরে কিরূপে কোথায় তেজোরাশি সঞ্চিত হয়, পুঞ্জীভূত হয়, প্রধূমিত হয়,—পরে এক সুসময়ে বা কুসময়ে যেরূপে উহা সহসা বিস্ফূর্জ্জিত ও বিস্ফুটিত হইয়া সুদূর আকাশে তেজঃশিখা উদ্গিরণ করে, প্রতপ্ত ধাতব তরল দ্রব বিস্তার করিয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্র

এবং বহুজন-অধ্যুষিত জনপদগুলিকে যেমন সর্ব্বজন-প্রাণী সহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে—দানবীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের অবস্থাও ব্যবস্থা প্রায় তদ্রূপ।

রাষ্ট্রবিপ্লব-রাক্ষসী ইহার অনুচরগণের কেবল রক্ত-মাংস-ভক্ষণে আপন জীবন রক্ষা করে না—অস্থি মজ্জা এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত চিবাইয়া চিবাইয়া নিঃশেষিত করিয়া স্বীয় বল সঞ্চয় করে। যে সকল অনুচর তাহাতে ভীত হয়—তাহাদিগকে সে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করে, তুচ্ছ করিয়া দূরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া দেয়—এমনই উহার ভীষণ শাসন।*

সোফিয়া ইহার নিষ্ঠাময়ী সেবিকা ছিলেন। তিনি দধীচি মুনির ন্যায় ইহার চরণে নিজের দেহ মন প্রাণ এমন কি নিজের আত্মা পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমাগত এগার বর্ষ কাল ব্যাপিয়া সোফিয়া টেররিষ্টদিগের নেত্রী রূপে অশেষ যাতনা—বহুল বৈফল্য-ভোগ করিয়াছেন কিন্তু কখনও বিষণ্ণ বা হতাশ হন নাই। তিনি যতই পরাভব প্রাপ্ত হইতেন, ততই দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। এই দেশহিত-যজ্ঞের পবিত্র হোমানল কি প্রকারে নিরন্তর প্রজ্জ্বালিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি ভাল রূপেই জানিতেন। তিনি সাত্মিক ব্রাহ্মণের ন্যায় এই রাষ্ট্রবিপ্লব-যজ্ঞে দীক্ষিতা ছিলেন। তিনি উহা কেবল কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না—উহাতে তাঁহার হৃদয়নিহিত অনুরাগময়ী সেবা-নিষ্ঠা নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তিনি এই ব্যাপারের উন্নতিসাধন না করিয়াই স্থির থাকিতে পারিতেন না।

---

* Implacable God of the Revolution claims as a holocaust not merely the life and the blood of its followers—it could that it were so—but the very marrow of their benes and brain, their inmost soul ; or otherwise rejects them, discards them, disdainfully, pitilessly.

এই ভাবটা তাঁহার রক্তেমাংশে অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছিল। এই মহাযন্ত্রের প্রধানতম পুরোহিত সোফিয়া—স্বভাবতই সন্ন্যাসীর ন্যায় বৈরাগ্যে কাল যাপন করিতেন কিন্তু এই বৈরাগ্যের মহাশ্মশানে স্বদেশ-সেবার অনুরাগ গুপ্তভাবে নন্দন-কানন সৃষ্টি করিয়া রাখিত—তাঁহার দৃঢ়তার লৌহকপাট-রক্ষিত হৃদয়ের স্তরে স্তরে ললনা-চরিত-সুলভ কোমল করুণ স্নেহের স্পন্দন প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভূত হইত; প্রতি নিয়ত অতি-ভীষণ পুরুষোচিত বীর-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি নারীজনোচিত কোমলত্ব যথাযথ রক্ষা করিতেন।

সোফিয়া কেবল যে সঙ্ঘ-সংঘটকতার কার্য্যেই সুদক্ষা ছিলেন, তাহা নহে; প্রয়োজন হইলে নিজেই অন্যের দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অগ্রগামিনী হইতেন, বিপদ আপদের আশঙ্কা করিতেন না; যেখানে বেশী বিপদের আশঙ্কা, সেখানে অপর কাহাকেও প্রেরণ না করিয়া তিনি নিজেই উহার সম্মুখী হইতেন। ইহাতে তাঁহার চারিত্রিক আকর্ষণ আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া ছিল।

টেররিষ্ট আন্দোলনের প্রায় সকল প্রধান কার্য্যেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। তিনি যদি বলিতেন, "চল, অগ্রসর হও" কাহারও আর 'না' বলিবার ক্ষমতা থাকিত না। তাঁহার উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া সকলেই সে কার্য্যে যোগ দিত। বহু বিপদ অতর্কিত ভাবে তাঁহার উপরে সহসা চাপিয়া পড়িত। তিনি চিত্ত-সংযম, আত্ম-প্রভুত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণে এই সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও দৃঢ়সঙ্কল্পতার মহত্ব কোন ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইবার নহে। হার্টম্যান ও ভয়নারামস্কী ব্যাপারে তাঁহার এই সদ্‌গুণের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হার্টম্যান উদ্ধার ব্যাপারে আটজন পুরুষ ষড়যন্ত্র

ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইগরা প্রকৃত কার্য্য-সাধনের ভার সোফিয়ার স্কন্ধে চাপাইয়া ছিলেন। ইহাদের কার্য্য প্রণালীগুলির মধ্যে একটা অতি ভীষণ কার্য্য ছিল। সে কার্য্যটী এই যে, একখানি ঘরের মেঝের ভিতরে ইহারা নাইট্রো-গ্লিসিরিন-পুঞ্জ গোপনে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। যদি উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে এমন ধীরতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার সহিত উহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে যেন উহা বিস্ফুটিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায় এবং ধৃতকারী পুলিশেরাও যেন ঐ গৃহের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কার্য্যের ভার সোফিয়ার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, সোফিয়া নিজেই উৎসাহের সহিত এই বিপজ্জনক কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যেমন ভাবনা—সিদ্ধিও সেইরূপই হইল। এই ব্যাপারে সকলেই সোফিয়াকে দৈবী শক্তিসম্পন্না বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পুলিশেরাও ইঁহাকে সাক্ষাৎ রণচণ্ডী মহাশক্তি বলিয়া ভয় করিতেন।

১৮৮১ সালের মার্চ্চ মাসে রাসিয়ার টেররিষ্টগণ যে ভীষণ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাহা চিরদিনই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জলরূপে অঙ্কিত থাকিবে। সম্রাটের সেই উপাংশুবধ-সাধনের প্রচেষ্টার মধ্যেও সোফিয়া মহানায়িকা!—আদিতেও ইনি, অন্তেও ইনি! ১৮৮১ সালে রেলগাড়ীতে সম্রাটের আগমন প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা কোন একটা ষ্টেশনে তাঁহাকে গুপ্তভাবে নিহত করিবে এইরূপ ষড়্যন্ত্র করিয়াছিল—সোফিয়া তাঁহার অনুচর সহচরদিগকে এই সংবাদ যথা সময়ে জানাইবার জন্যই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোগ আয়োজন সকলই ঠিক হইয়া গেল—সোফিয়াও ঠিক সময়েই আপন কার্য্য করিয়াছিলেন। এই দুশ্চেষ্টায় সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেক্জেণ্ডার নিহত হইলেন।

ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়িল। তৎক্ষণাৎ পুলিশ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিল। ইহার এক সপ্তাহ পরে সোফিয়াও ধরা পড়িলেন। যদি তিনি রাজধানী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন, তবে এত সহজে ধরা পড়িতেন না। কিন্তু এই মহাব্যাপার-সাধনে সফল মনোরথ হইয়াও সোফিয়া রাজধানীতে অবস্থান করিয়াই আর একটী ষড়্যন্ত্রের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত সকল কার্য্য সফল হয় না। প্রত্যুত সোফিয়া রাজহত্যা-অপরাধের জন্য ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইল।

বিচার-দিবসে সোফিয়া বিচারালয়ে উপনীত হইলেন। তিনি স্থির ধীর ভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনও বিকৃতির ভাব পরিলক্ষিত হইল না—স্থির ধীর শান্ত মূর্ত্তিতে সোফিয়া সুন্দরী বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচারালয়ে তিনি নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যও কোন কথা বলিলেন না এবং নিজকে গৌরবান্বিত করার জন্য কোন "বাহাদুরী" ভাবও দেখাইলেন না—তাঁহার মুখে কোন বিষণ্ণতার চিহ্নও দেখা গেল না অথবা কল্পিত তেজস্বিতা-প্রদর্শনের জন্য অলীক উল্লাসের চিহ্নও পরিলক্ষিত হইল না। তিনি স্বাভাবিক শান্ত-সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এ দৃশ্যে দর্শক মাত্রেরই হৃদয় বিচলিত হইল। অনেকের চক্ষেই শোকের অশ্রু ও মুখে বিষাদের কালিমা দেখা দিল—কিন্তু সোফিয়া নীরব নির্ব্বিকার ও প্রশান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার এই অবিচলিত অবিকম্পিত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষীয় লোকেরা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁহাদের হৃদয়েও কোমলতার সঞ্চার হইল।

সোফিয়া বিচারকগণের সমক্ষে আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া অতি মৃদুমধুর ভাবে কেবল একটি মাত্র কথা কহিলেন, তাহা এই যে যাহাদের

সঙ্গে তিনি এতদিন বিচরণ করিতেন, তাঁহার সেই অনুচর সহচর হইতে তাঁহাকে যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাহাদের ভোগ্য দুঃখ-ক্লেশাদি ভোগ করিতে প্রস্তুত আছেন। বিচারক তাঁহার এই অনুরোধ মঞ্জুর করিলেন। বিচারক অপরাহ্ণ তিন টার সময়ে অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন এবং আপিলের জন্য ছয় দিন মাত্র সময় দিলেন।

কেহ কেহ বলেন আপিলের জন্য ছয়দিনের সময় দেওয়া হয় নাই উহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। অপরাধীদের প্রতি অত্যাচার করিয়া যদি উহাদের আরও কোন কোন গুপ্তঅভিসন্ধি অভিব্যক্ত করা যায়, সেই নিমিত্তই ছয় দিন পরে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করা হইয়াছিল। এই জনশ্রুতির সম্ভবতঃ কোন মূল্য নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত আসামীদিগের আত্মীয় স্বজনকে তাহাদের সঙ্গে দেখা করার আদেশ দেওয়া হয়—ইহাই চিরন্তন নীতি। কিন্তু বিচারকগণ এই ক্ষেত্রে কাহারও দেখা করার অধিকার দিলেন না। জীবনের শেষ দিনে এই স্বদেশব্রতধারী ব্যক্তিগণ আত্মীয়গণের সহিত একটি শেষ কথা বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেন এই নিষেধ প্রচার করা হইল, গবর্ণমেণ্ট আসল কথা গোপন রাখিয়া একটা অলীক হেতুও দেখাইতে পারিতেন, তাহাও করিলেন না—রাজকীয় উচ্ছ্রিতগর্ব্বে কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া ইহাদের আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবীজ ছড়াইয়া দিলেন। সে বীজের অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফল যেরূপ হইতে হয় তাহাই হইল।

সোফিয়ার মাতা তাঁহার কন্যাকে যে কেবল স্নেহ করিতেন, তাহা নহে, কন্যার চরিত্র-গৌরবে তাঁহাকে সম্মানের চক্ষেও দেখিতেন; ভীষণ রাজহত্যার অপরাধে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে—এই সংবাদ—পাওয়ামাত্র তিনি ক্রিমিয়া হইতে স্বদেশে ফিরিলেন। প্রাণদণ্ডের

হুকুমের দিন তিনি তাহার পরম স্নেহাস্পদা কন্যার সঙ্গে দেখা করিলেন। কিন্তু অতঃপরে তাঁহার কন্যার সহিত তাঁহাকে আর দেখা করিতে দেওয়া হয় নাই। কোন-না-কোন ছল করিয়া—তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইত; অথচ ইঁহার পতি সেন্টপিটার্সবর্গের গবর্ণর জেনারল। তাঁহারই এই দশা—অন্যের আর কথা কি! অবশেষে অনেক লেখা পড়ার পরে পোনরই এপ্রিল কর্ত্তৃপক্ষ দেখা করার দিন স্থির করিয়া দিলেন। স্নেহময়ী মাতা চক্ষের জল চক্ষে মুছিয়া,—চিত্তের আবেগ চিত্তে চাপিয়া শেষবার স্নেহের কন্যাটীকে দেখিতে আসিলেন। শেষবার একটিবার চক্ষে দেখা এবং একত্র বসিয়া দুইটী প্রাণের কথা বলা—এই উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা অনেক দুঃখ কষ্ট করিয়া কন্যাটাকে দেখিতে আসিলেন—তিনি কারাগারের দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন—করারক্ষকগণ তখন কোনও ওজর আপত্তি না করিয়া কারাগারের দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ঘাতকগণ অন্যান্য অপরাধীর সহিত সোফিয়াকে শকটে তুলিয়া বধ করার জন্য শ্মশানে লইয়া গেল!

ব্রজভাবিনী ভক্তিদেবি,—যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে ইহাদের প্রাণদণ্ড করা হইল, সে ভীষণ বিবরণ প্রকাশ করিয়া তোমার কোমল হৃদয়ে যাতনা দিব না। জার্ম্মেণীর এক খানি সংবাদ পত্রের (Kolnische Zeitung) রিপোর্টার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,— রাসিয়ায় প্রাণদণ্ড্য অপরাধীদের কয়েকটি প্রাণদণ্ড আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভীষণ কশাই কাণ্ড আমি আর কখনও দেখি নাই। সকল গুলি অপরাধীই—বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিল। কিবাল-সিক্ ও জেলিয়াবফ্ খুবই প্রশান্ত ছিল, টিমথী মিকেইলফের মুখখানি একটুকু মলিন হইয়াছিল, কিন্তু উহাতেও দৃঢ়তার চিহ্ন অতি সুস্পষ্টই

পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রিসাকফে্র রংটাতেও মালিন্য দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সোফিয়া নিরতিশয় নৈতিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার গণ্ডযুগলে তখনও ফুল্ল গোলাপের সমুজ্জ্বল বর্ণ তাঁহার মুখের শোভা বজায় রাখিয়াছিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য এবং অসীম ত্যাগশীলতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল; আজ তাহার জীবনের সমগ্র উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অবসান হইল,—সম্ভবতঃ এই ভাবের প্রভাবেই বুঝি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিমল প্রশান্তির প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য উদ্ভাসিত হইতেছিল। এইরূপ অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের সময়ে কেহ কেহ—লোক-দেখান সাহসের আড়ম্বর অভিনয় করে—কিন্তু সোফিয়া জীবনেও কখনও ছল-প্রতারণার আড়ম্বর জানিতেন না—মরণেও সে অলীকভাব দেখাইয়া বৃথা গৌরবের অভিনয় করিলেন না। তাঁহার অদ্ভুত চরিতস্রোত জীবনে মরণে চিরদিনই একভাবেই অতিবাহিত হইল—কোন সময়ে সে প্রশান্ত প্রকৃতির বিকৃতি লক্ষিত হইল না।”—কলনিস্কজিটাং (Kolnische Zeitung)—১৮৮১ সালে ১৬ই এপ্রিল।)

এই প্রাণদণ্ড বিবরণী কোন নিহিলিষ্ট দ্বারা বিবৃত নহে, কোনও উদার নীতিক সম্প্রদায়ের লোকের লিখিত নহে। ইহা জার্ম্মেণীর কলনিস্কজিটাং নামক সংবাদ পত্রের রিপোর্টারের লিখিত; নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত ইহার কোনও সহানুভূতি নাই।

১৫ই এপ্রিল প্রাতে ৯টা ২৫ মিনিটে সোফিয়ার কর্ম্মময় মহাপ্রাণ মহাকালের মহাকাশে বিলীন হইল, পাঞ্চভৌতিক দেহ মৃত্তিকায় সমাহিত হইল। রাসিয়ার রণক্ষেত্রে এই ক্ষত্রিয়রমণীর প্রাণত্যাগ হইলে যোগ্যতমার যোগ্য মরণ—ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইত। ইহার সময়ে রাসিয়ায় সেরূপ ঘটনার সম্ভাবনা হইলে অন্যান্য বীররমণীদের ন্যায় সমরক্ষেত্রেই ইহার মরণের সম্ভাবনা ঘটিত। ইনি দুর্ম্মদদুর্দ্দান্ত রণবীরের ন্যায়

সমরক্ষেত্রে বিপক্ষসৈন্য নাশ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিতেন। কিন্তু বিধাতার দুর্জ্জ্ঞেয় বিধানে ইহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল।

প্রীতিভক্তিময়ি—তোমার মনে হইতে পারে সর্ব্বগুণে গুণময়ী সোফিয়া—উপাংশুবধের পাতক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজের মাথায় লইল কেন! তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সোফিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেন নাই—রাজার অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজাদের নানাপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়াই এই সুকোমলারমণীহৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল এবং সেই অত্যাচার প্রশমনের—অন্য উপায় না পাইয়া এই ক্ষত্রিয়া বীররমণী এই নৃসংশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যেভাবে বিভাবিত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের বধ-সাধনার্থ উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন—এক্ষেত্রেও যে সেই চক্রীর নীরব প্রেরণা ও নীরব শক্তি-সঞ্চারণ ছিল না—তাহা বলা যায় না। তাঁহার বিধান-রহস্য মানব বুদ্ধির অগম্য। সোফিয়ার শক্তিসাধন—অমানুষিক ও অলৌকিক—তাই মনে হয়, উহা বুঝি—চক্রধর পার্থসারথিরই প্রয়োজনীয় প্ররোচনা ও নিগূঢ় প্রেরণা।

যদি বল, যদি তাহাই হইত, তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল কেন? অত্যাচারীর উচ্ছ্রিত মস্তক নিপাতনেও দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠা না হইল কেন? এই 'কেন' প্রশ্নের ন্যায় আরও লক্ষ লক্ষ 'কেন' প্রশ্ন প্রতিনিয়তই চিন্তাশীল নরনারীর চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়। উহারই প্রসিদ্ধ উত্তর এই যে—শ্রীভগবানের বিধান-রহস্য দুর্জ্জ্ঞেয়। তথাপি আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—সোফিয়ার প্রাণদণ্ড নিরর্থক হয় নাই—সে শোণিতপাত ব্যর্থ হয় নাই—তাঁহারই শোণিতে সম্ভবতঃ নব্য রাসিয়ায় লেনিনের উদ্ভব,—নব্য রাসিয়ায় সহস্র

সহস্র বল্‌শেভিক্‌ বীরের জন্ম। তাঁহার এক দেহে যাহা না হইত, এখন সহস্র সহস্র দেহে তাহাই হইতেছে—সোফিয়া এই নব্য বলশেভিকগণের জননী। ইহাদের দ্বারা—শ্রীগোবিন্দের কি কার্য্য সাধিত হইবে—কোন্‌ অমঙ্গলের পরে কোন্‌ মঙ্গল সাধিত হইবে—তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

আমি সংক্ষেপতই তোমাকে সোফিয়া পেরোভস্কিয়ার জীবনবৃত্ত লিখিয়া দিলাম। এ সম্বন্ধে আরও একটুকু করুণ কাহিনী বাকী আছে, তাহা এই যে সোফিয়া প্রাণদণ্ডের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—সে পত্রখানি রাসিয়ার সাহিত্যভাণ্ডারে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজ অনুবাদকগণও ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। সোফিয়া এই পত্রলেখার সময়ে নিশ্চয়ই জানিতেন যে তাঁহার প্রাণদণ্ড অবধারিত এবং সে দিনও অতি নিকটবর্ত্তী। তথাপি কিছু প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া মাতার হৃদয়টীকে এই ভীষণ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখাই তাঁহার এই পত্রলেখার উদ্দেশ্য।

সোফিয়ার পত্র

পূজনীয়া স্নেহময়ী মা জননি,—তোমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমি সর্ব্বদাই চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছি। স্নেহময়ি,—আমার নিবেদন—তুমি শান্ত থাকিও, আমার ভাবনায় অস্থির হইও না,—আমার জন্য দুঃখ করিও না; কেননা, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে, সেজন্য আমি কিছুমাত্রও দুঃখিত নই; আমি প্রশান্তচিত্তে অনায়াসে সকল দুঃখই সহ্য করিব। আমার ভাগ্যে এখন যাহা ঘটিবে, দীর্ঘকাল হইতেই আমি তাহা বুঝিয়া রাখিয়াছিলাম এবং ইহাও জানিতাম যে আজ হউক, বা দুদিন পরে হউক,—আমার কার্য্যের এইরূপ ফলই ঘটিবে। স্নেহময়ী

মা জননি—উহা আমি কিছুমাত্রও শোচনীয় বলিয়া মনে করি না। আমি আমার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি, সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি—তাহাভিন্ন অন্য কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। আমি এখন স্থিরধীর চিত্তে আমার কর্ম্ম ফলের প্রতীক্ষা করিতেছি—উহা যেরূপ হয়,—হউক ; সেজন্য আমার কিছুমাত্র ভাবনা নাই। পূজনীয়া মা জননি—আমার জন্য যে তোমার যাতনা হইবে, আমি কেবল তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছি,—কেবল সেই ভাবনাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে,—আমি কি দিয়াই বা তোমার সে দুঃখ নিবারণ করিব ?

স্নেহময়ী মা—তুমি ভাবিয়া দেখ, আমাছাড়াও তোমার অনেক পোষ্য আছে, ছোট বড় অনেক ছেলে মেয়ে আছে—সকলেই তোমাকে চায়—তোমার নৈতিক উপদেশ সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। আমি যখন চিন্তা করি- আমি তোমার উদরে জন্মিয়াও তোমার ন্যায় নৈতিক সমুন্নতি লাভ করিতে পারি নাই, তখন বাস্তবিকই আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হই। যখনই যে কোন কারণে আমি আমার সঙ্কল্প-সাধনে বিচলিত হই, তখনই তোমার দৃঢ়তার কথা আমার মনে পড়ে—তোমার তনয়া হইয়া আমার এই মানসিক দুর্ব্বলতা কেন,—এই ভাব আমার মনে উদিত হয় এবং তোমার চরিত্র-চিন্তা করিয়া তখনই মনে বল পাই। তোমার প্রতি আমার যে কেমন অচলাভক্তি, তাহা লিখিয়া আর কি জানাইব ? দয়াময়ী মা,—তুমি জান, শৈশব হইতেই আমি তোমায় প্রগাঢ় ও গভীর প্রীতি-ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। মা জননি—আমার যদি কোন যাতনা থাকে, তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাতনা—কেবল তোমার ভাবনা। আমার জন্য তোমার মনে যদি কোন ক্লেশ হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আমার আর কিছুই নাই। আমি আশা করি, সকল অবস্থাতেই তুমি মনে শান্তি রাখিবে এবং আমার আচরণে ব্যবহারে তোমার যে

কিছু ক্লেশ হইয়াছে, সেজন্য আমায় ক্ষমা করিবে। আর এক নিবেদন এই যে, আমার আচরণের জন্য আমায় বেশী দোষ দিও না। আর কাহারও নিন্দায় আমার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি দোষারোপ করিলে আমার প্রাণে বড়ই যাতনা হইবে। মা জননি,—আমি তোমার চরণ ধরিয়া সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি—আমার প্রতি রুষ্টা হইও না। আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইও।

স্নেহময়ি মা, আমার জন্য তোমার একটুকু কার্য্য করিতে হইবে। আমার জন্য কয়েকটী বোতাম ও কয়েকটী গলবন্ধ পাঠাইবে, তত বড় গলবন্ধের প্রয়োজন নাই, কিছু সরু হইলেই চলিবে। এই হাজতে সব রকম জিনিস ব্যবহারের হুকুম নাই। পরিচ্ছদগুলি অতি জীর্ণ ও মলিন হইয়াছে। আরও দুএকবার বিচারালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে ঐ গুলিতে চলিবে না। স্নেহময়ী জননি, আবার যে কবে দেখা হইবে, বলিতে পারি না। এবারের জন্য তোমার চরণে বিদায় লইতেছি। আবারও বলি—মা আমার জন্য ভাবিও না, আমার জন্য ক্লেশ বোধ করিও না। ঘটনা-চক্রে যাহা হইবার হউক, অথবা লোক যাহা মনে করে, করুক; কিন্তু আমি জানি, আমার ভাগ্য তত মন্দ নয়। তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না।

মার্চ্চ ২২ (এপ্রিল ৩)
১৮৮১

স্নেহময়ী মা জননি,
তোমারই—সোফিয়া।

৩। ভেলেরিয়ান্ অসিনস্কী

শুচিব্রতা প্রজ্ঞাদেবি—তোমাকে আর একটি স্বদেশ-সেবক যুবকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া এই উদাহরণ-প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি। ইহার নাম ভেলেরিয়ান অসিনস্কী। যে লোকটীর সঙ্গে ইহার পরিচয় ছিল, তাঁহার কথারই মর্ম্মানুবাদমতে তোমাকে ইঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানাইতেছি। ইঁহার পরিচিত ব্যক্তিটি লিখিয়াছেন—"ভেলেরিয়ান্ কোথাও বেশীক্ষণ স্থির থাকিতেন না। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমি সেণ্ট্ পিটার্স বার্গে থাকিতাম,—ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র দক্ষিণ রাসিয়াতে ছিল বটে, কিন্তু সুদীর্ঘ মরুর নিদাঘবাতাসের ন্যায় ইনি সমগ্র রাসিয়াতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আমি যখন সেণ্ট্ পিটার্স বার্গে ছিলাম, সেই সময়ে ইনি তিন চারি দিনের জন্য বিজলির চমকের ন্যায় সেখানে আসিয়াই চিরদিনের তরে প্রস্থান করিলেন।"

"সেই সময়টা একটা ভারী বিশ্রী সময়। ১৮৭৮ সালের ১৬ই আগষ্ট টেররিষ্টগণ পুলিসের প্রধানতম কর্ম্মচারী জেনারেল মেসেণ্ট্জেফ্কে (Mesentzeff) নিহত করিল। তখন হইতে উহারা মুখোস ছাড়িয়া প্রকাশ্য ভাবেই রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। এই হত্যাকাণ্ডের পরে চরিদিকে একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। মেসেণ্টজেফ্ তো যেমন-তেমন লোক ছিলেন না—তিনি ছিলেন পুলিশের একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী—আর এই নির্ভীক নৃশংসগণ তাঁহাকেই খুন করিয়া ফেলিল। সে খুনের কাণ্ডও কিছু নিশার আন্ধারে নয়—কোন বনে জঙ্গলে নয়—কুচকাচা এন্ধো গলিতে নয়—দিন দুপ্রহরে প্রধান নগরের ঘনজনসন্নিবেশময় একটা বিশাল রাজপথের বুকের উপরে এই অতি ভীষণ লোমহর্ষণ খুনিকাণ্ড করিয়া অপরাধীরা পুলিশের চক্ষে ধূলি

দিয়া সরিয়া পড়িল—আর তখন পুলিশ যাকে-পায়-তাকেই গ্রেফ্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিকে জনরব ছড়াইয়া পড়িল,—পুলিশ প্রথম আটচল্লিশ ঘণ্টায় এক হাজার লোককে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। যখন দোষী-নির্দ্দেশের নির্ণয় না করিয়াই প্রমত্ত পুলিশ কাল্পনিক সন্দেহে গ্রেপ্তার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই বিশ্রী সময়ে ঘরের বাহির হওয়া কাহারও পক্ষে নিরাপদ নহে। অনেকেই সাবধান হইয়া চলা-ফেরা করিতে লাগিলেন।

গোলযোগটা কিছু কমিয়া গেল। একদিন শুনিতে পাইলাম ভেলেরিয়ান সেণ্টপিটার্সবর্গেই আসিয়াছেন। তিনি যে স্থানে ছিলেন, সেইখানে গেলাম, শুনিলাম—তিনি কোন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছেন, সত্বরই ফিরিবেন। তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তিনি খুব প্রসিদ্ধ লোক, এই-জন্য তাহাকে দেখিবার জন্য একটা কৌতুহল ছিল। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আসিলেন। আমি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিলাম—তিনিও প্রীতির সহিত আমার হাত ধরিয়া রহিলেন। ভেলেরিয়ানকে আমি এই প্রথম দেখিলাম। রাসিয়ার সাধারণ লোকজন অপেক্ষা ইহার দেহের গঠন চিত্তকর্ষি—নয়ন-যুগল জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভাব্যঞ্জক ও তেজোদৃপ্ত। ইনি কিফ্‌নগর হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে আসিয়াছেন। দক্ষিণ রাসিয়ার প্রত্যেক প্রধান নগরই ইহার পরিচিত। এই সকল স্থানের রাজদ্রোহি-সার্কেলগুলিতে যাইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থানীয় প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ভালরূপে জানিয়া এখন সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইয়াছেন। টেররিষ্টদিগের কার্য্যসম্বন্ধেও ইহার প্রমুখাৎ আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিলাম, কথাগুলি অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু

ইহার বক্তৃতায় এমনই আকর্ষণী শক্তি যে আমরা ইহার কথাগুলি শ্রবণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ইনি সুবক্তা তেমন না হইলেও যাহা বলেন, এমন প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত বলেন, যে সেই বিশ্বাসোত্থ বাক্যগুলি শ্রোতৃমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে। তাঁহার বাক্যের স্বর, বলিবার সময়ে মুখের ভাব, হস্তাদি-সঞ্চালন প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গকে ইহার অভিমত-গ্রহণে উন্মুখ করিয়া তোলে। ফলতঃ যাঁহারা কথা দ্বারা জনসাধারণকে নিজের দলে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বাগ্-বিন্যাসে যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজনীয়, সেই সকল গুণের অধিকাংশই ভেলেরিয়ানের বাক্যালাপে প্রত্যক্ষ হইত। তিনি যে একজন কাজের লোক—পূর্ব্বেও তাহা শুনিযাছিলাম; এখনও সে বিষয়ে প্রত্যক্ষই প্রতীতি জন্মিল।"

"এখন ইহার কর্ম্মময় জীবনের দুই একটি ঘটনা বলি। ১৮৭৯ সালে ইহাকে কিফ্‌নগরে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৭৯ সালের ৫ই মে ইহার অপরাধের বিচার হয়। রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের অপরাধীদিগের বিচারে প্রায়ই প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। ভেলেরিয়নের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ফরিয়াদী পক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কোন গুরুতর অপরাধই সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না, যাহাতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ বিচার-সঙ্গত বা ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে। তাঁহার এই একমাত্র অপরাধ ছিল যে, তাঁহার পকেটে একটী বন্দুক ছিল, তিনি সেই বন্দুক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন মাত্র, পুলিশ এইটুকু মাত্র দেখিয়াছিল কিন্তু তিনি পকেট হইতে তাহা বাহির করিবারও প্রয়াস পান নাই, কেবল হস্তস্পর্শ করিয়াছিলেন, এই মাত্র। তাঁহার প্রাণ নাশের পক্ষেই এইটুকু যথেষ্ট হইল। গবর্ণমেণ্ট জানিতেন রাজ-দ্রোহি দলে ভেলেরিয়ান একজন প্রভাবশীল সদস্য—সুতরাং ইহার প্রাণদণ্ড

ভিন্ন অন্যদণ্ড শোভনীয় নহে। বিচারের পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট জজদিগকে এই দণ্ডের ব্যবস্থা করার আদেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজের হাইকোর্টে জজদের কখনও এরূপ দুর্গতি বা দুর্ম্মতির কথা শুনা যায় না। ব্রিটিশ জজ জজীয়তী করিতে আসিয়া এরূপ আজ্ঞাবহ ভাবে দাসত্ব-করিতে ঘৃণা বোধ করেন। শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারবিভাগের উপর এরূপ অন্যায় অসঙ্গত প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন বলিয়া শুনা যায় না। হাই-কোর্টের জজেরা শাসনবিভাগের মুখাপেক্ষী বা অন্যায় আজ্ঞাবহ হইতে প্রকৃতই ঘৃণা করেন।

ভেলিরিয়ান প্রকৃত বীরের ন্যায় উচ্ছ্রিত মস্তকে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিলেন ; দণ্ডাদেশ-শ্রবণে তাঁহার মস্তক কিছুমাত্র নত হইল না। দণ্ডাদেশের দশ দিন পরে তাঁহার প্রাণনাশ হইল। এই সময় ব্যাপিয়া তিনি স্থির ধীরভাবে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদাই প্রীতি-প্রফুল্ল ছিল যেন তিনি তাঁহার স্বীয় বাসগৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। যে সকল বন্ধু-বান্ধব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাঁহারা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তিনি প্রফুল্লমুখে সকলকেই সান্ত্বনাসহ স্বদেশের কার্য্য-সাধনের জন্য সদুপদেশ দিতেন। তাঁহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁহার সঙ্গে দেখা করার জন্য কারাগৃহে আসিয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননী শোকসন্তাপে মূর্চ্ছিতা-প্রায় হইলেন। ভেলেরিয়ান অম্লান বদনে হাসিয়া বলিলেন, "মা-জননী এইজন্য আপনি শোক-সন্তপ্ত হইতেছেন কেন, আমাকে অল্পকয়েক দিন এই কারাগৃহে থাকিতে হইবে বে তো নয়।" প্রাণদণ্ডের হুকুম জানা সত্ত্বেও এই বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু ভগিনীর নিকটে চুপে চুপে প্রকৃত কথা বলিয়া দিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বদা মাতার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে ও তাঁহার

সেবাযত্ন করিতে উপদেশ দিলেন। প্রাণদণ্ডের দিন সকাল বেলায় তাঁহার এক নিকটবর্ত্তী বন্ধুর নিকটে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন, সেই পত্রে কেবল তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিস্তৃত উপদেশ ও মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের কথা ভিন্ন নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই ছিল না।

১৪ই মে সকাল বেলায় পত্র খানি লেখা শেষ হওয়ামাত্রই তাঁহাকে ও তাঁহার সহচর ও মিত্র এণ্টোনফ ও ব্যাণ্টন্যারকে প্রাণদণ্ডের জন্য বধ-স্থলে উপনীত করা হইল। এই শ্রেণীর আসামীদিগের চক্ষুর উপরে পটি দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা কাহারও শোকভাব না দেখিতে পায়। তাহাতে মনে আরও কষ্টের উদয় হয় কিন্তু এই সময়ে রাসিয়ায় এই নিয়ম রহিত করা হইয়াছিল। অপরাধীরা অধিকতর দুঃখে দুঃখে যেন প্রাণত্যাগ করে,—ইহাই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অভিপ্রায়। ভেলিরিয়ান ও তাঁহার সহচরদ্বয় প্রাণদণ্ডের আসামীদের যাতনা প্রকাশ স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মানুষ আত্মবলে যতই বলবান্ হউক না কেন, কিন্তু দেহের উপরে সে প্রভাব সর্ব্বদা থাকে না। প্রাণদণ্ডের আসামীদের দুঃখ দেখিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার মস্তকের কাল চুলগুলি একবারে সাদা হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বল যেমন অদম্য ছিল, তেমনই রহিল। তাঁহাকে যখন বধ-শালায় উপনীত করা হইল, তখন এই সুন্দর যুবককে দেখিয়া ঘাতকদের মনেও স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা বলিল,—তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। "ভেলেরিয়ান দর্পভরে বলি-লেন,—ক্ষমা? কাহার নিকট ক্ষমা? আমি উৎপীরকদের ক্ষমার ভিখারী নহি।" এই বলিয়া নিজেনিজেই বধ-মঞ্চের সোপানে দৃঢ়পদে আরোহণ করিলেন। একজন খৃষ্টপুরোহিত তাঁহার আত্মার সৎকারের জন্য অন্ত্যেষ্টিকালোচিত ক্রিয়া করাইতে উপস্থিত হইলেন। ভেলেরিয়ান সজোড়ে মাথা নাড়িয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত সগর্ব্বে বলিলেন,—জীবনে

যেমন আমি পৃথিবীর কোন শাসন-কর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করি নাই, মরণ-কালেও তেমনি স্বর্গের রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।”

ঘাতকগণ সামরিক বাদ্যকরগণকে রুদ্র তালে সংহার-বাদ্য বাজাইতে অনুমতি করিল। উহারা কুৎসিত গান ও বলিদানের বাদ্যে বধশালা মুখরিত করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই রাসিয়ার স্বদেশহিতব্রত রাজবিদ্রোহী ভেলেরিয়ানের দেহ মৃতাবস্থায় ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভেলেরিয়ানের চরিত্রে অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল। যখন যে ঘটনা উপস্থিত হইত, তিনি সহসাই তদুপযোগি কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন। ছোট বড় সকল কার্য্যেই তিনি সমান মনোযোগ দিতেন। যে কার্য্য দশদিন পরে উপস্থিত হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাহার সকল প্রকার আয়োজন উদ্যোগ ঠিক রাখিতে পারিতেন। ১৮৭৮ সালে টেররিষ্ট-দিগের কার্য্যের শৈশব অবস্থা মাত্র। এই সময়েই তিনি রুসসম্রাটের প্রাণ-বিনাশের ষড়যন্ত্রের নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত কার্য্য-সাফল্যের পথ প্রসরতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বাক্‌পটু বা বক্তা না হইলেও তাহার কথায় যথেষ্ট আকর্ষণী শক্তি ছিল। কথা অপেক্ষা কার্য্যেই তাঁহার দক্ষতা অধিকতর পরিলক্ষিত হইত। যখন যেখানে জনসাধারণের মধ্যে বাক্যচ্ছটায় প্রচার করার প্রয়োজন হইত তখন সেখানে ভেলেরিয়ানের বড় বেশী দেখা পাওয়া যাইতনা—তখন তিনি দূরে দূরে থাকিতেন। ১৮৭৮ সালে যখন বাক্যের কাজ চলিয়া গেল—কাজের সময় আসিল, ভেলেরিয়ান তখন বীর-বিক্রমে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চরিত্রের অনেকটা প্রধান গুণ—কর্ত্তব্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের বলে পাহার টলে, ভেলেরিয়ানের সেই বিশ্বাস-বল অধিক মাত্রায় ছিল। যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে আসিতেন তাহাদের হৃদয়েও তিনি এই বিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া দিতেন। সুবিখ্যাত

ষ্টিফেনেভিক ইহার অতি প্রিয়তম মিত্র ছিলেন। উভয়েই দক্ষিণ রাসিয়ার বিদ্রোহানলে ইন্ধন যোগাইতেন। দক্ষিণ রাসিয়ার বিদ্রোহীদের এমন আন্দোলনই ছিল না, যাহাতে ভেলেরিয়ান্ যোগ না দিতেন। ভেলেরিয়ান যে দলে থাকিতেন, সে দলের লোকেরা বিষন্নতা যে কি, তাহা জানিত না। সুতীব্র উত্তেজনায় তিনি সকলের হৃদয় সর্ব্বদাই উদ্দীপ্ত রাখিতেন। নেতার ইহা একটা প্রধানতম গুণ। যেখানে বেশী বিপদ, ভেলেরিয়ানকে সেইখানেই সকলে দেখিতে পাইত। বিদ্রোহীদের কার্য্যে সর্ব্বদাই অর্থের প্রয়োজন। ভেলেরিয়ান অর্থসংগ্রহে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সুমধুর বাগ্‌বিন্যাসে, মুখের সৌজন্যে ও শিষ্টব্যবহারে বদ্ধ-মুষ্ট কৃপণও আশাতিরিক্ত অর্থ ইহার হস্তে সমর্পণ করিতেন। তিনি অভাবে ও দৈন্যে নিদারুণ নিপীড়িত হইলেও নিজের প্রয়োজনে ইহা হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। ভেলেরিয়ান বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়া বিদ্রোহি-সমাজ-সমক্ষে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতিভাময়ি,—রাসিয়ার রাজদ্রোহীদের জীবন বৃত্তের মধ্যে একটি পুরুষের এবং একটি রমণীর—এই দুইজন আদর্শের উদাহরণ দিয়াই এ প্রসঙ্গের শেষ করিতে পারিতাম কিন্তু তথাপি ভেলেরিয়ান অসিনস্কার জীবন বৃত্ত অতি সংক্ষেপে তোমাকে জানাইলাম। ইহার একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপের রাজদ্রোহীদের সাধারণ ইতিহাসের আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে এই সকল রাজদ্রোহী কেবল রাজদ্রোহী নহে,—ইহারা যেমন রাজদ্রোহা (Anti-king)তেমনই ভগবৎদ্রোহী (Anti-God)। ভেলেরিয়ান রাজদণ্ডে নিহত হওয়ার সময়ে পুরোহিত দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও ভগবান্ বলিয়া যে কোন কিছু আছেন, তাহা কোন মতেই স্বীকার করিলেন না। রাসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্রোহার দল নাস্তিক্য মতাবলম্বী ছিল। বর্ত্তমান সময় মস্কাউর বিদ্ধ

কমিউনিষ্টদিগের ন্যায় অন্ত কমিউনিষ্টদিগেরও ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; এখানে আসিয়া ধর্ম্ম-নীতি, রাজনীতি ও সমাজ-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া ছিলাম এখন উহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তোমায় লিখিতেছি।

যাহারা আমায় মস্কাউনগরে লইয়া গিয়াছিলেন, ধর্ম্মনীতি রাজনীতি বা সমাজ নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমার সম্পূর্ণ মত ভেদ হইলেও তাঁহাদের শিষ্টাচার সৌজন্য ও সদয়ব্যবহার আমি যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমার দেহটা মানুষের মত হইলেও সাধারণ দেহের সহিত এই দেহের অনেক পার্থক্য আছে। তুমি হয়তো গ্রন্থাদিতে বাতাশন মুনিদের কথা শুনিয়াছ; ইহারা কোন স্থূলাহার গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবান্ সকল পদার্থেই জীবন-রক্ষার উপাদান প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন। কেবল বায়ুভক্ষণেও এই স্থূল দেহের কার্য্য চলিতে পারে। ভারতীয় যোগীদের নিকটে ইহা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া—কেবল সেই কৌশলের অভ্যাস করিতে হয়। যোগীদের ক্রিয়াকলাপ দেখিলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের হৃদয়ে বিস্ময়ের উপরে বিস্ময় উপস্থিত হইবে। ধৌতি, বস্তি নেতি প্রভৃতি হঠযোগ শিক্ষার প্রথম হইতেই শিক্ষা করিতে হয়। যোগের কৌশলে কেবল বায়ু হইতেও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা যায়। ভাত ডাল দধি দুগ্ধ ঘৃত ফলমূল বা মৎস্য মাংস প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানে কেবল কতকগুলি স্থূল নিয়মের উল্লেখ আছে; আর অকাণ্ডে পণ্ডিত্য প্রকর্ষ-প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি বাগাড়ম্বরের ঘটা আছে। আজ কাল উহাদের শিক্ষানুসারে ভারতীয় বালক বালিকাগুলি পর্য্যন্ত কথায় কথায় এক একটা বড় বড় শব্দ বলিয়া বিদ্যার, পরিচয় দেয়,—তাহারা কথায় কথায় বলে এই খাদ্যে 'ভাইটামিন (vitamin) আছে, এই দ্রব্যে ভাইটামিন নাই। ভাইটামিন কি, উহা

কোন্‌দ্রব্যে আছে কিসে নাই, তাহা বৈজ্ঞানিকগণও ঠিক বলিতে পারেন কি ?

যাহা হউক, আমি অনেক কাল কোনও খাদ্য গ্রহণ করি নাই অথচ শারীরিক ও মানসসিক সকল রকম কার্য্যই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সমর্থ,—ইহা দেখিয়া সকলেই আমাকে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে করিতেছিলেন। আমার দেহটী যে তাঁহাদের এনাটমী, ফিজিওলিজী ও বায়োলজীর নিয়মের কোনও ধার ধারে না, ইহা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

এই সময়ে ইহারা মস্কাউ-নগরে আমার কথা-শ্রবণের জন্য স্থানে স্থানে সভা আহ্বান করেন। প্রথম দিন আমি ঈশ্বর-অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করি। সর্ব্ব প্রথমে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম, যে দেশে কাউণ্ট্ টলষ্টয়ের ন্যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বহুদিন ব্যাপিয়া জনসাধারণের চিন্তার ধারা পরিচালিত করেন, সে দেশের লোকদের মধ্যে এখন এরূপ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারের হেতু কি, তাহা আমি খুঁজিয়া পাইনা। টলষ্টয়ের এক একটি গল্প পাঠেও জনসাধারণের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়; জনসাধারণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে কেন ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহা আমার ধারণার অতীত। এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে ভগবৎশক্তি বিরাজমানা—অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক পরমাণুতে ভগবৎইচ্ছা বর্ত্তমান না থাকিলে অজ্ঞান-অচেতন-অন্ধ জড়শক্তিতে এই বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে না। আমাদের অন্তশ্চেতনা জড়শক্তি হইতে উদ্ভুত নহে। অচেতন হইতে চেতনার সম্ভব হয় না।

যে শক্তিতে বৃক্ষের পাদদেশ হইতে উহার জীবন-পোষক রস অতি

উচ্চ শাখার পত্রে পত্রে সঞ্চারিত হয়, যেখানে যতটুকু রস জীবন-রক্ষার প্রয়োজনীয়, তাহার এক বিন্দু বেশী বা একবিন্দু কম হইলে সে পত্রটি তখনই পীড়িত হয়, উহার জীবনী শক্তি তৎক্ষণাৎ ব্যাহত হইয়া পড়ে। ঠিক সূক্ষ্ম হিসাবে বৃক্ষপত্রে রসধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপ সূক্ষ্ম বিবেচনার কার্য্য অতি বড় জ্ঞানী মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। ইহাতে অবশ্য ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এই চিৎ ও অচিৎ সৃষ্টির অন্তরালে অবশ্যই কোন সর্ব্বজ্ঞানময়ী সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছা-ময়ী এক মহতী ভগবতী শক্তি জাগতিক জীবগণের অন্তরাত্মায় এবং জগ-তের প্রত্যেক জড়ীয় শক্তির অন্তরালে অবস্থান করিয়া নানারূপে আত্ম-প্রকটন করিতেছেন। আলোক তাপ তড়িৎ প্রভৃতি যে একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা,—ইহা বহু কাল হইতে ফেরেডে প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানবিদ্-গণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ (Scientific monism) অধুনা এই ইয়োরোপেও সর্ব্বসম্মত। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক জড়ীয় অদ্বৈতবাদের অন্তরালে যে সর্ব্বব্যাপিনী চিন্ময়ী বা চিদানন্দ-ময়ী মহাশক্তি বিরাজমানা—এই তত্ত্বটা এখানকার অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইঁহারা চেষ্টা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারেন, কিন্তু মানুষের চরিত্রের একটা স্বাভাবিক নিয়ম এই যে নরনারীগণের চিরপোষিত কুসংস্কার সহসা পরিত্যাগ করিতে সবিশেষ ইচ্ছা হয় না। পুরাতন বন্ধুর ন্যায় পুরাতন কুসংস্কার হৃদয় জুড়িয়া অবস্থান করে—ছাড়া বড় ক্লেশকর। ইহা মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অপর এক শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্ জড় ছাড়িয়া অজড়ে বা চেতনা-তত্ত্বে উঠিতে নারাজ। ইঁহারা স্থূল লইয়াই সন্তুষ্ট। সূক্ষ্মতত্ত্বে ইঁহাদের চিন্তাশক্তি প্রবেশ পথ পায়না। নিম্নতম সৃষ্ট পদার্থ হইতে উন্নতম মানবপর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জ্ঞানের অস্তিত্ব,—চেতনার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অভিব্যক্তির

ক্রম-নিয়ম অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তুসর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্মময়—সর্ব্বত্রই যে চেতনা শক্তি বিদ্যমানা—আধুনিক জড় বিজ্ঞান পর্য্যন্ত এইটুকু স্বীকার না করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যদি সর্ব্বত্রই এই চেতনা শক্তি বর্ত্তমানা থাকেন, তবে এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একটি সমষ্টি চেতনা-শক্তির ভাণ্ডার বলিয়া স্বীকার করিতেই বা বাধা কি?

আপনারা জানেন জগতের প্রত্যেক খণ্ডের প্রাচীন সুসভ্য জাতীর পণ্ডিতগণই জগতের ভিতর দিয়া জগদীশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহবা উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছেন, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের প্রকল্পনা করিয়াছেন,—এই প্রণালীকে ইংরাজী ভাষায় ডিডাকটিভ্ মেথড্ (Deductive method) বলা হয়। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের এই ধারা। বেদান্তের আদ্য সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি এবং যাহাতে জগৎ লীন হইয়া রহে, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। সাংখ্য দর্শনের প্রক্রিয়াও এইরূপঃ—অব্যক্ত হইতে ব্যক্তপ্রকৃতি,—ব্যক্ত হইতে মহান্—মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ স্থূল ভূতে জগৎ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ও বৈশেষিকগণ নীচের দিক হইতে উপরের দিকে গিয়াছেন,—স্থূল হইতে সূক্ষ্মের অনুসন্ধান করিয়াছেন। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ প্রণালীর নাম আরোহ (Inductive Method)। ভগবৎতত্ত্ব বা ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের একখানি প্রধান গ্রন্থ,—ন্যায় কুসুমাঞ্জলি; ইহা সুবিখ্যাত ন্যায়াচার্য্য শ্রীমদউদয়নাচার্য্য-লিখিত। এই গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে লিখিত আছে—

কার্য্যায়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যোবিশ্ববিদব্যয়ঃ॥

অর্থাৎ জগতের কার্য্য, জগতের আয়োজন, জগতের ধারণা, জাগতিক

ব্যবহার প্রামাণ্য, দ্ব্যণুকাদি সংখ্যা যোগ ইত্যাদি হেতু হইতে অনুমান-প্রমাণে জানা যায় এই জগতের একজন অব্যয় কর্ত্তা আছেন।

জগতের মধ্য দিয়া ভগবৎ-তত্ত্বে প্রবেশ—সুগম। এই জন্য সকল দেশের দার্শনিকগণই প্রথমতঃ জগৎ-উৎপত্তির (Cosmogenesis) আলোচনা করিয়াছেন। আমিও আপনাদের দর্শন শাস্ত্রের প্রণালী অনুসারে অতি সংক্ষেপে আপনদের নিকটে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের কথা কিছু বলিতেছি।

এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে এই বিপুল আকার ধারণ করিল, কে ইহার সৃষ্টি করিলেন, কি উপাদানে বা সৃষ্টি করিলেন, প্রথমতঃ ইহা কি ছিল, পরে কোন্ নিয়মে ইহার উৎপত্তি, বিকাশ, বিবর্দ্ধন ও স্থিতি সাধিত হইল, ইহা জানিবার জন্য মানুষের মনে চিন্তাশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঋষি-জ্ঞানের অথবা মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের যতটুকু বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে এখনও এই সৃষ্টিরহস্য-উদ্ভেদ করা মানুষের জ্ঞানের অতীত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আমি মহিম্নস্তবের একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়া এই চেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদান করিতাম, সে ধারণা আমার চিত্তে এখনও দৃঢ়ই আছে। বহুবার বহুস্থলে বলিয়াছি, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সেই আলোচনা কিরূপ ভাবে আরম্ভ করিতে হয়, কিরূপ ভাবে তাহার যুক্তি-বিচার করিতে হয়, তজ্জন্য কত শাস্ত্র যে অধ্যয়ন করিতে হয়, সেই বিশাল, বিপুল আলোচনার একটুকু ক্ষুদ্র নমুনা প্রদর্শন করাই আমার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

আলোচনা করার প্রারম্ভে দুইটী বিষয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইতেছে। একটী,—আমি, অহং ; অপরটী—ইহা, ইদং,—এই

বিশ্ব। একজন—দ্রষ্টা, আর একটী,—দৃশ্য। আমি আমাদের সম্মুখে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখিতেছি। তাহা হইলে এই দুইটী বিষয়ই জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন। একজন জ্ঞাতা; অপরটী জ্ঞেয়; ইহার সঙ্গে আর একটী বস্তু পাইতেছি, তাহার নাম জ্ঞান। সুতরাং কোন কিছু জানিতে বা বুঝিতে হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই তিন বস্তু-রই প্রয়োজন। এই যে আমার সমক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রখচিত নীল নভঃস্থল, এই পৃথিবী, অগণ্য তরুলতা, নগ, নদনদী, নিখিল জীবসমষ্টি-পূর্ণ ভূত-ধাত্রী ধরিত্রী বিরাজমানা,—এই সকলই সৃষ্ট পদার্থ। ইহা একদিনে এই বর্ত্তমান সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহা হইলে স্বতঃই মনে এই ধারণা উপস্থিত হয়, ইহা পূর্ব্বে কি ছিল? আমি জ্ঞানের রাজ্যে ক্ষুদ্র কীটাণুকীট, এমন কি তাহা হইতেও ক্ষুদ্রতম। জ্ঞানসমষ্টির একটা পরমাণু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন পরমাণু বলি-লেও ক্ষুদ্রতম দ্রব্য-শেষ বুঝায় না। ড্যালটনের (Dalton) পরমাণু-সিদ্ধান্ত Atomic Theory নব্য বিজ্ঞান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছেন। এখন উহার স্থলে সহস্র সহস্র ইলেকট্রন্ Electron অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং সমষ্টিজ্ঞানের সমক্ষে আমি একটা ক্ষুদ্রতম Electron. আমি এতই অজ্ঞ! বিশ্ব কোন-না-কোন প্রকারে পরিদৃশ্যমান হইবার পূর্ব্বে কি ছিল?—মনে করুন Nebula বা কুজ্ঝটিকার মত একটা দৃশ্য পদার্থ হওয়ার পূর্ব্বে ইহা কি আকারে কোথায় ছিল, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল কিনা, পরেই কোন্ চেষ্টায় এরূপ হইয়া দাঁড়াইল, সে চেষ্টা কি ইহার নিজের অথবা নিজাতি-রিক্ত অপর কাহার? এক হইতে কি দুই হইল? অথবা দুই কোটী পদার্থই এক বীজাকারে ছিল; ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপন আপন অন্ত-র্নিহিত শক্তি অনুসারে স্বতন্ত্র শক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

পরিণত হইল? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ইহার কি উত্তর দিবে? আমাদের বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা অদ্বৈতবাদী (Monist), কেহ বা দ্বৈতবাদী (Dualist), কেহ বা বহুবাদী (Pluralist), কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী (Qualified Monist)), কেহ বা একেশ্বরবাদী (Monotheist), কেহ বা Pantheist, কেহ বা Panentheist, কেহ বা Agnostic, কেহ বা Sceptic, কেহ বা Atheist, কেহ বা পরমাণু-বাদী, কেহ বা পরিণামবাদী, কেহ বা সৎকার্য্যবাদী, কেহ বা অসৎকার্য্য-বাদী, কেহ বা প্রধান কারণবাদী কেহ বা শূন্যবাদী ইত্যাদি জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং চরম পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ বহু বহু বাদ এখনকার দিনে শুনিতে পাওয়া যায়। সে বাদবিবাদের কল্লোল-কোলাহল—বিশাল বিপুল সমুদ্রের অনন্ততরঙ্গ-কল্লোল-কোলাহল অপেক্ষাও অতি ভীষণ। তাহাতে স্থির থাকা এবং ধীরভাবে চিন্তা করা মর্ত্ত্যবাসী মানবের পক্ষে বোধ হয় সম্ভবপর নহে। ব্যাপার ত এইরূপ !!

আমরা আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার সাহসী নহি কাজেই আর্য্যঋষিদের দ্বারে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হওয়ার পূর্ব্বে কি ছিল, জগতের আদি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ এ সম্বন্ধে কি কহেন, তাহাই প্রথমতঃ শুনা যাউক :—

নাসদাসীন্নো সদাসীতদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্
নভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্। ১০।১২৯।১ ঋক্।

মহামতি সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্য করার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য। পরমাত্মা দেবতা,—এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। প্রলয়ের অবস্থাই

এই মন্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্যান্য ভাষ্যকারগণ কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। শাকপুণি প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের নাম মাত্র শুনিতে পাইতেছি। তাঁহাদের ভাষ্য এখনও আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই। এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা ঠিক যে বৈদিক মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির অভিপ্রায় ;—তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সায়ণ পৌরাণিক মত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রলয়ের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, এই জগতের যাহা মূল-কারণ, তাহা সৎ অর্থাৎ নিত্য, শশবিষাণবৎ নিরূপাখ্য (অপদার্থ) নয়, কেননা এই জগৎ যখন সৎ, তখন অসৎ কারণ হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না ; ভগবদ্গীতাতে লিখিত আছে, "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"। ইহা সাংখ্যকারেও স্বীকৃত। কিন্তু নৈয়ায়িক স্বীকৃত নহে। বেদান্তীরাও সাংখ্যশাস্ত্রকারের ন্যায় সৎ-কারণবাদই স্বীকার করিয়াছেন। আবার বলা হইতেছে যে নিত্য আত্মবৎ সত্য স্বরূপেও কোন কিছু তখন যে নির্ব্বাচ্য ছিল তাহাও বলা যায় না, সৎ এবং অসৎ এই দুই বস্তুর পৃথক লক্ষণ হইলেও ভাব এবং অভাবে একত্রাবস্থান সম্ভবপর। কিরূপে ইহার একত্রাবস্থান সম্ভাবিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে উভয়ের পৃথক লক্ষণ অনির্ব্বাচ্য রূপেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয় 'নসৎ' এই উক্তির দ্বারাই কি পারমার্থিক সত্যের নিষেধ করা হইয়াছে? তাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? তাহা হইলে আত্মার ত অনির্ব্বাচ্যত্ব-প্রসঙ্গ হইয়া উঠে অর্থাৎ তাহা হইলে আত্মারও নির্ব্বাচন অসম্ভব হয়। এই বিষয়ে আর একটী ঋক্‌মন্ত্র দেখা যায়। তাহা এই—

> ন মৃত্যুরাসীদমৃতং
>
> নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন্যাসীৎ প্রকেতঃ

অনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস। ১০।১২৯।২ ঋক্।

সুতরাং আত্মার নিষেধ-প্রসঙ্গ হইতে পারে না। জীবসমূহের উপভোগের জন্যই এই সৃষ্টি (Anthro-pogenic doctrine of creation) প্রলয়দশার ভোক্তা জীবগণের উপাধি-প্রলয়-নিবন্ধন জীবগণও প্রলয়ে প্রলীন হইয়া থাকে। সুতরাং ভোগ্য-প্রপঞ্চের ন্যায় ভোক্তৃ প্রপঞ্চও প্রলয় দশায় থাকে না। নিরুপাধি পরম ব্রহ্মেরই প্রলয়-কালে সত্ত্বা বর্ত্তমান থাকে। তাদৃশ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধ থাকে না, তবে সাংখ্যশাস্ত্রের অভিমত স্বতন্ত্র। স্বত্ত্বরজগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি প্রলয় দশাতেও নিত্যারূপে কল্পিত হইতেছেন। শ্রুতিতেও আছে "অজামেকাং" ইত্যাদি। সাংখ্য শাস্ত্রকার এই শ্রুতি অবলম্বনে প্রকৃতি-কেই নিত্যা এবং জগৎপ্রসবিনী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। প্রকৃতিই নিত্যা সুতরাং প্রলয়ে তাহার বিনাশ নাই। তদুত্তরে বলা হই-তেছে ইহা শ্রুতি-সম্মত নহে। কেননা এখানে স্বধা শব্দের অর্থ মায়া—স্বস্মিন ধীয়তে ধ্রিয়ত আশ্রিত্য বর্ত্তত ইতি 'স্বধা'—"মায়া" অর্থাৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়া বর্ত্তমান থাকে। মায়ার স্বতঃবিদ্যমানতা নাই। এইরূপ বহুবিধ বিচার করিয়া সায়ণাচার্য্য কেবল পরব্রহ্মের সত্তাই প্রলয়-অবস্থায় বিদ্যমান রাখিয়াছেন।

বলা বাহুল্য সায়নাচার্য্য সর্ব্বত্রই শঙ্কর-মত অনুসরণ করিয়া বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে নিরপেক্ষ ভাবে বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যায় কিনা ইহাতে ঘোর সংশয় আছে। আমি ঋগ্বেদ হইতে বহুল মন্ত্র উদ্ধৃত করিতে পারি। দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্ত এবং উক্ত মণ্ডলের সমগ্র ১২৯ সূক্ত এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য উদ্ধৃত করিয়া স্বাধীনভাবে উহার ব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টি

তত্ত্বের বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত জানা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে cosmology, cosmogony এবং cosmo genesis সম্বন্ধে যে সকল আধুনিক সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্বারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল সিদ্ধান্তের অধিকাংশই মূলতঃ সূত্রাকারে ঋগ্বেদের এই সকল মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদ জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা এখনও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ ও মীমাংসা এই ষড়্দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বে যে সকল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, বেদই সেই সকলের প্রতিষ্ঠান-ভূমি। যাঁহারা গবেষণাপ্রিয় তাঁহারা প্রথমতঃ ধারাবাহিকরূপে ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলে শিক্ষার্থীদের বহুল উপকার হইতে পারে।

সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুল প্রশ্নের অবতারণা ঋগ্বেদ সংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবাচৎ
কুত আজাতা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনে
নাথা কো বেদ যত আবভূব।
ইয়ং বিসৃষ্টির্যতঃ আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনৎ
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ। ১৮।১২৯।৭ ঋক্

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রে ১ম অধ্যায়ে ৪র্থ পাদের ১৪শ সূত্রের

ভাষ্যে জগৎকারণের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তদ্ যথা :—

১। "ক্বচিদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাকাশাদিকা স্থষ্টিরাম্নায়তে।

২। ক্বচিত্তেজ আদিকা—"তত্তেজোঽসৃজাতেতি"

৩। ক্বচিৎ প্রাণাদিকা—'স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধামিতি।"

৪। ক্বচিৎ অক্রমেণৈব লোকানামুৎপত্তিরাম্নায়তে—"স ইমান্ লোকান্ অসৃজতাম্ভো মরীচির্ম্মরমাপ" ইতি।

৫। ক্বচিৎ অসৎপূর্ব্বিকা স্থষ্টিঃ পঠ্যতে—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বা সদজায়তেতি"; "অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ সদাসীৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ"।

৬। ক্বচিৎ অসদ্বাদ-নিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে—"তদ্ধ্যেক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্যুপক্রম্য "কুতস্তু খলু সোম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি "সদেব সোম্যেদ মিদমগ্র আসীদিতি।

৭। "ক্বচিৎ স্বয়ং কর্ত্তৃকৈব ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে তদ্ধীদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ তন্নাম রূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে।"

অর্থাৎ প্রত্যেক বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্টি প্রক্রিয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে—

১। আত্মা হইতে আকাশ, এই প্রকারে আকাশাদি ক্রমে স্থষ্টি-কথা আছে।

২। কোন কোন বেদান্তে—তিনি তেজ স্থষ্টি করিলেন—ইত্যাদি ক্রমে তেজঃপূর্ব্বিকা স্থষ্টি উক্ত হইয়াছে।

৩। তিনি প্রাণ স্থষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ-পূর্ব্বিকা স্থষ্টি বিহিত হইয়াছে।

৪। কোথাও বা যুগপৎ সৃষ্টির কথাও আছে। যথা—তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।

৫। অপর শ্রুতিতে অভাবপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে; যথাঃ—এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ বা অভাবাত্মক ছিল; পশ্চাৎ ইহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়াছে।

৬। কোন কোন শ্রুতি অভাববাদ নিষেধপূর্ব্বক সৎবাদের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন; যথা—কেহ কেহ বলেন এই সকলই অসৎ ছিল না। শ্রুতি এই কথার উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছেন, হে সৌম্য তাহা কি প্রকারে হইবে? কি প্রকারে অসৎ "অভাব" হইতে সতের (ভাবের) জন্ম হইবে? অতএব হে সৌম্য, এ সকল সৎই ছিল।

৭। এতদ্ভিন্ন অপর জাতীয় শ্রুতি আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে—এই সকল আপনা আপনিই হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের কর্ত্তা নাই। যথা—পূর্ব্বে জগৎ অব্যাকৃতি ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ নামের ও জগৎরূপের দ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ বিস্পষ্ট হইয়াছে।

শ্রীভগবদ্গীতাতেও এই ভাবাত্মক শ্লোক আছে, যথা :—

অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক জগৎকে অসত্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থাশূন্য ঈশ্বরশূন্য, অপরম্পরসম্ভূত বলিয়াই মনে করেন। ইহার অন্য কোন কারণ নাই—কেবল স্ত্রী-পুরুষগণের সংযোগ ব্যাপার হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকার বহুল অভিমতের কথা শ্রুতি পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই যে সাত প্রকার অভিমত প্রদর্শন করিয়াছেন,

বিশ্ব সম্বন্ধীয় নিখিল সিদ্ধান্ত এই সাত প্রকারের অন্তর্গত হইতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে হারবার্টস্পেন্সার Herbert Spencer) নিম্নলিখিত তিনটী অভিমত অবলম্বন করিয়া এতৎসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন,—

(১) স্বতঃ-বিদ্যমান (Self-Existent)

(২) স্বতঃ-সৃষ্ট (Self-created)

(৩) বহিঃকর্ত্তৃত্বের সৃষ্ট (Created by an external agency.)

আমাদের ভারতীয় বেদান্তীদিগের মধ্যে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য জগতের স্বতঃ-বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। সাংখ্য দর্শনকার কপিল এই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ নিত্য পরমাণু সমূহের সংযোগ বিশেষের দ্বারা ঈশ্বরই বিশ্ব সৃষ্ট করেন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্যে একটা সৃষ্টি-ক্রম আছে। সেই ক্রম কিয়ৎ পরিমাণে Darwinএর Evolution বা ক্রম-বিকাশ বাদের ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবগর্ভ। আমি তাঁহার দেব-সৃষ্টি, তির্য্যগ্-যোনি সৃষ্টি, মনুষ্য সৃষ্টি, তন্মাত্রসৃষ্টি প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিব না। কেননা তাহা হইলে এই বক্তৃতায় সাংখ্য দর্শনেরই আলোচনা করিতে হয়। আমি কেবল এস্থলে ইহাই দেখাইব যে সাংখ্যকার বলেন,প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি-কৃতই এই সৃষ্টি ;—ঈশ্বরপ্রযুক্ত নহে। প্রকৃতি আপন প্রয়োজনে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। পুরুষের মোচনই প্রকৃতি-প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ। সাংখ্যকারিকার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"আরভ্যতে ইত্যারম্ভ সর্গঃ মহাদাদিভূতরপ্রকৃতৈবা কৃতো নেশ্বরেন ন ব্রহ্মোপাদানেনাপ্যকারণঃ" অর্থাৎ মহদাদিভূতসৃষ্টি ব্যাপার প্রকৃতিকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে। ব্রহ্মও ইহার উপাদান নহেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সাংখ্য দর্শন এ স্থলে বেদান্ত মতের স্পষ্টতঃই প্রতিবাদ করিলেন। অথচ বিশ্ব-সৃষ্টি ব্যাপার যে অকারণ নহে তাহাও বলিলেন। অকারণ হইলে অত্যন্ত ভাব বা অত্যন্ত অভাব এই দুই ঘটে। চিৎশক্তির পরিণাম অসম্ভব। এই নিমিত্ত ব্রহ্মও বিশ্বের উপাদান হইতে পারেন না। ঈশ্বরও বিশ্বের কর্ত্তা নহেন। অথবা ভগবদ্গীতায় যে বলা হইয়াছে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" অর্থাৎ ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা রূপেও প্রকৃতি বিশ্ব সৃষ্টি করেন অথবা ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিও যে বিশ্বের কর্ত্রী, তাহাও নহে। কেননা নির্ব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব। প্রকৃতি স্বার্থে ও পরার্থে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। সাংখ্য দর্শন এই প্রকারে বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ, পাতঞ্জলাভিমত ঈশ্বরাধিষ্ঠিত-প্রকৃতিবাদ ও নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। যদি বল যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সর্ব্বার্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন এই জগতের সৃষ্টি অসম্ভব। এইরূপ অভিমত-নিরাকরণের জন্য সাংখ্যকার বলিতেছেন,—"বৎসবিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা, প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য, পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।" অর্থাৎ যেরূপ অচেতন গাভীর স্তনদুগ্ধ বৎস-বৃদ্ধির জন্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ অচেতন প্রকৃতিও পুরুষমোচনার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি ব্যাপার সাধনের জন্য ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এই কারিকার উপরে শ্রীমৎ বাচস্পতি মিশ্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রের ৫ম সূত্র এই যে, "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্"। অর্থাৎ অশব্দ প্রধান জগতের কারণ হইতে পারে না। কেননা একেত প্রধানের চেতনা নাই এবং শ্রুতিতেও প্রধানকে জগৎ কর্ত্তা বলা হয় নাই। প্রত্যুত সৃষ্টি যে ইচ্ছা পূর্ব্বিকা ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সুতরাং প্রধানের জগৎসৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণের বক্তব্য

এই যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে জগতের কর্ত্তা তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? তোমরা ঈশ্বরকে কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছ। তন্মধ্যে একটী বিশেষণ "অবাপ্তসকলকাম"। অর্থাৎ তাঁহার কোন কামনা নাই। যদি তাঁহার কোন কামনা না থাকে, তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার প্রয়োজন কি? যদি বল কারুণ্যই এই প্রবৃত্তির মূল, তাহাও বলিতে পার না। কেন না সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবদিগের ইন্দ্রিয়-শরীর-বিষয়ের উৎপত্তি থাকে না। সে অবস্থায় জীবের দুঃখ হয় না। তাহা হইলে কাহার দুঃখ-মোচনের জন্য কারুণ্যের উদয় হইবে? আবার যদি বল ঈশ্বর করুণা প্রণোদিত হইয়াই জীবদিগকে সুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি কোনও জীব সুখী কোনও জীব দুঃখী এরূপ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কেবল কর্ম্ম-বৈচিত্র্য বশতঃ বিশ্বে এইরূপ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ কথাও বলিতে পার না। কেন না ভগবান্ ইচ্ছাময় এবং বিবেচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্যের কর্ম্মাধিষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার অনধিষ্ঠান মাত্র হইতে অচেতন কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং এ যুক্তিতেও দুঃখের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। ফলতঃ যে দিক দিয়াই দেখা যায়, বিশ্বোৎপত্তিতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহা অচেতন প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির সম্বন্ধে এবিষয়ে কোন দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতি অচেতন তাঁহার স্বার্থানুগ্রহ বা কারুণ্য তৎকার্য্যের প্রয়োজক হইতে পারে না। সুতরাং তৎকর্ত্তৃত্বে উক্তদোষ প্রসঙ্গের অবতারণা অসম্ভব। তবে পরার্থে প্রকৃতির প্রয়োজন স্বীকৃত হইতে পারে। যেমন বৎস-বৃদ্ধির জন্য গাভীর স্তন্যদুগ্ধের প্রবৃত্তি, প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ-বিমোক্ষণের জন্য-সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

অপর পক্ষে বেদান্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বিশেষতঃ এই সৃষ্টি-কার্য্যে

সর্ব্বত্রই যখন জ্ঞানবত্তার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, তখন জ্ঞানময় পুরুষ-শক্তি ভিন্ন এই অনন্ত কৌশলময় জগতের অচেতন কর্ত্তা হইতেই পারে না।

নৈয়ায়িকগণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ-কর্ম্মাফল্য-দর্শনাৎ"—চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ১০শ সূত্র হইতে ২১শ সূত্র পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের জগৎকারণত্ববাদ সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার পরের সূত্র হইতে উপযুক্ত কারণ ভিন্ন যে সৃষ্টি হয় না তাহার পূর্ব্বপক্ষ বিস্তৃত করিয়া অনিমিত্তবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের আলোচনা করিতে হইলে ন্যায়দর্শনের এই এই অংশের আলোচনা অতীব আবশ্যক।

জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বর অস্তিত্ব অনুমান এবং ঈশ্বরের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি সাধন, অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব দোষজনক। এ বিষয়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "ঈশ্বরানুমান" গ্রন্থে এবং উদয়নাচার্য্যের "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে যে অল্প আলোচনা করা হইয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিক Mansel ও Herbert Spencer প্রভৃতির আলোচনায় তাহা অংশতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। সেই সকল খণ্ডন-যুক্তি-নিরসনপূর্ব্বক ঈশ্বর-জগৎ-কর্ত্তৃত্ববাদ স্থাপন করা সুসঙ্গত। আমি অপ্রয়োজন জ্ঞানে এস্থলে Mansel, Herbert Spencer, John Stewart Mill এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ-বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অভিমত প্রদান করিতে নিরস্ত রহিলাম। কেন না, সে সকল আপনাদের সুপরিজ্ঞাত। ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বহুল সিদ্ধান্ত আছে আপনারা বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরকারণবাদে একটা কথা এই উঠে যে ঈশ্বর স্বার্থে কি পরার্থে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি তিনি স্বার্থ-উদ্দেশ্যেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া

থাকেন তবে সেই স্বার্থ কি ? কেহ বলেন, আত্ম সম্ভোগের জন্য ইহা তাঁহার লীলা-বিশেষ। ইহাতে আত্মসুখ এবং আত্মতৃপ্তি হইয়া থাকে। অথবা জগৎ-সৃষ্টির দ্বারা তিনি আত্মগৌরব প্রকাশ করেন। এই এই সিদ্ধান্তের দোষ এই যে জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরে আনন্দানুভবের অভাব ছিল। সৃষ্টির দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইল। অথচ শাস্ত্রে ঈশ্বরের যে সকল স্বরূপের বর্ণনা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে তিনি পূর্ণ এবং আপ্তকাম। তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যে স্পষ্টতঃই এই ভয়ানক অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে। ইহাতে তাঁহার অভাব ও অপূর্ণতা সূচিত হয়। সুতরাং পরার্থে কি স্বার্থে উভয় অর্থেই ভগবানের সৃষ্টি দোষাবহ হয়।* বেদান্তভাষ্যকারগণ যে "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" এই সূত্রের ভাষ্য করিয়া ভগবানকে দোষনির্ম্মুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা

* ফরাসী দার্শনিক পল্ জ্যানে (Paul Janet) তাঁহার Final Causes নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"If God has made the world for himself, it is evidently to enjoy it, to fiud His satisfaction and happiness in it, or else to glorify Himself........ ....But if it so whatever be the profit that God derives from the world—glory, disinterested joy, esthetic satisfactiou—it matters little : in any case, He was without that joy before he created the world. He created it to procure it. Thus he was deprived of something before the creation, and therefore He was not perfect.

. . . .

To suppose that God created the world for Himself, Is thus to attribute to Himself lack and privation,"

হিন্দুদর্শনে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষের ভোগের জন্যই ভগবান্ এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের মধ্যেও কোনও কোনও দার্শনিকের বা ধর্ম্মতত্ত্ববিদের মনে এরূপ ধারণা আছে। Janet তাঁহার

সে খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এমন মনে করা যাইতে পারে না। এস্থলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ হইতে আর একটি উদাহরণ দিতেছি। বেদে বলা হইয়াছে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ অর্থাৎ বিধাতা সূর্য্যচন্দ্রাদি সকলই পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিলেন। ফলতঃ নূতন কিছুই হইল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যাহা যেরূপ ছিল এখনও সেই সকল অবিকল সেইরূপই সৃষ্ট হইল।

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ Platoকেই এই মতের উদ্ভাবয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেদে যে ইহার বীজ আছে তাঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা নিম্নলিখিতরূপে ইহার একটী বর্ণনা করিয়াছেন।—

'According to this hypothesis, there would be in fact. in the Divine Intelligence, Types eternal and absolute. like God Himself in imitation of which he would have created the contingent and limited beings composing ihe universe. Every class of beings would have its model, its ideal. The Divine Intelligence would contain from all eternity an ideal, exemplar of the world . and not only of this actual world but according to Leibnitz of all possible worlds ; not only genera and species, but individual themselves wouid be

---

প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, "But we have already said how narrow such a doctrine is, that only sees man in the world, and refcrs everything to him. This *anthropocentric* doctrine, as it has been called, appears to be connected with the *geocentric* doctriue, that made the earth the centre of the world, ond ought to disappear with it."

(পূর্ব্ব ফর্ম্মায় Anthropoce.,tric স্থলে ভ্রমবশতঃ Anthropogenetic লিখিত হইয়াছে।)

eternally repre sented in God Thus the world would exist under two forms,—(1) an Ideal form in the Divine Nature. (z) under a concrete and real form outsid of God.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অভিমতকে Platonic exemplarism নামে অভিহিত করেন (Platonie Paradigms)। ইহা শ্রীভগবানের নির্ম্মাণ বুদ্ধি, নির্ব্বাচনশক্তি ও বিচার পূর্ব্বক সৃষ্টিবিধানের সিদ্ধান্ত বাধক। তিনি কেবল নকল মুহুরীর কার্য্যের মত (copyist) কার্য্য করেন। এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ঠিক যেন নকল করার একটি কেরাণী মাত্র হইয়া পড়েন।

বিশ্ব যেমন অনন্ত, বিশ্ব নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধি-বিচারও তেমনি অনন্ত। সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা মত আছে—কিন্তু স্রষ্টা একজন আছেন এবং তিনি অনন্তজ্ঞানী মঙ্গলময় ও সকলের উপাস্য,—ইহা ভক্ত এবং জ্ঞানি মাত্রেরই অবশ্য স্বীকার্য্য।

পরিণাম বাদ।

আমি আস্তিক্যবাদ-প্রদর্শনের জন্য এস্থলে সবিশেষরূপে পরিণাম বাদের কথা কিছু বলিতেছি। ইহা আমাদের ঋষিগণেরই মৌলিক গবেষণা। খুব ধীরভাবে ইহা শুনিতে হইবে।

জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিককগণের মধ্যে বহু প্রকার বাদ দেখিতে পাওয়া যায়। শাঙ্করিক মায়াবাদীদের মতে জগৎজ্ঞান, ভ্রমবিজৃম্ভিত-ভ্রান্তি-বিলাসমাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। ব্রহ্মই বস্তু; জগৎ অবাস্তব—মিথ্যা। ব্রহ্মবস্তুতে জগৎ অধ্যস্ত হয়। আর এক শ্রেণীর বেদান্তী বলেন, ইহা দুর্ব্বোধ্য। রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয়, সর্প বস্তু আছে বলিয়াই রজ্জুতে তাহার ভ্রম হয়, উহা অসম্যক্ জ্ঞানের

ফল। যে কখনও সর্প দেখে নাই—সর্প-বস্তু প্রত্যক্ষ করে নাই—তাহার পক্ষে তাদৃশ ভ্রম অসম্ভব। জগৎ জ্ঞানই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ব্রহ্মজ্ঞান,—শ্রৌত উপদেশের ফল মাত্র। জগৎ-জ্ঞান বিনাশ করিয়া তৎস্থলে ব্রহ্মসত্তার প্রতিষ্ঠান করা,—এক অস্বাভাবিক শিক্ষার বিকৃতজ্ঞান মাত্র।

আবার অপর পক্ষে সাংখ্যকারগণের প্রধানজগৎকারণবাদও তেমনই অচল। অচেতন প্রকৃতি দ্বারা কি প্রকারে এই বিচিত্র কৌশলময় জগতের সৃষ্টি হয়, ইহাও ধারণা করা যায় না। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকেও আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারি না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"

মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। এই মায়াও অতি দুর্জ্ঞেয়া। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও শাঙ্করিক বেদান্তের মায়া,—ঠিক একরূপ নহেন। সাংখ্যের প্রকৃতি নিত্যা, ভাবরূপিণী; শঙ্করের মায়া অনিত্যা, ভাবাভাবস্বরূপিণী, পরমার্থতঃ ইহার অস্তিত্ব নাই; আবার ব্যাবহারিক ভাবে ইহার অস্তিত্ব আছে। এই মায়া অজ্ঞানরূপিণী, তত্ত্বজ্ঞানের আবরিকা। চণ্ডীর মায়া, আবার আর এক স্বতন্ত্র বস্তু। তিনিও অজ্ঞেয়া কিন্তু মহাশক্তি-স্বরূপিণী। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে সাংখ্যের প্রকৃতি ও চণ্ডীর মহামায়া উভয়েই কর্ত্রী-স্বরূপিণী। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি-অজ্ঞানময়ী—চেতনাবিহীনা—এইনিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধান্তে সৃষ্টির অযোগ্যা। কিন্তু গীতা শাস্ত্রের প্রকৃতি,—ভগবৎপ্রকৃতি। পরা অপরাভেদে ভগবানের দুই প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ অধ্যক্ষ হইয়া অপরা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"।

গীতার সাংখ্যবাদে কাপিল সাংখ্যবাদের অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াটী সুপ্রণালীবদ্ধ। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অচেতনে চেতনের ভাব, ঈক্ষণভাব অসম্ভব। বিশেষতঃ উহাতে শ্রুতির সম্মতি নাই। প্রধান দ্বারা যে জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহা শ্রুতিসম্মত নহে। গীতাশাস্ত্র এই প্রতিবন্ধকতা সরাইয়া দিয়া ভগবৎঅধ্যক্ষতার সাহায্যে প্রকৃতির সৃষ্টি-দক্ষতা হয়,—এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। গীতার সিদ্ধান্তে বেদান্ত ও সাংখ্য সৃষ্টি-ব্যাপারের সম্মিলন হইল। এখানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্তটীও বলা প্রয়োজনীয়। উক্ত গ্রন্থের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে :—

মহৎ স্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগত-কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ায় ঈক্ষণ॥
মায়া শক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥
সেই ত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান, প্রধান প্রকৃতি॥
জগতকারণ নহে—প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যথা করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণমূল জগৎ কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগল-স্তন॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ দণ্ড চক্রাদি উপায়॥
দূর হইতে পুরুষ করেন মায়া অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হইতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করেন সবাতে প্রবেশ॥ ইত্যাদি।

ইহাতে বহুল সূক্ষ্ম তথ্য সন্নিহিত হইয়াছে। একটুকু বিশদ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন। শ্রীভাগবতমতে বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন তিনরূপ প্রকল্পিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদের এই জগৎস্রষ্টা বিষ্ণু মহৎস্রষ্টা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি বিশ্বপুরবীজে বাস করেন বলিয়া পুরুষ। লঘুভাগবতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

"পরমেশাংশরূপেন যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ ইনি পরমেশ্বরের অংশ এবং প্রকৃতিগুণাবলম্বীর ন্যায় প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণাদিকর্ত্তা, এবং নানাবতারের কারণ,—ইঁহাকেই পুরুষ বলিয়া জানিবে। ইনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং জগৎকারণ; অবতারগণের আদি, মায়ার দর্শক। পুরুষের সম্বন্ধে এইটুকু এই স্থলে সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু বলিবার অনেক কথাই আছে।

এখন মায়ার কথাটা বলা যাউক। পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব

গোস্বামি মহোদয় মায়া সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। শ্রীভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ অনুসন্ধান করিলেও এই বিষয়ে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। পরমাত্মসন্দর্ভে যে স্থলে বহিরঙ্গাশক্তির আলোচনা করা হইয়াছে, সে স্থলে লিখিত হইয়াছে :—

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

এই মায়া শ্রীভগবানেরই ত্রিগুণময়ী শক্তি। শ্রীভগবান্ শব্দের অর্থ—স্বরূপভূত-ঐশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন পরমাত্মা। এতাদৃশ পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তিই মায়া। ইনি সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কারিণী।

এস্থলে "অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং" প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্যমতের প্রসিদ্ধ শ্রুতির কথাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে আরও একটা আথর্ব্বণী শ্রুতি আছে, তাহা এই যে :—

"সিতাসিতা চ কৃষ্ণাচ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম—মায়া দুরত্যয়া।"

শ্রীপাদ শ্রীজীব পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন এই মায়ার দুই অংশ। এক অংশের নাম গুণমায়া। ইহা নিমিত্তাংশ। অপরাংশ উপাদানাংশ, ইহা প্রধান বা দ্রব্যনামেও অভিহিত হইয়া থাকে। গুণাংশ জীবমায়া নামেও অভিহিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ অপরা ও পরা ভেদে তাঁহার দ্বিবিধ প্রকৃতির কথাই বলিয়াছেন। ভূমি জল প্রভৃতি আটটী অপরা প্রকৃতি—ইহাদের সমষ্টিই প্রধান নামে অভিহিত। অপর অংশ পরা প্রকৃতি—জীবভূতাংশ। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও এই দুই প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা :—

তয়োরেকতরোহর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানান্তন্যতমোভাবঃ পুরুষ সোঽভিধীয়তে॥

উভয়াত্মিকা পদের অর্থ করা হইয়াছে কার্য্যকারণরূপিণী। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেও এই ভাবাত্মক একটী শ্লোক আছে, শ্রীপাদ শ্রীধর তাহার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন;—"পরতো নিরুপাধের্বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ তে প্রাগুক্তে প্রধানং পুরুষ-শ্চেতি দ্বেরূপে অন্যে মায়াকৃতে।" সুতরাং প্রকৃতিও পুরুষ উভয়ই মায়া। এই উভয়াত্মক মায়ার বৃত্তি প্রদর্শ-নার্থ শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৩ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে যথা:—

"কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহ
স্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥"

সৃষ্টিব্যাপারে,—কাল—দ্যোতক (Starter), কর্ম্ম,—নিমিত্ত, (জীবের কর্ম্মই সৃষ্টির নিমিত্ত), এই কর্ম্ম যখন কালাভিমুখ হয়, এবং অভিব্যক্ত হয় তখন উহা দৈব, স্বভাব কর্ম্মেরই সংস্কার,—এই সকল বিশিষ্ট বস্তুই জীব। দ্রব্য—ভুত সূক্ষ্ম; ক্ষেত্র—প্রকৃতি; প্রাণ—সূত্র; আত্মা—অহঙ্কার; বিকার—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভুত—এই ষোড়শই বিকার; ইহাদের সংঘাতই দেহ; ইহারাই বীজপ্ররোহবৎ প্রবাহ, প্ররোহ, অঙ্কুর; দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, উহা হইতে অঙ্কুররূপই দেহ, ইহা হইতে পুনর্ব্বার দেহ; এইরূপে অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ হইয়া থাকে।

এই পদ্যটী হইতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মায়ার দুইটী অংশের বৃত্তি পৃথক রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন:—কালদৈবকর্ম্মস্বভাব ইহারাই নিমিত্তাংশ। অপর পক্ষে অন্যান্যগুলি উপাদান—এই উভয় লইয়াই

জীব। জীবোপাধিলক্ষণে যে অহং ভাবটী আছে ইহা অবিদ্যারই পরিণাম।

মায়ার এই নিমিত্তরূপাংশের আবার দুইটী বৃত্তি—একটী বিদ্যা অপরটী অবিদ্যা। মায়ার এই বিদ্যা অংশ—স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষের প্রকাশ সম্বন্ধে দ্বার মাত্র—কিন্তু নিজে স্বরূপ শক্তির বৃত্তি নহে।

আবার অবিদ্যা অংশের বৃত্তিও দ্বিবিধ—আবরিকা ও বিক্ষেপিকা। মায়ার নিমিত্তাংশে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া শক্তির বৃত্তি সমূহ বর্ত্তমান থাকে। ইহাই প্রধানের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে নিয়ামিকা শক্তি বা Ruling, directing and guiding procces। আপনারা, এই কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রস্তাবিত পরিণামবাদের ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিবেন, এবং মায়া যে নিরেট জড়া নহেন তাহারও সংবাদ ইহাতেই প্রাপ্ত হইবেন।

আপনাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে Pantheism ও Panentheism প্রভৃতির ভাব দেখিয়া কটাক্ষপাত করেন তাঁহারা বৈষ্ণব-দর্শনের সূক্ষ্মতথ্যালোচনার তাৎপর্য্য প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে বুঝিতে পারিবেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় কত সাবধান হইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীজীবকৃত পরমাত্মসন্দর্ভে মায়া যে প্রকারে আলোচিত হইয়াছে, সেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যের—প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী শক্তিময়ী বটে,—(প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা সা প্রকৃতিরেবেত্যর্থ :—মূল প্রকৃতি কিশ্বস্ত সা মূলং নতু তস্যাঃ মূলান্তরমপ্যস্তি)।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে ইহার যে তাৎপর্য্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদি বিচিত্ররচনং জগৎ

প্রসূয়তে ইতি জন্মন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানমেব জগৎকর্ত্তৃকম্। অর্থাৎ একা সেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধা হইয়া পরিণামশক্তিদ্বারা বিচিত্রতাময় এই জগৎ প্রসব করেন। সেই প্রকৃতি ইহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। শ্রীচণ্ডীও বলেন "সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে" অর্থাৎ সেই মহামায়া দেবীই জগৎ প্রসব করেন। এস্থলে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের জগৎ-প্রসবিনী শক্তি (mysterious Force) উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু এই মহামায়া দেবী জড়রূপ প্রকৃতি নহেন।

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিজগৎকারণবাদে পরিণামকারিণী শক্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু তাদৃশ ভাবে পারণমিত করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। ইহাতে নির্ব্বাচনী শক্তির (Selective Power) ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রত্যেক নির্ব্বাচনী ক্রিয়াই জ্ঞানসাপেক্ষ। ইংরাজীতেও এ কথাটি আছে :—Every selection presupposes wisdom। শ্রুতিবাক্য-পরায়ণ বেদান্তিমাত্রেই সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্তের বিরোধী।

সাংখ্যবাদিগণ বলেন আমাদের সিদ্ধান্তও অশ্রৌত নহে। যেহেতু শ্রুতি বলেন :—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং" ইত্যাদি ত্রিগুণাত্মিকা অজা প্রকৃতিই এই শ্রুতির বাচ্য। ভগবৎশক্তি-অধিষ্ঠিতা হইয়াই প্রকৃতি—জগৎ প্রসব করেন, তাঁহার নিজের ঈক্ষণপূর্ব্বিকা সৃষ্টিশক্তি নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ অতি স্পষ্টরূপেই ইহা বলিয়াছেন অর্থাৎ আমার ঈক্ষণশক্তিসম্পন্না হইয়া প্রকৃতি সচরাচর বিশ্ব প্রসব করে :—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

শ্রীভগবদ্গীতার এই সিদ্ধান্তে সাংখ্যবেদান্তের সিদ্ধান্ত মীমাংসিত ও সম্মেলিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শ্রীজীবের ব্যাখ্যাত মায়া-সিদ্ধান্ত অতি অদ্ভুত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। মায়া যে নিরেট

জড়াশক্তি নহে, ইহা শ্রীপাদ শ্রীজীবের পূর্ব্বে এরূপ পরিস্ফুটরূপে অন্য কেহ বলিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু পরমাত্মসন্দর্ভে তিনি মায়ার উপাদানাংশ ও নিমিত্তাংশ উভয় অংশই স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। জড়রূপা প্রকৃতি জড়জগতের উপাদান, জীবদেহেরও উপাদান, কেননা উহা জড়া। কিন্তু জীবে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয় তাহাও মায়িক চৈতন্য। শ্রীচণ্ডীতে বলা হইয়াছে মহামায়াই জগৎকর্ত্রী। ইহাও শ্রীজীবের সম্মত। কেন না, এই বিশ্ব প্রসবিনী মহামায়া বৈষ্ণবী শক্তি—নারায়ণী।

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।"

ইহা খুবই সুসিদ্ধান্ত। ইহাতে জ্ঞানপূর্ব্বিকা বা ঈক্ষণপূর্ব্বিকা সৃষ্টির পূর্ণতা রহিল অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎবস্তুও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করার জন্য বলিয়াছেন—

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেহ তাহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তার জগত আধার॥
প্রকৃতি সহিত তার উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শ গন্ধ॥

এই মত ভাবাত্মক উক্তি শ্রীভাগবতেও আছে যথা।—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।"

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে:—

"ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।"
"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম॥"

শ্রীচরিতামৃতে ইহার যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই :—

আমিত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল প্রচার॥

জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে তো এইরূপ। এখানে দ্বৈতাদ্বৈতেরও অচিন্ত্যত্ব সপ্রমাণ হইল। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন কোন বেদান্ত ভাষ্যকার "জন্মাদস্য যতঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ ব্রহ্মকারণবাদের প্রসঙ্গ করিয়া সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। পরিশেষে জগৎব্যাপারটীকেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। যাহা, যাহা নয়—তাহাকে ভ্রমবশতঃ অন্যরূপ জানাই বিবর্ত্তজ্ঞান। যেমন রজ্জু সর্প নয় কিন্তু ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানাই বিবর্ত্ত জ্ঞান। এইরূপ এক ব্রহ্ম ভিন্ন পরমার্থভাবে আর কিছুই নাই, জগতেরও পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। সুতরাং জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মদর্শনই পারমার্থিক দর্শন। অজ্ঞানবশতঃ ইহাতে জগৎজ্ঞান অধ্যস্ত বা অধ্যারোপিত হয়—এই জ্ঞান বিবর্ত্তজ্ঞান—"বিরুদ্ধভাবেন বিপরীত-ভাবেন বা বর্ত্ততে যৎ জ্ঞানং তদেব বিবর্ত্তজ্ঞানম্।" অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাবে বা বিপরীতভাবে যে জ্ঞান প্রকাশ পায় তাহাই বিবর্ত্ত জ্ঞান। এই বিবর্ত্তজ্ঞ্যানমূলক বাদই বিবর্ত্তবাদ। ইহারই অপর নাম মায়াবাদ। মায়াবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যগণের প্রকৃতিকারণবাদান্তর্ভূত পরিণাম-বাদ, বৈশেষিকগণের পরমাণুবাদ, নৈয়ায়িকগণের অসৎকার্য বাদাদি খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনসিদ্ধান্তিত অচেতনপ্রকৃতি জগৎকারণতা-বাদান্তভূত-পরিণামবাদ দোষসংস্পৃষ্ট হইলেও ব্রহ্মজগৎ-

কারণতা-বাদান্তর্ভূত-পরিণামবাদ-বিনাশে তাঁহার সবিশেষ উত্থান দৃষ্ট হয় না।

শ্রীচরিতামৃত আমরা এই পরিণামবাদের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। যথা, আদির সপ্তমে—

বাসের সূত্রে কহে পরিণাম-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এই কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্তেতে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ২৩ সূত্রে (প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ") ভাষ্যে :—প্রকৃতিশ্চ উপাদান কারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যম্ নিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলম্ নিমিত্তকারণম্। কস্মাৎ ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।

ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্তকারণ এই উভয় বলাই উচিত। তিনি

কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন। প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধেই ব্রহ্মকে এই উভয় কারণ বলা কর্ত্তব্য।

ইহার পরের সূত্র "অভিধ্যোপদেশাচ্চ।" শ্রীমৎশঙ্কর বলেন, অভিধ্যোপদেশ হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মই উপাদান কারণ, ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ। "অভিধ্যোপদেশশ্চ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিত্বে গময়তি" "বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি,—"আমি বহু হইব।" তিনি আপন ইচ্ছায় বহু হইলেন। এই বহু হওয়াই প্রকৃতিতে পরিণত হওয়া।

ইহার পরের সূত্র—"সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ"। যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অন্তগত হয়, সে তাহার উপাদান। এই সর্ব্বসম্মত নিয়মে ব্রহ্মই জগতের উপাদান, প্রধান উপাদান নহে ইহাই শঙ্করের অভিমত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শঙ্কর এই ব্রহ্মোপাদান জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ সূত্রে যে "প্রকৃতিশ্চ" পদ আছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রকৃতিও ব্রহ্ম।

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তো তাহাই বলিয়াছেন,—"ভূমি জল প্রভৃতি আমারই অপরা প্রকৃতি, জীব আমারই পরা প্রকৃতি।" সুতরাং প্রকৃতিকে উপাদান বলিতে ক্ষতিই বা কি? সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বাকৃত হইয়াছে, তাহাতো অবশ্যই শ্রীভগবানের সম্মত। কিন্তু প্রকৃতি যদি ভগবানেরই প্রকৃতি হন, তাহা হইলেই তো সর্ব্ববিবাদেরই সুন্দর সামঞ্জস্য হয় এবং বেদান্তে যে প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে সেই প্রকৃতিকেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া হয় না।

আমরা শ্রীভগবানের সিদ্ধান্তই ভাল বুঝিতে পারিতেছি। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীজীব পরমাত্মসন্দর্ভে আরও পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন। সুতরাং পরিণামবাদই যে শ্রুতির অভিপ্রেত, এতদ্দ্বারা ইহাই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীপাদ রামানুজ এই পরিণামবাদই প্রচারিত করিয়াছেন।

শ্রীচরিতামৃতের উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও পরিণামবাদেই সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামে বিকারের আশঙ্কা করিয়াছেন, সেই আশঙ্কায় তিনি বিবর্ত্তবাদেরই প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আশঙ্কা এই যে পরিণমিত হইতে হইলেই বিকৃত হইতে হয়। পরিণামবাদে বিকারের প্রসঙ্গ হয় ইহাই আশঙ্কা। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে বিবর্ত্তবাদ তুচ্ছ; পরিণামবাদও সুষ্ঠু নহে। তিনিও বিকারের আশঙ্কা করেন। শ্রীপাদ রামানুজ আচার্য্য এ কথা অতি উত্তমরূপেই জানিতেন যে পরিণামে বিকারের আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাঁহার যুক্তি এই যে শ্রীভগবান্ অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার অচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্য-প্রভাবে চিদচিদ্‌বস্তুসমূহ বিপরিণমিত হয়, কিন্তু তাহাতে তিনি বিকৃত হন না। শ্রীচরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট-রূপেই তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায় অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা এই :—

নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ৪ অধ্যায় ৫২ শ্লোক।

শ্রীধরী টীকা—নিমিত্তমাত্রমিতি নিমিত্তমাত্রমবধানে সতি কারণাত্মনা স্থিতং সূক্ষ্মং বস্তু। পরিণামশক্ত্যৈব বস্তুতাং স্থূলরূপতাং নীয়তে। নিমিত্তাদ্ যদন্যৎ তৎস্থূলরূপ-পরিণামার্থং নাপেক্ষতে। যথা ধান্যাদি বীজেষু সূক্ষ্মাত্মনা স্থিতমঙ্কুরাদি পর্জ্জন্যে সতি স্বপরিণাম-শক্ত্যৈব তথা পরিণমতে তদ্বৎ॥ অর্থাৎ কারণরূপে স্থিত সূক্ষ্মবস্তু পরিণামশক্তি দ্বারা (By the gradual process of evolution) বস্তুতা (স্থূলরূপতা

প্রাপ্ত হয়। বস্তুর দুইটী কারণ আছে,—নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্ত হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা স্থূলরূপ পরিণামের অপেক্ষা করে না। যেমন ধান্যাদির বীজসমূহে সূক্ষ্মাত্মরূপে স্থিত অঙ্কুরাদি,—বৃষ্টি হইলেই স্বীয় পরিণাম শক্তি-দ্বারা ধানগাছরূপে আপনি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, জগৎসৃষ্টিও সেইরূপ।

আবার দ্বিতীয় অংশে সপ্তম অধ্যায়ে যথা :—

বীজাদ্বৃক্ষপ্ররোহেণ যথা নাপচয়স্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা ॥ ৩৫
সন্নিধানাদ্ যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ
তথৈব পরিণামৈব বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৬
ব্রীহি বীজে যথামূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৭
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যাঁন্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতু সামগ্রামাসাদ্য মুনিসত্তম ॥ ৩৮
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥ ৩৯

৩৬শ শ্লোকের টীকা :—সর্ব্বকারণস্যাপি হরেনির্ব্বিশেষত্বং দৃষ্টান্তেনাহ। সন্নিধানাদিতি উপাদানত্বমপি হরেঃ প্রকৃতিদ্বারৈব ন স্বরূপেণেতি ভাবঃ।

সর্ব্বকারণ হরি নিজে নির্ব্বিকার হইয়াও প্রকৃতিরূপে জগতের উপাদান হন। এই প্রকৃতিরই পরিণাম হয়, কিন্তু তদীয় স্বরূপের পরিণাম হয় না।

শ্রীপাদ শ্রীজীব পরমাত্মসন্দর্ভে এই পরিণামবাদ সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বাক্য বলিয়াছেন এখানে তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :—

"তস্মান্নির্ব্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি,—চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থ-প্রসবলৌহচালনাদিবৎ, তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন "শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাদিতি" ততস্তস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়াশব্দস্য ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়া ইতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব। তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তঃ।" অর্থাৎ পরমাত্মা নির্ব্বিকারস্বভাববিশিষ্ট হইলেও নিত্য অবিকৃত পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিশ্বাকার পরিণামাদি হইয়া থাকে। চিন্তামণি যেমন অবিকৃত থাকিয়াও রাশি রাশি স্বর্ণ প্রসব করে, চুম্বক (অয়স্কান্ত) যেমন অবিকৃত থাকিয়াও লৌহাদি প্রচালিত করে, পরমাত্মা অবিকৃত থাকিয়াও সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্ব প্রকটন করেন। মহর্ষি বাদরায়ণ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এই সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৫, ২৬ ও ২৭ সূত্রে পরিণামবাদের বহুল আলোচনা দ্রষ্টব্য। এই সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা সবিশেষ আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল সূত্রের শাঙ্করভাষ্য ও শ্রীরামানুজভাষ্য মনোযোগসহ পাঠ করিবেন।

পরমাত্মার যখন তাদৃশ শক্তি বর্ত্তমান আছে, তখন প্রাকৃতবৎ মায়া শব্দের ইন্দ্রজালবাচক অর্থ গ্রহণ করা এস্থলে যুক্তি সঙ্গত নহে। এখানে মায়া শব্দের নিরুক্তি এই যে "মীয়তে" অর্থাৎ ইহা দ্বারা (বিশ্ব) নির্ম্মিত হয়—এইরূপ নিরুক্তিতে মায়া শব্দটা বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচকরূপেই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং বিশ্ব যে পরমাত্মার পরিণাম—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ভগবৎসন্দর্ভেও এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।

তিনি অতঃপরে আরও লিখিয়াছেন :—"তত্র চ অপরিণতস্যৈব

সতোঽচিন্ত্যশক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রাবভাসমানস্বরূপ-ব্যূহরূপ-দ্রব্যাখ্য-শক্তিরূপেণ পরিণমতে ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ।" অর্থাৎ নিত্য সত্য পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই বিশ্বরূপ পরিণাম। সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপের সন্মাত্র বলিয়া অবভাসিত দ্রব্যাখ্য-শক্তিরূপেই এই পরিণাম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্বরূপের পরিণাম হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন চিন্তামণি ;—চিন্তামণি নিজে বিকৃত হয় না কিন্তু ইহার শক্তিবিশেষেরই পরিণাম হইয়া থাকে। অর্থ এই যে পূর্ণভগবৎস্বরূপের যে সত্তা,—দ্রব্যাখ্যা শক্তিরূপে অবভাসিত হয়. সেই স্বরূপ-ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য শক্তিরই পরিণমন হইয়া থাকে।

এই সিদ্ধান্ত.—শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর উপরি-উক্ত ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি-মাত্র। দ্রব্যাখ্যশক্তি শ্রীভগবানেরই সন্ধিনী শক্তির প্রকারান্তর। ব্রহ্মই যখন বিশ্বের উপাদান কারণ, তখন ইহা গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; উহাই দ্রব্যাখ্যশক্তি। শ্রীপাদ শ্রীধর যে স্বপরিণাম-শক্তি বলিয়াছেন, আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও তাহার সন্ধান পাই। ইংলণ্ডের পরলোকপ্রাপ্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত James Tyndall ১৮৭৪ সালে তদীয় Belfast Address নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

The principle of every change resides in matter. In artificial production, the moving principle is different from the material worked upon. But in Nature, the agent works within by the most active and mobile part of the material itself.

অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের শক্তি সেই পদার্থেই বিদ্যমান থাকে। কৃত্রিম সৃষ্ট পদার্থে, পরিবর্ত্তন-সাধিনীশক্তি সেই পদার্থ হইতে অন্যত্র ভিন্নভাবে

বর্ত্তমান থাকে কিন্তু প্রকৃতিতে উহা অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া উহার অতীব ক্রিয়াশীল ও চলিষ্ণু অংশদ্বারা পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকে।

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে, যে শ্রীপাদ শ্রীজীবোক্ত মায়ার দুই অংশই সত্য। এক অংশ নিমিত্ত অর্থাৎ অন্তর্য্যামিপরিণামশক্তি-সাধক,—আর এক অংশ উপাদান। এই উপাদানই জগদাকারে পরিণত হয়। তিনি আরও বলেন, মায়াখ্যা পরিণামশক্তি দ্বিবিধা। নিমিত্তাংশ মায়া—উপাদানাংশ প্রধান। ইহার মধ্যে কেবলা শক্তিই নিমিত্ত, এবং উহার ব্যূহময়ী দ্রব্যাখ্য শক্তিই—উপাদান।

ফলতঃ ইহাদ্বারা সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ন্যূনতা পরিহৃত হইল, মায়াবাদের বিবর্ত্ততা খণ্ডিত হইল, ব্রহ্মও কার্য্যকারণাদির অস্পৃষ্ট রহিলেন অথচ চেতনস্বরূপ অন্তর্য্যামীর প্রভাব মায়াশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া মায়াশক্তিই নিমিত্ত ও উপাদান-হেতু হইয়া পরিণাম ব্যাপারটাকে সুনির্ব্বাহিত করিলেন। ইহা দ্বারা অনায়াসেই ডারউইনের ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বৈজ্ঞানিক Evolution বা ক্রমবিকাশবাদের ব্যাখ্যা হইতেছে অথচ তাঁহাদের অনুপলব্ধ চিন্ময়ী অন্তর্য্যামিনী শক্তিপ্রভাবে পরিণমন-ব্যাপার যে জ্ঞানগর্ভ, তাহাও বুঝিবার সুবিধা হইল।

এস্থলে শাঙ্কর ভাষ্য হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাও প্রয়োজন। বেদান্ত দর্শনে একটী সূত্র আছে—"কৃৎস্ন প্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা"

অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ,—জগতের উপাদান। এ সম্বন্ধে কৃৎস্ন প্রসক্তি-দোষ অর্থাৎ নিরবয়বহেতু ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে জগৎ সম্ভাবনার জন্য দোষ ঘটে। যদি বল, ব্রহ্ম সাবয়ব, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে তাঁহাকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে তাহার আনর্থক্য হয় এবং সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের যখন অংশ নাই, তখন

আংশিক পরিণাম হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হয় যে সমগ্র ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই নষ্ট হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত একবারেই মূলোচ্ছেদী হইয়া পড়ে। তাহা হইলে ব্রহ্ম-সাধনার সকল উপদেশই ব্যর্থ হইয়া যায়। সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র ও তৎসংসৃষ্ট বিবিধ উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হয়। এই সকল দোষ-পরিহারার্থ ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিলে আবার সে পক্ষেও বহু দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ নিরবয়বত্ববোধক শ্রুতিগুলি নিরর্থক হয় অপিচ ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে তিনি অনিত্য হইয়া পড়েন।

ইহার পরের সূত্রে, ঋষি এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিয়াছেন। সে সূত্রটী এই :—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, অথচ জগৎ ব্যতিরেকেও ব্রহ্মের অবস্থান এই উভয়ই সত্য। শ্রুতি ইহাও বলেন ব্রহ্মের একাংশ জগৎ অথচ ব্রহ্ম নিরবয়ব। শ্রৌত প্রমাণ এই যে :—

> "তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
> পাদোস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"।

শ্রুতি আপাতবিরুদ্ধ দুইটি উক্তিই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিরবয়ব অথচ তাঁহার একাংশে এই বিশ্ব। শ্রীভগবান্ গীতাতেও ইহাই বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহমহং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। শ্রুতিই ব্রহ্মনিরূপণে একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ—ব্রহ্মনিরূপক নহে।

প্রত্যক্ষতঃও দেখা যায় মণিমন্ত্র-ঔষধাদির শক্তি বিবিধ দেশকালাদি নিমিত্ত বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে ; সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা যায় না। এ অবস্থায় অচিন্ত্য শক্তি ব্রহ্মেরস্বরূপ ভিন্ন শব্দপ্রমাণে জানা যায় না ইহা বলাই

বাহুল্য। যখন প্রত্যক্ষ দৃষ্টবস্তুর শক্তি অচিন্ত্য তখন কেবল শাস্ত্র মাত্র গম্য,ব্রহ্মের শক্তি যে অচিন্ত্য হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। স্মৃতি বলেন, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শাঙ্করভাষ্যের এই অংশের ভাব ও ভাষার অবিকল অনুবাদ করিয়া পরিণামবাদ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

ফলতঃ শ্রীপাদ শ্রীজীব,—শাঙ্করভাষ্য শ্রীরামানুজ ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় টীকা প্রভৃতির তাৎপর্য্যাবলম্বনে পরিণামবাদের যে উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত ভগবৎসন্দর্ভে বিশেষতঃ পরমাত্মসন্দর্ভে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত, অপরদিকে উহা তেমনই তাঁহার কুশাগ্রসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এস্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই উহার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

ডারউইনিজ্‌ম্ ও অভিসন্ধি-বাদ।

যিনি এই জগতের স্রষ্টা, জাগতিক কার্য্য দেখিলেই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জড়ীয় সৃষ্টি, উদ্ভিদ্ সৃষ্টি ও প্রাণি সৃষ্টি এই সকল সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই স্রষ্টার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্য, ও অনন্ত দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যে ইচ্ছা-শক্তি জ্ঞান ও প্রেম পরিলক্ষিত হয়, ইহা জড়দেহ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। জড় বস্তু চিরদিনই অচেতন। প্রীতি ও দ্বেষ চেতনারই ধর্ম্ম। জার্ম্মান্ বায়োলজিষ্ট ও ফিজিওলজিষ্ট হিকেল (Haeckel) জড়বাদী। তিনি দেখিলেন জড়পরমাণুতে চেতনার ধর্ম্ম রহিয়াছে, উহাতেও প্রীতির অনুরাগ (Desire) ও বিদ্বেষের বিরাগ (Aversion) রহিয়াছে, পরমাণুগুলি এক জাতীয় পদার্থের সহিত স্বতঃই মিলিত হয়, অপর জাতীয় পদার্থগুলিকে যেন ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। উহাদের

মধ্যেও চেতনা (Sensation) এবং ইচ্ছাশক্তির প্রভাব (Will) বর্ত্তমান আছে ; ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তথাপি ইনি জড়-বাদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবের উপদেশে এই সম্বন্ধে একটি সুসিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। কপিলদেব প্রথমতঃ পরমাণুর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু পরমাণুগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতে অসমর্থ। উহারা ভগবৎশক্তি-লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবান্ উহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া উহাদিগকে জগৎনির্ম্মাণের উপযুক্ত করিয়া তোলেন। দার্শনিক কপিল হইতে ভগবদবতার কপিলের সিদ্ধান্তে এই স্থলেই বিভিন্নতা। সাংখ্যদর্শনে জড়া প্রকৃতিকেই সৃষ্টি-সাধিকা বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তদর্শন সে সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই এই সৃষ্টির অন্তরালে যে অনন্ত জ্ঞান-ময় মহাপুরুষের শক্তি বিরাজমানা, তাহা কে না দেখিতে পায় ? বৃহ-দারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিগুলি প্রকৃতই জগৎতত্ত্বের সারার্থ-প্রদর্শিকা। সৃষ্টিতে জ্ঞানময়ী শক্তির বিদ্যমানতা না থাকিলে ক্রম-বিকাশ-বাদের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection), জীবন সংগ্রাম (Struggle for cxistence) বৈবিধ্য-সাধন (Variation) উপযোগীকরণ (adoptation) প্রভৃতি কোন কার্য্যই জড়া প্রকৃতি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারিত না।

আপনাদের এই সভায় ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তা ও গবে-ষণা-প্রসূত গ্রন্থ ও তৎসন্নিবিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ করা বাহুল্য। কিন্তু আপনারা এক ভাব লইয়া যে রূপ প্রমত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার অবসর বোধ হয় আপনাদের নাই। কিন্তু

সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতার অগ্রসর হওয়াই সুবোধ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

আমি এস্থলে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কতিপয় চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকের গবেষণা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। ১৮২৭ সালেরও পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ব্যারণ জি কুভিয়ার (Baron, G, Cuvier) Essay on the theory of the earth অর্থাৎ ভূতত্ত্ব-সন্দর্ভ নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ খানি পাঠে তৎসাময়িক পণ্ডিতগণ অনেক বিষয়ের চিন্তা করার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে সপ্রমাণ করেন—সৃষ্টি-ব্যাপার আকস্মিক (By chance) নহে,—উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। এই যে মানব দেহ—ইহার প্রত্যেক অঙ্গের সহিত অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে—উহাদের আকারে প্রকারে ভাবে ভঙ্গীতে কার্য্যে ও ব্যবহারে সম্বন্ধের সামঞ্জস্য আছে। উহা যে অতি সুনিপুণ অনন্ত কৌশলী স্রষ্টার সৃষ্টি, তিনি সে কথা বিশেষরূপে না বলিলেও তাঁহার গবেষণাময়ী চিন্তাধারার সিদ্ধান্ত যে ঐরূপ, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে দৈহিক যন্ত্রের পরস্পর-সম্বন্ধ-বিষয়ে (Correlation of organs) আলোচনা আছে। উহার কাহারও আকার-প্রকার-ক্রিয়া-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দেহের অন্যান্য সকলগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সেইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে,—নতুবা দেহযন্ত্র অচল হইবে।

মনে করুন, কোন জন্তুর অন্ত্রাবলী (Intestines) সত্ত-মাংস পরিপাকের উপযোগী। এই অবস্থায় সেই জন্তুর অন্যান্য যন্ত্র কিরূপ হওয়া উচিত, স্পষ্টতঃই তাহার নিয়মবদ্ধ প্রণালী জীবরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে জন্তুর (হনুস্থি) চোয়ালের হাড় (Jaw-bone) এমন ভাবে গঠিত যে উহা দন্তোনিহিত প্রাণীগুলিকে চিবাইয়া ভক্ষণ করিতে

পারে, উহার নখগুলিকে অস্ত্রের মত হইতে হইবে যেন তদ্দ্বারা উহ বধ্য জন্তুকে আক্রমণ করিতে পারে এবং উহার মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারে, দন্তগুলিও তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য ; ইহা ছাড়া উহার দেহটী যাহাতে দৌড়িতে পটু হয়, এরূপ ভাবে উহা গঠিত হইতে হইবে, কেন না, খাদ্য জন্তু ধরিবার জন্য উহাকে দৌড়িতে হইবে, পরাক্রমের সহিত উহার উপরে লাফাইয়া পড়িতে হইবে—উহার অনুসন্ধানে ধাবিত হইতে হইবে ; প্রকৃতি উহার দেহটিকে এতগুলি কার্য্যের উপযোগী করিয়া গঠন করেন। উহার চক্ষু কর্ণ নাসিকাতেও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের এমন আধিক্য থাকিবে যেন সে দূরস্থ বধ্যপ্রাণীর দূরে থাকিয়াও তাহার সন্ধান পায়। এতদ্ব্যতীত তাহার আত্মগোপন করার এবং বধ্য-আক্রমণ করার কৌশল-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রকৃতি এই সংস্কার জ্ঞানও তাঁহার মস্তিষ্কে নিহিত করিয়া রাখেন। এই সকল নিয়মবদ্ধ প্রণালী প্রদর্শন করিয়া কুভিয়ার আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, দাঁতগুলির গঠন-অনুসারে কণ্ডাইল অস্থি, স্কেপুলা অস্থি এবং হাতের নখাদি গঠিত হয়, দেহের অন্যান্য অস্থি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদিও তদনুরূপ গঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃতির এই নির্ম্মাণ-কৌশল গবেষণার সহিত পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা কোন জন্তুর এক খানা অস্থি দেখিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গের নির্ম্মাণ-উপাদানের কল্পনা করিতে পারেন। কোন জীবের একটি অতি ক্ষুদ্রতম অস্থিসন্ধি (Apophysis) দেখিয়াই উহা কোন্ জাতীয়, কোন্ শ্রেণীর (Class, order, genus and species) তাহা ঠিক বলা যাইতে পারে।

কোন জন্তুর এক টুকরা ক্ষুদ্র অস্থি দেখিয়াও এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সেই জন্তুর আকার প্রকার আচার ব্যবহার ভাবভঙ্গী ও পানাহার প্রভৃতি সকল কথাই বলিয়া দিতে পারেন।

কুভিয়ার নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হউন, বা না হউন কিন্তু তিনি সৃষ্ট পদার্থে যে নিয়ম ও সৃষ্টি-প্রণালীর মধ্যে যে জ্ঞানময়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে জগতের অন্তরালে জগৎস্রষ্টা জ্ঞানময় পুরুষ অবশ্যই বিরাজমান।

কুভিয়ারের পরিলক্ষিত দৈহিক যন্ত্রের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়মের মত ডারউইনও দেহ-বিবৃদ্ধির পরস্পর-সম্বন্ধ-বিধায়ক (Correlation of growth নিয়মের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ডারাউইন বলেন আমাদের দেহ-যন্ত্রটি এমন ভাবে গঠিত, যে উহার কোন এক স্থানের বিবৃদ্ধি হইলে তদনুসারে ও তদনুপাতে সর্ব্বশরীরেই সেইরূপ বিবৃদ্ধি সংঘটিত হয়—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। রোগে ইহার অন্যথা হয়। জড় প্রকৃতিতেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। জড় জগতে, উদ্ভিদ্ জগতে ও জীবজগতে সর্ব্বত্রই সৃষ্টিসম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত সুনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। গরু রোমন্থন করে। এজন্য উহার আমাশয় (Stomach) এই শ্রেণীর অন্যজন্তু হইতে স্বতন্ত্র। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গরুর পদের খুর (Hoof) উহার আমাশয়ের সহিত সম্বন্ধসূত্রে গঠিত। দন্তের গঠন দেখিয়াই জন্তু বিশেষের করাঙ্গুলি নিচয় (Claws) এবং জঙ্ঘার গঠন কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যায়। হাঁসের পা জোড়া (Web-foot), উহার চঞ্চু চামচের মতই হইবে। উহাকে কাঁদায় চলিতে হয়, জলে সাঁতার কাটিতে হয়, এবং কোমল খাদ্যই উহার আহার্য্য। মাছরাঙ্গাপাখীর চঞ্চু সেরূপ হইলে চলেনা, মৎস্যই উহার আহার্য্য ; উহার চঞ্চু সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায়। এই সকল ব্যাপারই বিশেষ-বিশেষ নিয়মাধীন ; কিন্তু আকস্মিক নহে। তিল হইতেই তৈল হয়, বালুকা হইতে তৈল হয় না। কাদচিৎকত্ব নীতি (Chance) বৈজ্ঞানিক গণের অগ্রাহ্য। মেঝের উপর গ্রন্থমুদ্রণের টাইপগুলি ফেলিয়া রাখ, তাহাতে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ নির্ম্মিত হইবে

না। কম্পোজিটারগণ উহাদিগকে যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখে, প্রয়োজনমত অক্ষর নির্ব্বাচন ও অক্ষর যোজনা করে, পরে উহা মুদ্রিত হয়। নির্ব্বাচনী-শক্তিবিশিষ্ট কম্পোজিটার বা লিখিবার জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের কর্তৃত্ব ভিন্ন যেমন অক্ষর-বিন্যাস অসম্ভব, তেমনই জ্ঞানময় পুরুষের শক্তি ভিন্ন প্রাকৃত নির্ব্বাচনও (Natural selection) অসম্ভব। ডারউইন বাক্যতঃ স্বীকার না করিলেও তিনি যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাদের সকল অংশ সর্ব্বসম্মত না হইলেও যতটুকু সর্ব্বসম্মত—তাহাতেও নিয়ন্তার অস্তিত্ব অনুমান অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক দার্শনিকগণ ইহা হইতেও সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) স্বীকার করার যুক্তি প্রদর্শন করেন। মহামতি ক্যাণ্ট ইহাকে Physico-theological argument নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এই অভিসন্ধি-বাদের বিরোধী।

আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা ও রসনা এই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য 'নার্ভ' পদার্থের দ্বারা সাধিত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ে যে নার্ভগুলি আছে, তাহারা বস্তুতঃ একজাতীয়—সর্ব্বাংশেই একজাতীয় (Homogeneous) কিন্তু যে নার্ভ চক্ষুর কার্য্যের সহায়ক, তাহা আলোকে উদ্বোধিত হয়, অন্য কিছুতেই তাহার উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অপিচ যে নার্ভ কর্ণের কার্য্যে নিযুক্ত, তাহা আলোকের উত্তেজনায় একবারেই মৃতবৎ নীরব—আলোক বা অপর পদার্থ তাহার উপরে কোনও ক্রিয়া প্রতি-ফলিত করিতে পারেনা,—কেবল শব্দ দ্বারাই উহা উদ্বুদ্ধ হয়। এইরূপ নাসিকার নার্ভ কেবল গন্ধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে এবং রসনার নার্ভ কটু, অম্ল, মিষ্ট, তিক্ত, লাবণিক ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রসালদ্রব্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান জন্মায়। একই জাতীয়—একই প্রকৃতির নার্ভে

স্থানভেদে উদ্দীপনার বিভিন্নতা সাধিত হইয়া থাকে—এই রহস্য বাস্তবিকই অতীব দুর্জ্ঞেয় ও অচিন্ত্য।

যদি বল, আলোকই দর্শন-শক্তির উদ্বোধক, আলোক-সম্পাতই বাহ্য-বস্তুর জড়ীয় নিয়মানুসারে আমাদের চক্ষুর সৃষ্টি দর্শন ক্ষমতা জন্মায়। তাই বা কি করিয়া বলা যায়। কেণ্টকী পাহারের গূঢ়গভীর গহ্বরে অতীব অন্ধকারে জল থাকে—সেই জলে মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়—সে মৎস্য-গুলির অতি সুন্দর চক্ষু আছে, কিন্তু সেখানেতো আলোকের কোনও প্রবেশ নাই! সুতরাং জড়বাদের এই সকল সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, দেহ—ক্ষেত্র, জীব ইহার ক্ষেত্রী। জীবের দিদৃক্ষা বা দর্শন বাসনায় দর্শনেন্দ্রিয় জন্মে। এইরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই ইচ্ছাশক্তি, আত্মনিষ্ঠা।

মানব শিশুগণ জন্ম মাত্রই মাতৃস্তন্য চোষণ করিয়া দুগ্ধ পান করে—ইহা সংস্কার-জ্ঞান। গোবৎসাদিরও এই নিয়ম। কিন্তু জলেও এই শ্রেণীর জীব বাস করে, তাহাদের শিশুরাও স্তন্যপায়ী। কিন্তু জলেতো চোষণকার্য্য চলে না। কেননা চোষণ ক্রিয়াটা বায়ুর সাহায্যে নির্ব্বাহ হয়; উহা বায়ুক্রিয়া-মূলক (Pneumatic) সুতরাং জলে চোষণ ক্রিয়া অসম্ভব। কিন্তু কৌশলী সৃষ্টিকর্ত্তার এমনই বিধান যে, জলচর জন্তুদিগের শিশুগণ স্তনে মুখ দেওয়া মাত্রই উহাদের মাতার স্তনমণ্ডলের মাংসপেশী স্বতঃই সংকোচন করিতে থাকে,—তাহাতে শিশুর মুখ বিনাযত্নে স্তন্যদুগ্ধে পূর্ণ হয়।

পতঙ্গগণদ্বারা উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবিস্তারও এক অদ্ভুত ব্যাপার! এই সকলই রসিকশেখর সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত কৌশলী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের লীলা। আমি-তো এই বিশ্বব্যাপারে কেবল ভগবৎশক্তি ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাইনা।

শ্রীভগবানের সৃষ্টি-কৌশল সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যায়, ততই হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়। সিল্‌ফা (Silpha or Necrophorus Vespillo) নামক একপ্রকার পতঙ্গ আছে। ইহাদের স্বভাব এই যে যখন ইহারা ডিম্ব প্রসব করে, তখন উহারা ইন্দুর, ছুচো বা ভেকের মৃতদেহ খুঁজিয়া লয়, তৎপরে উহারা দলবলে ঐ মৃতদেহকে মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে অর্থাৎ উহার নীচ হইতে মৃত্তিকাগুলি ক্রমে ক্রমে তুলিয়া ফেলে, অবশেষে মৃতদেহটা যখন গর্ত্তে নিপতিত হয়, তখন উহার উপরে বালি ও মাটী প্রভৃতি ছড়াইয়া দেয়, এবং উহার উপরে উহারা ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া যখন স্ফুটিত হয় তখন ঐ সদ্যোজাত জীবগুলির পক্ষে ঐ মৃতদেহই উপযুক্ত আহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। উহারা ঐ মৃতদেহ আহার করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রীভগবানের সৃষ্টিরই এক অপূর্ব্ব কৌশল। পতঙ্গগুলি অবশ্যই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একার্য্য করে না। তাহারা সংস্কারবশতঃ মৃতজীবকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার উপরে ডিম্ব প্রসব করে। তাহাদের সন্তানগুলি জন্মগ্রহণের পরে কি আহার করিবে, কিরূপে জীবন ধারণ করিবে, তাহারা কখনও সে চিন্তা করিতে জানে না। কিন্তু মৃতদেহকে প্রোথিত করিবার জন্য তাহাদের সমাজস্থ সকলেরই সমবেত চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই কার্য্যের ফলে ভাবী বংশধরগণ জন্মমাত্রই আহার্য্য দ্রব্যের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বড় বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কারণ নাই। মানুষের পক্ষেও দেখা যায় মাতার গর্ভে সন্তান-সম্ভাবনা হইলেই স্তন বৃদ্ধি পায় এবং সেই স্তনের শোণিতগুলি পীযূষতুল্য দুগ্ধে পরিণত হইয়া থাকে। যাঁহার জীব—তিনিই জন্মের পূর্ব্বহইতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন।

তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, বৈষ্ণবগণ ভোজনাদির বৃথা চিন্তা

করিবেন না। কেননা বিশ্বম্ভর (বিশ্বং বিভর্ত্তীতি বিশ্বম্ভরঃ) যখন তাঁহাদের গুরু, তখন তাঁহাদের ভোজ্য দ্রব্যের আর চিন্তা কি? তিনি কি তাঁহার সাধকদিগকে উপেক্ষা করিবেন? শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি এই যে :—

ত্রিভুবনে কৃষ্ণ করে রেখেছেন অন্নসত্র,
যদি তাঁর আজ্ঞা হয় মিলিবে সর্ব্বত্র॥

নিম্নশ্রেণীর জীবদিগের মধ্যেও এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অত্যাশ্চর্য্য রূপে বিহিত হইয়া রহিয়াছে। উপরে যে পতঙ্গদের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রকৃতির কথা আরও কিছু শ্রবণ করুন। কোন স্থলে একটী উচ্চ যষ্টির অগ্রভাগে একটি ভেকের মৃতদেহ আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই পতঙ্গগণ সেই যষ্টির চারিদিকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতে করিতে মৃত্তিকাপিণ্ড ভেকদেহ পর্য্যন্ত উত্থিত করিয়া লইল। অতঃপরে আরও প্রচুর মৃত্তিকা তুলিয়া তুলিয়া ভেক-দেহটীকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া ফেলিল, তৎপরে নারী-পতঙ্গ উহার উপরে ডিম্ব প্রসব করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কাহার প্রেরণায়, কাহার মন্ত্রণায়, এই পতঙ্গদল অনাহারে অনিদ্রায় এই কার্য্য সাধন করে? ফলতঃ জগতের প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক প্রাণীতে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবৎশক্তি নিহিত রহিয়াছেন।

একশ্রেণীর কচ্ছপ আছে। উহাদের ডিম্ব প্রসবের বহুপূর্ব্ব হইতে উহারা কেমেন দ্বীপে যাত্রা করে। কেমেন দ্বীপ জামেকার নিকটবর্ত্তী। হন্দুরাস উপসাগর হইতে এই স্থান ৪৫০ মাইল দূরে। ঐ স্থানটীকে উহারা উহাদের ডিম্ব প্রসবের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করে এবং প্রসবের ঠিক সময়ে কেমেন্ দ্বীপে উপস্থিত হয়।

সুচতুর নাবিকেরা কম্পাসের সাহায্য ভিন্ন সুদুস্তর অসীম সাগর-পথে গমন করিয়া যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে সাহস করে

না, হয়ত পথিভ্রম হইয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট স্থলে না পৌছাইয়া জলযান অন্যত্র চলিয়া যাঁওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এই কচ্ছপগুলি অনায়াসে ৪৫০ পথ অতিক্রম করিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কেমেন্ দ্বীপে উপস্থিত হয়। ইহাদের পথিভ্রান্তি বা দিগ্‌ভ্রান্তি হয় না। শ্রীভগবান অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতেও অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি দিয়া রাখিয়াছেন। এক শ্রেণীর পক্ষী আছে তাহারা প্রতিবর্ষে একদেশ হইতে অন্যদেশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিয়া যায়, কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত উহারা অতিক্রম করে। কিন্তু সময় এমন ঠিক রাখে যে তাহা ঠিক গ্রহণ-গণনার মত অদ্ভুত হয়। এই শ্রেণীর পক্ষি-গণের গমনাগমনে পারস্য দেশের পঞ্জিকায় ঋতুগণনা হইয়া থাকে। ইহারা সহস্র সহস্র মাইল অতিক্রম করে, অথচ ঠিক তারিখ মত বহুদূরস্থ দেশে উপস্থিত হয়। পক্ষিগণের মধ্যে এইরূপ সময়-জ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামিত্ব সম্বন্ধে উপদেশ সহসাই হৃদয়ে উদিত হয়। যিনি বৃক্ষে থাকিয়া বৃক্ষকে অন্তর্য্যমিত (**Regulated**) করেন, যিনি মনুষ্যে থাকিয়া মনুষ্যকে অন্তর্য্যমিত করেন, যিনি পাখীতে থাকিয়া পাখীদিগকে অন্তর্য্যমিত করেন, অথচ যিনি এই সকল হইতে ভিন্ন, তিনিই পরমাত্মা। ফলতঃ সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি ভিন্ন এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একটী পরমাণুও কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা শাশ্বতভাবে তাঁহারই শক্তি জগতের অন্তরে বাহিরে—জীবের অন্তরে বাহিরে ক্রীড়া করি-তেছে। তাঁহাকে—কেবল তাঁহাকেই আমরা জগতে এবং জগতের অন্তরে বাহিরে দেখিতে পাই। কেন যে জড়বাদিগণ ও নাস্তিকগণ এই চিন্ময়ী শক্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, আমিত তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। অন্ধ অচল জড়ীয় শক্তিতে কি প্রকারে সচরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে?

বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অঙ্কুর হইতে ক্রমশঃ শাখা পত্রে বিস্তারিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে সেই বীজটী মহামহীরুহে পরিণত হয়। মূল হইতে সমগ্র শাখা ও পত্র-বিকাশের একটা প্রধান লক্ষ্য এই থাকে যে, বৃক্ষকে পুষ্পিত করিয়া সফল করা; সেইফলে আবার বীজের জন্ম হয়, এইভাবে বৃক্ষজীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়া উঠে। ফল হইতে সুপক্ক বীজ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া আবার উহা বংশ-বিস্তার করে। এই প্রকারে শ্রীভগবান্ বৃক্ষজাতির অস্তিত্ব জগতে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে আমরা দৃষ্টি করি না কেন, সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় মহান্ উদ্দেশ্য আমরা দেখিতে পাই। অচেতন মৃত্তিকা ও পর্ব্বত প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ্ অণু, জীবাণু, নানাবিধ প্রাণী এবং বিশিষ্টজ্ঞান ও প্রেমসমন্বিত মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল বস্তুর মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্ত নির্ম্মাণ-কৌশল, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক বস্তুই—এমন কি,—প্রত্যেক পরমাণুই ইহার সমুজ্জ্বল উদাহরণ। বলিব আর কত,—অনন্ত আকাশে মেঘমালা, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইহাদের সকলই শ্রীভগবানের অনন্ত অসীম গৌরবের পরিচায়ক। বনে বনে কুসুমকাননে-সর্ব্বত্রই তাহার প্রীতির সমুজ্জ্বল প্রকাশ বর্ত্তমান। ইহা দেখিবার জন্য বা বুঝিবার জন্য দিব্য চক্ষু বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। সহজ মানুষ সহজ চক্ষে ও সহজ জ্ঞানে এই তথ্য সহজেই বুঝিতে পারেন।

শ্রুতি বলেন "একো বহুস্যাং প্রজায়েয়"—"আমি এক হইয়াও প্রজননের জন্য বহু হই।" শ্রুতির এই উক্তিটি প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়। আপনারা হয়তো জানেন আলফ্রেড্ উইলিয়াম বেনেট্ একজন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ইনি ১৮৭০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর লিভারপুলস্থ ব্রিটিশ

এসোসিয়েশনের D সেকশনে The theory of Natural Selection from a Mathematical point of View এই নামে একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। ১৮৭০ সালের ১০ই নভেম্বরে সুবিখ্যাত Nature মাসিক পত্রে উহা মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে ইনি প্রাকৃত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বহুল অদ্ভুত বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। তন্মধ্যে লেপটালিস (Leptalis) নামক এক প্রকার পতঙ্গের কথা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি বলেন এই অদ্ভুত পতঙ্গ এ পর্য্যন্ত দশ লক্ষ ভিন্নভিন্নরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই লেপটালিস্ বংশীয় জীবগণ অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামেও পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভিন্নত্ব-সাধনের প্রক্রিয়া বহু প্রকার। বৈজ্ঞানিকগণ কুড়ি রকম প্রণালীরও অধিক সংখ্যক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহারা অনুকরণেও অত্যন্ত পটু। অনুকরণদ্বারাও ইহাদের বংশে বহুপ্রকার জীব উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতা-প্রণালীর মধ্যে স্পষ্টতঃই সূক্ষ্ম নিয়ম আছে—যিনি বিশ্বের অনন্ত ব্যাপারের নিয়ন্তা, তাঁহার নির্ম্মাণ-কৌশল-জ্ঞানের বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে গেলেও আমরা তাঁহার অনন্তত্বে আত্মহারা হইয়া পড়ি। এই অনন্ত সৃষ্টির অন্তরালে এক তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। স্থাবর অস্থাবর উদ্ভিদ চেতন অচেতন এই সচরাচর বিশ্ব কেবলই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। অন্যভাবে প্রকৃতির কার্য্য পর্য্য-বেক্ষণ করিলে প্রকৃতিতে দোষ-দর্শন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন ডেকার্টেসের ন্যায় চিন্তা করা যায় যে, তাঁহার অনন্তজ্ঞানের নিকটে আমার চিন্তা-শক্তি কিছুই নয়—My nature is extremely weak and limited while that of God is immeasurable incomprehensible and infinite—এই অবস্থায় আমি সহজেই বুঝিতে পারি—অনন্ত বিষয়ে অনন্তজ্ঞানে তাঁহার প্রভুত্ব; আমি তাঁহার

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি বুঝিব—তাঁহার সৃষ্টবস্তুর উদ্দেশ্য নিরূপণ করিয়া ভাল মন্দ বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

ডেকার্টেস্ বলেন—for it seems to me, it would be rash in me to investigate and undertake to recover the immense ends of God

বস্তুতঃ শ্রীভগবানের কার্য্যাবলী অনন্ত, অসীম ও অদ্ভুত। বিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃতিক কার্য্যে কিছু কিছু ত্রুটী দেখিয়া আমাদের এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ অপবাদ দিতে পারেন। আমি John Stnurt Mill-লিখিত Three essays on Religion নামক গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি অপবাদ দেখিয়াছি। তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া বড় বেশী কঠিন নহে। কিন্তু আমি সেরূপ বাদবিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। যিনি অসীম শক্তিশালী, ও অনন্ত জ্ঞানময় তাঁহার কার্য্যে কোন দোষ থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই অসীম অনন্ত জ্ঞানীর সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীভগবৎ-কার্য্যে এতাদৃশ দোষারোপ সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

এক শ্রেণীর তার্কিক আছেন, তাঁহারা বলেন মানুষ ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষের আকার ও মানুষের গুণ প্রভৃতি দ্বারা ভগবানকে সাজাইয়া তাঁহার উপাসনা করেন। ইহা কেবল মানুষের অলীক কল্পনারই ফল। তাঁহারা এই ভাবের নাম দিয়াছেন— Anthropomorphism অর্থাৎ মানবভাবাকারিত্ব। এই পদটী অপ-বাদরূপেই ব্যবহৃত হয়। জেনোফেনেস্ (xenophanes) তাঁহার এক কাব্যে লিখিয়াছেন, মর্ত্ত্যবাসী মানবেরা বিশ্বাস করে, দেবতাগণের মানু-ষের মত জন্ম হয়। তাহারা মানুষের মত ইন্দ্রিয়, স্বর ও দেহবিশিষ্ট। যদি

বলদ প্রভৃতি পশুর মানবের ন্যায় চিত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে বলদ,—ভগবানের মূর্ত্তি তাহার নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিত। কেন না, স্বকীয় জ্ঞান মতই ভগবদ্ধারণা জন্মে। ঘোটক ঘোটকের মত, গাধা গাধার মত এবং অন্যান্য পশুও তাহাদের নিজের মত ভগবানের মুর্ত্তি গড়িয়া লইত। (Aethiopians) ইথোপিয়ানগণ কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের নাক খাঁদা, তাহাদের দেবতাও খাঁদানাসাবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। থ্রেসিয়ানগণ তাহাদের নিজেদের আকার অনুসারে দেবতার আকার গঠন করিয়া লয়। এইরূপ ঐতিহাসিক ব্যাপার হইতে পরবর্ত্তী সময়ে অ্যানথ্রপোমরফিজম্ পদের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ কল্পনাবলে ভগবানকে নিজের রূপে আরোপিত করে, ইহা অ্যান্থ্রপোমরফিজম্। কিন্তু গ্রীকেরা যখন ভগবান্‌কে জ্ঞানময়, দয়াময়, সুনীতিময় ইত্যাদি মানবীয় নৈতিক বিশেষণে বিভূষিত করিলেন তজ্জন্য এই পদটীর নিন্দনীয়ত্ব থাকিল না। অ্যানাক্সাগোরাস্ গ্রীস দেশীয় একজন পণ্ডিত। ইনি ভগবানে বিশ্বশক্তি আরোপিত করায় এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সক্রেটিশ্ শ্রীভগবানকে ন্যায়পরায়ণ ও নীতিপরায়ণ বলিয়া প্রকাশ করেন। সেই অপরাধে হেমলক্ বিষ পান করাইয়া তাঁহাকে নিহত করা হয়। মানুষ সময়ে সময়ে ভাষা লইয়া শব্দ বিশেষের গৌরব মর্য্যাদার হানি করিয়া থাকে। মানুষের হৃদয়ে যে সকল উচ্চ প্রবৃত্তি আছে যেমন দয়া, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রীতি ইত্যাদি; এই সকল সদ্‌গুণ মানুষে আছে বলিয়াই ভগবানে এই সকল গুণ আরোপ করা যাইবেনা; আরোপ করিলে উহাতে অ্যানথ্রপোমরফিজম্ দোষ ঘটিবে এবং তজ্জন্য ভগবানকে ক্ষুদ্র করিয়া আনা হইবে, ইহা সুবিবেচনার কথা নহে। সকল দেশেই এক এক প্রকার উদ্ভট রকমের পাণ্ডিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় থিওডরপার্কার একজন

বড় পণ্ডিত ; ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞও বটেন। তিনি বলেন "ভগবান্ "চিন্তা করেন" এরূপ কথা বলিও না। ইহা বলিলে ভগবানকে মানুষের মত করিয়া তোলা হয়। কিন্তু ভগবান ভাল বাসেন থিওডোর পার্কারের মতে একথায় কোন দোষ হয় না। তিনি নিজেও বহুস্থলে এরূপ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। অপরপক্ষে মিঃ আরনল্ড্ এই দুই ক্রিয়া-পদের কোনটাকে ভগবৎ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে রাজী নহেন। তিনি এই উভয় পদেরই বিরোধী। কেরো নামক আর একটী পণ্ডিত বলেন ভগবান চিন্তা করেন ইহাও ঠিক, তিনি যে ভালবাসেন তাহাও ঠিক। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ভাবে তাহার উপরে এই দুই পদের আরোপ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অ্যানথ্রপমোরফিজম্ দোষদুষ্ট হইবে! বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রফেসার টিন্ডেলের এই বিষয়ে বড় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি ডারউইনের একটী বাক্যে ভগবৎশব্দ পাইয়া একেবারে বিচলিত হইয়া গিয়াছিলেন। ডারউইন্ ভগবানের হস্ত হইতে সমস্ত সৃষ্টির ক্ষমতা তুলিয়া আনিয়া তাঁহার কল্পিত Evolution বা ক্রম-বিকাশবাদের উপর সৃষ্টিতত্ত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন বিধাতা অবশ্যই আদিম ছাঁচ (Premordial form সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। ডারউইনের এই উক্তিতে বৈজ্ঞানিক টিনড্যাল্ ডারউইনের প্রতি দোষারোপ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

এখন কথা এই যে মানুষের মধ্যে যে সদ্‌গুণ আছে ভগবানকে সেই গুণে গুণান্বিত বলায় এমন কি অপরাধ হয় যে তজ্জন্য অ্যানথ্রপমরফিষ্ট বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে অবজ্ঞাত করা হইয়া থাকে। মানুষ চেতনাশীল। শ্রীভগবান্ সমগ্র চেতনার আধার, এখন মানুষের চেতনা আছে, এইজন্য ভগবান্‌কে চৈতন্যস্বরূপ বলা যাইবেনা,—বলিলে অ্যানথ্রপোমরফিজম্

দোষ ঘটিবে,—ইহা সর্ব্বসুবিচার-বিরুদ্ধ। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগুণময়। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে কোন সদ্‌গুণ আছে ভগবানে তাহা আরোপিত করিলে কেন যে দোষজনক হইবে তাহার সুসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এদেশে এসম্বন্ধে একটা বিচার আছে। একশ্রেণীর বেদান্তী বলেন ভগবান্ নির্গুণ। সুতরাং তাঁহাতে গুণের আরোপ করিলে প্রাকৃতত্ব দোষ ঘটে। সুতরাং তাঁহাকে নির্গুণ বলাই সুসঙ্গত। আমরা বলি, শাস্ত্রে তাঁহাকে অশেষকল্যাণগুণময় বলিয়া বলা হইয়াছে। অথচ তিনি যে নির্গুণ এরূপ উক্তিও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—,আবার "নির্গুণায় গুণাত্মনে" বলিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি ও দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান্ মীমাংসকগণ এস্থলে নির্গুণ পদের অর্থ করিয়াছেন "অত্র প্রাকৃত গুণ-প্রতিবেধার্থং নঞ প্রয়োগঃ" অর্থাৎ ভগবান্ গুণবান্ বটেন কিন্তু আমাদের মত প্রাকৃত গুণবান্ নহেন। তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি ও দেহাদি আছে বটে তাহা আপাতঃদৃষ্টিতে মানুষের মত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত, গুণাদি অপ্রাকৃত, জন্মকর্ম্মাদি ও দিব্য ; সুতরাং অ্যান্‌থ্রপোমরফিজম্ প্রভৃতি অপবাদ তাঁহাতে আসিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনে একটী সূত্র আছে যথা—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—লোকবৎ বটে, কিন্তু লৌকিক নহে। ইহাদ্বারা পাশ্চাত্যগণের প্রকল্পিত অ্যান্‌থ পোমরফিজম্ দোষ প্রত্যাহৃত হইল।

আপনারা রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক—ভগবান্ বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তাঁহার অধীনতা স্বীকারেও নারাজ। পৃথিবীর রাজার অধীনতা যেমন আপনাদের স্বাধীনতার বাধাস্বরূপ, স্বর্গের রাজার অধীনতা স্বীকারও তেমনি আপনাদের নৈতিক স্বাধীনতার (Moral freedom) হানিকারক—আপনারা চাহেন স্বরাজ ও অবাধস্বাধীনতা

(absolute freedom)। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি—আপনাদের এই উচ্চাভিলাষ অতীব ভ্রমাত্মক। স্বারাজ্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য আপনারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে প্রণালী গঠন করিয়াছেন, তাহা স্বাধীনতা-লাভের বা স্বারাজ্য-প্রাপ্তির অনুকূল নহে। রাজদ্রোহ ও নাস্তিক্য—ইহার একটিও মানুষকে স্বাধীনতা বা স্বারাজ্য প্রদান করিতে পারে না।

আমাদের মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরস্পরপ্রতিঘাতিকা যে সকল বাসনা,—সাগরের তরঙ্গের ন্যায় আমাদিগকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছে, প্রতিনিয়ত যে সকল বিদ্রোহসংগ্রাম আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রকে ব্যালাকৃলাভার অশান্তিময় রণ-ক্ষেত্র হইতেও ভীষণ অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছে—অনন্ত আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিতেছে—আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল অসার ভোগলালসার কামনায় পরিচালিত ও বিচালিত হইতেছি, সেই সকল কামনাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে আমাদের স্বারাজ্যই বা কোথায়, স্বাধীনতাই বা কোথায়? যাহারা অনবরত পাশব বাসনা-জালে, বাসনার লৌহনিগড়ে আবদ্ধ, রাজদ্রোহে তাহাদের স্বাধীনতা বা স্বরাজলাভের কোন্ সম্ভাবনা আছে? আমিতো আপনাদের এইসকল কথার কোনও অর্থই বুঝিতে পারিনা।

যদি খাটি স্বারাজ্য ও প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভই আপনারা আপনাদের জীবনের পুণ্যব্রত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে স্বগৃহশত্রু কামনা-বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হউন। কি প্রকারে হৃদয়-নিহিত স্বার্থসন্তান দুর্দ্দান্ত বাসনা-সংগ্রাম নিরস্ত করিতে হয়, (How to Silence the rebellion of Desires সর্ব্বাগ্রে সেই উপায়ের সন্ধান করুন। মানুষের দুঃখ উৎপত্তি হয় কেন? মনু বলেন :—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

সুতরাং পরাধীনতাই দুঃখের মূল। ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু পর কে, আপনই বা কে? ইহার ন্যায়সঙ্গত বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবেন—কেবল স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী রাজাই আমাদের পর নহে। কেবল তাহার স্বার্থ-প্রণোদিত বিধিব্যবস্থার অধীন হইয়া চলাই আমাদের দুঃখের হেতু নহে। ইহাতে আমাদের দুঃখের কারণ যে একবারেই নাই তাহা বলিতেছি না; কিন্তু সে দুঃখের পরিমাণ অতিঅল্প। উহা আমরা অনায়াসেই অগ্রাহ্যও করিতে পারি। কিন্তু আমাদের অত্যন্ত পর হইতেছে—হৃদয়স্থ অন্যায্য বাসনাসমূহ। নানাবিধ স্বার্থ বাসনা দিবানিশি আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। যাহা আপনারা দাসত্ব বলিয়া ঘৃণা করেন, স্বাধীনতার অবলোপী বলিয়া পরিহার করিতে প্রয়াস পান; সেই শত্রু—আপনাদের হৃদয়-নিহিত বাসনা। আমরা প্রকৃত পক্ষে রাজবিধির দাস নহি—আমরা দিবানিশি আমাদের বাসনার দাস। আমরা সাধে সাধে বাসনার লৌহ-নিগড় আপনাদের চরণে জড়াইয়া রাখিতেছি। (We have forged our own shackles) এই নিগড় হইতে আত্ম-বিমোচন করিতে না পারিলে আমাদের স্বাধীনতা লাভের আশা বিড়ম্বনা—স্বরাজলাভের বৃথা আশা কেবল মনেরই ছলনা। আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বারাজ্যলাভের উপায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে উপদেশ করিয়াছেন:—

এবং বুদ্ধেঃ পরংবুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

হে, অর্জ্জুন, তুমি এইরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া এবং মনকে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে বিনাশ কর। সঙ্কল্প-প্রভব অশেষ কামনাসমূহকে ত্যাগ করিবে, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত

করিবে, ধৃতি-গৃহীত বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে চিত্তকে বশে আনিবে—ইহাই স্বাধীনতা লাভের উপায়,—ইহাই স্বারাজ্যলাভের উপায়।

সাংখ্যজ্ঞানের একটি বিশিষ্টসিদ্ধান্ত ভগবদ্গীতাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষ নিজে কর্ত্তা নহে। প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হইতেছে। জীব সেই প্রকৃতিরই অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় হইয়া "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করিতেছে।

ইহা হইতেই জীবের পরাধীনতা—ইহা হইতেই জীবের দাসভাব (Slave mentality)। প্রকৃতি (Nature) নিজেই এক জীব-যন্ত্র (mechanism) সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির গুণরূপ ইন্দ্রিয়গণ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ "কলুর চোক বান্ধা বলদের মত" প্রতিনিয়ত জীবদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির এই সংযোগ-সম্বন্ধ-বিনাশ করিতে না পারিলে জীবের মুক্তি নাই, স্বাধীনতা নাই, স্বারাজ্য-লাভও নাই, ইহাই সাংখ্য-জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী সাংখ্য-জ্ঞানের প্রতিধ্বনি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্টও কপিলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world.—Abridged from Kant.

মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার আত্মার স্বারাজ্য-লাভ হইবে না এবং সে স্বাধীনতা-লাভেও সমর্থ হইবে না। নিজের দেহ, নিজের ইন্দ্রিয়, নিজের মন ইহারাও আমার স্ব-ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষুধাতৃষ্ণা, ও নিদ্রাদির ইচ্ছা অনবরত আমার স্বাধীনতার মস্তকে পদাঘাত করিতেছে—নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-

সুখ-ভোগবাসনা আমার নসিবদ্ধ (নাকে দড়ী বাঁধা) গাধা বা গরুর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রামিত করিতেছে। নানাপ্রকার অন্যায্য বাসনা অনবরত আমার স্বাধীনভাবের বিনাশ সাধন করিতেছে। এই যে আপনাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া আমি আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছি এই সময়ের মধ্যে বহুবার আমার কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উগ্রতা-প্রশমনের জন্য (for removing the irritation of the laryngeal mucuous membranes) আমাকে বহুবার কাশিতে হইয়াছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুস্থলে দুর্নিবার্য্য চুলকনা আমাদের দেহটাকে অতীব অস্থির করিয়া তোলে—উহা কি আমার স্বাধীনতার বিঘাতক নহে? দিবা নিশি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার স্বাধীনতা আমার স্বদেহস্থ সহস্র সহস্র জীবাণু দ্বারা ব্যাহত হইতেছে। ইহার উপরে রোগ আছে—শোক আছে,—ক্রোধ আছে, কামতো খুবই আছে। মান অভিমান ও যশো-লিপ্সার অসহ্য কণ্ডুতিতে আমাকে উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রামিত করিতেছে। অপর কথা কি—রাজনৈতিক ব্যাপারে সদস্যাদি-নির্ব্বাচনের সময়ে আমা-দিগকে যে কত লোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়—তাহা তো সর্ব্বদাই আপনাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে। স্বাধীনতা কোথায়?

আপনাদের দেখাদেখি অধুনা আমাদের শান্তিপ্রিয় ভারতবর্ষের সুকোমল-সরল-প্রকৃতি তরুণবয়স্ক নব যুবকের দল এখন freedom, freedom করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে প্রবীণ ব্যক্তিগণের কর্ণ ঝালাপালা করিয়া তুলিতেছে। আপনাদের তো,—যাহা হউক, কতকটা মানসিক ও দৈহিক বল আছে। কিন্তু ইহারা অসাময়িক অন্যের অনুকরণ করিতে যাইয়া ছিন্নাভ্রের মত উভয়-অবলম্বন-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

আপনারা অবশ্যই জানেন মহাভারত ভারতবর্ষের একখানা ঐতি-

-হাসিক গ্রন্থ। আপনারা উহাকে great Indian Epic আখ্যায় অভিহিত করেন। উহাতে বহুল সারগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশ আছে। উহা হইতে আমি আপনাদিগের নিকট একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি—

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসান হওয়ার পরে, মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হৃষীকেশ, আপনার কৃপায় আমরাতো নিখিল শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া স্বারাজ্য লাভ করিয়াছি। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন --মহারাজ, এখনও কিছুই করা হয় নাই—প্রকৃত শত্রু-জয়ের এখনও অনেক বিলম্ব আছে—স্বরাজ্য-লাভ তো দূরের কথা—সত্যবটে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষত্রিয়বলের প্রভাবে অনেকগুলি নরহত্যা-ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে—উহারা নাম মাত্র শত্রু। মহারাজ প্রকৃত শত্রুগণ আপনাদের মনোমধ্যে সগর্ব্বে বিরাজমান। কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও শত প্রকার অন্যায্য বাসনাই মানুষের প্রবলতম অন্তঃ শত্রু। ইহাদের উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারিলে, মানুষ কখনই স্বাধীনতা ও স্বরাজ্য লাভ করিতে পারিবে না। আপনি এখন সেই ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হউন।"

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অন্তঃশত্রু-বিজয়ের উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন উহাই যুধিষ্ঠিরের জীবনের-সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। মহোদয়গণ, এস্থলে আমিও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশেই চিত্ত-নিয়োগ করিতে অনুরোধ করি। আপনাদের ঐই শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিবে না—নিজেরা শান্তি পাইবেন না—জগদ্বাসী-দিগকেও শান্তি দিতে পারিবেন না—দৈত্যদানবীয় ভাব দৈত্যদানবীয়-ভাবেরই বৃদ্ধি করিবে; উহাতে জগতের মঙ্গল হইবে না। সামরিক লোকক্ষয়ে সকলদেশেই অসময়ে এমন অনেক সমুন্নত সুশিক্ষিত মানুষ

জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়েন, যাঁহারা জীবিত থাকিলে নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিতে পারিতেন। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ আপনাদের স্বপক্ষীয়ই হউন বা পর-পক্ষীয়ই হউন—প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর মনীষাসম্পন্ন মহাত্মগণ জগতের ভগবৎদত্ত কৃপানির্ম্মাল্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয়ঙ্কর যজ্ঞে ইহাদের বিনাশ জগতের এক মহাক্ষতি। অথচ ঘটনা স্রোতে উহা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জন-সাধারণের হৃদয়ে ঔদার্য্য ও প্রীতি স্থলে দুরন্ত দুর্দ্দান্ত বিদ্বেষ, পরশ্রীকারতা, হিংসা, দম্ভ দর্প, লোকক্ষয় বাসনা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এইরূপ নানাবিধ কারণে আমি আপনাদের বর্ত্তমান নীতি-প্রচারের (propaganda) সারবত্তা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারি না। বহুচিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, উহা জগতের হিতজনক নহে—প্রত্যুত অহিতজনক। হিংসা বিদ্বেষ, দম্ভ, দর্প, স্বার্থকলুষিত প্রভুত্ব-প্রিয়তা প্রভৃতিতে সমাজের হিত সাধিত হয় না। মানুষ সামাজিক জীব—সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে সকলের পক্ষেই ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। আমি কাহারও অধীনতা স্বীকার করিব না—কেবল নিজের অবাধ অসংযত প্রবৃত্তির অধীন হইয়া চলিব, ইহাতে সমাজ-বন্ধন, সংঘ-গঠন, যৌথব্যাপার প্রভৃতি মানব সমাজের সকল ব্যাপারই অচল হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আমেরিকার জনতন্ত্রের ছয় জন সুবিখ্যাত প্রেসিডেণ্ট্ ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এইরূপ শিক্ষায় কেবল ধর্ম্মনীতি বা রাজনীতির মূল সদুদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, সমাজনীতি এমন কি আমাদের সুখময় গার্হস্থ্য-নীতিও পদদলিত হয়। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিতেছে—পিতাপুত্রে, মাতায় কন্যার, শাশুড়ী পুত্রবধূতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় অনবরতই মনোমালিন্য ও অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তিই সমাজ হইতে

একেবারে তিরোহিত হইতেছে। আপনাদের এই বিপ্লব-তরঙ্গে ভারত-বর্ষেরও অনিষ্টের আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইতেছে।

আপনারা কৃপা করিয়া আমায় বলিবার যে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন তাহাতে আমি আমার একান্ত বিশ্বাস মতে অনেক কথাই আপনাদের সমক্ষে সরলভাবে প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান উত্তেজনার মধ্যে আমার কথাগুলি আপনাদের চিত্তে স্থান না পাইলেও, এমন সময় শীঘ্রই আসিবে যখন আমার প্রত্যেক কথাই আপনাদের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। শ্রীভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

—এই বলিয়া আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রোতৃবর্গ আমার বক্তৃতায় কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন না, অতীব ধীরভাবে সকলেই আমার কথা শ্রবণ করিলেন, এবং অতীব শ্রদ্ধা সহকারে ধন্যবাদ করিলেন। আমাকে এক সপ্তাহ-কাল বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমাগত সাতদিন নহে—এক-দিন পরে একদিন,—এইরূপ প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া সাতদিনে এই বক্তৃতা শেষ করিতে হইয়াছিল।

প্রজ্ঞাময়ি,—অতি সংক্ষেপে অথচ তোমার বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া বহুল অংশ ত্যাগ করিয়া এবং কোন কোন স্থানের ভাব বজায় রাখিয়া অথচ নূতন কথা সংযোগ করিয়া এই পত্রে মস্কাউনগরে আমার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় তোমাকে জানাইলাম। প্রতিদিনই সভাস্থলে বহুলোকের সমাগম হইত। ভারতবাসী যে এমন বিশুদ্ধভাবে রাসিয়াবাসীর ন্যায় রাসিয়ার শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন, ইহা কখনও তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই। ইহাতে নরনারীমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

যে দিন বক্তৃতা শেষ হইল সেদিন সকলের মনেই যে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারা আরও কিয়দ্দিবস আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন।

সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত না হইতেই সভার অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি বেরইফ্ (Beriakoff) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আজ এই মহাপুরুষোত্তমের বক্তৃতা শেষ হওয়ায় আপনারা সকলেই যে দুঃখিত হইয়াছেন তাহা আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সভার প্রতিনিধিরূপে আমি মহাত্মার নিকটে এই নিবেদন করিতেছি যে, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অনেকবার সাংখ্যদর্শনের কথা বলিয়াছেন। প্রাচ্য দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শনটী সবিশেষ প্রাচীন ও সুপ্রণালীবদ্ধ—বিশেষতঃ উহা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। এই সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে আমি বার্লিনে, সেণ্টপিটার্সবার্গে এবং ক্যাম্ব্রিজে অনেকবার কিছু কিছু শুনিয়াছি। গতকল্য আমাদের প্রাচ্য কমিটীতে (Oriental section) সকল সভ্যই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার নিকটে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষতথ্য শুনিতে হইবে। সুতরাং বুধবার বেলা দেড়টার পর হইতে মস্কাউ ক্রেমলিনে আবার ইহার বক্তৃতা আরম্ভ করার জন্য ইহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে, ইনিও দয়া করিয়া সম্মত হইয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষায় ইনি যেরূপ বিশদরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন তাহাতে ইঁহাকে আমরা আমাদের স্বদেশীয় সুহৃদ্ বলিয়াই মনে করিতেছি। আমরা আশাকরি আপনারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলেই ক্রেমলিন্ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন। সভার সম্পাদক চার্টকফ্ (Chertkoff) ইহার অনুমোদন করিলেন। নরনারীগণের মুখে আনন্দোল্লাসের চিহ্ন স্পষ্টতঃই পরিলক্ষিত হইল। অতপর আমি সাংখ্যদর্শনের ইতিবৃত্ত ও উহার

অন্তর্নিহিত তথ্য সম্বন্ধেও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করি। বাহুল্যভয়ে তাহার বিবরণ প্রকাশে বিরত রহিলাম।

আমি এই পত্রে একটা বিষয়ে খুব বেশী ভুল করিয়াছি। তোমাকে মস্কাউ সহর সম্বন্ধে কোন কথাই জানাই নাই। মস্কাউ নগরে এখ্‌টনী রায়ড (Ekhotny Ryad) নামক রাজপথের উপরে সেণ্টটমাস সপ্তাহে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়া থাকে কিন্তু আমার বক্তৃতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ক্রেমলিনের নিকট সুপ্রসন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন শীতের সময়; কিন্তু সূর্য্যের আলোক অপরিষ্কার ছিল না। অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল। এই সময়ে এদেশে চক্রহীন গাড়ীতে বিচরণ করিতে হয়, কেননা পথে হাঁটু পর্য্যন্ত গভীর বরফ পতিত হয়। মস্কাউ সহরটী কতকটা রাঁচি বা পালাকিমেডির ন্যায়। সর্ব্বত্র সমতল নহে, কোথাও নিম্নভুমি, কোথাও বা পাহাড়। পাহাড়গুলি তুষারমণ্ডিত। সূর্য্যকিরণসম্পাতে উহারা বড় সুন্দর দেখায়। উপত্যকার মত স্থান-গুলিতেও বরফ পড়ে। ষ্ট্রীটগুলি সুপ্রসন্ন। স্থানে স্থানে প্রায়শঃই বৃহৎ বৃহৎ পার্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পথের দুইধারের পাকা বাড়ী-গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ছোট ছোট ঘোড়াগুলি চক্রহীন গাড়ী (Sleigh) টানিয়া থাকে। শীতকালে এই শ্রেণীর গাড়ীগুলি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই সময়ে মস্কাউ নগরে গাড়ীর হল্লা শুনিতে পাওয়া যায় না। দরিদ্র লোকেরা মোটা কোট গায়ে দিয়া বেড়ায়। সকলের কোটেই কোমর বন্ধ থাকে। কোটের গলদেশ (collar) উচু, এই সকল কোট লোমজ দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। ধনী লোকেরা যে উত্তম কোট ব্যবহার করেন তাহার নাম—শুবা (shuba)। সকলের মস্তকেই লাল টুপি দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীলোকেরা মূল্যবান্ লাল বস্ত্রে এই টুপি নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতাতেও এইরূপ লাল তুর্কী টুপি দেখিতে

পাওয়া যায়। শুভ্রতুষারাস্তৃত পথে লালটুপি-পরিহিত অধিবাসিগণের দৃশ্য বড় মন্দ নহে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের পোষাক ও চ্যাপ্টা টুপি প্রায়শঃই শুবায় আচ্ছাদিত থাকে। ধনী ও দরিদ্র স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ অবস্থানুসারে বাঙ্গালীদের মত র‍্যাপার ব্যবহার করেন। মেয়েরা এদেশের অবগুণ্ঠনের মত র‍্যাপারে মস্তক আচ্ছাদন করেন। ব্যবসায়ী-দের দোকানে দোকানে সোনালী রঙের বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ড দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা রাসিয়ান অক্ষরে, কোথাও বা গ্রীক অক্ষরে সাইনবোর্ড লিখিত। বিদেশবাসীদের পক্ষে সে সাইনবোর্ড পড়া বড় সহজ নহে।

যদিও অধুনা বল্‌শেভিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু বহুকাল হইতে মস্কাউ নগরে ধর্ম্মমন্দিরের আধিক্য দৃষ্ট হয়। মন্দিরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। অধিকাংশ মন্দিরেই কল-কারখানার সমুচ্চ চিম্‌নীবৎ চুঙ্গী আছে। দেখিতে কতকটা আমা-দের জগন্নাথ মন্দিরের ন্যায়। এই সমস্ত চিম্‌নীর উপরিভাগের গুম্বুজ সোনালী রঙে শোভিত এবং সমগ্র চিম্‌নী লাল, সবুজ এবং পীতবর্ণে সুন্দরভাবে রঞ্জিত। উপরে সুনীল সুপরিষ্কৃত বিশাল গগন, নিম্নে শুভ্র তুষার-মণ্ডিত রাজপথ, সেই রাজপথের উপরে এই সকল সুরঞ্জিত সোনালী গুম্বুজবিশিষ্ট সমুচ্চ সুপরিষ্কৃত ধর্ম্মমন্দির বাস্তবিকই নগরের দৃশ্য-শোভা পরিবর্দ্ধক।

প্রাচীন মস্কাউ নগরের প্রাচীর দ্বার অতি বিশাল। এই দরজার প্রাচীরের বেধ ৩০ ফিটের ন্যূন হইবে না। এই সদর দরজা দিয়া সহরের ভিতরে প্রবেশ করিলে আর একটী মিলিটারী বা সামরিক প্রাচীর নয়নগোচর হয়, উহা সহরের কেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সহরের কেন্দ্রস্থানে ক্রেমলীন্ (Kremlin) নামক একটী দুর্গ

আছে। মস্কাউ নগরে এই দুর্গ অতি সুবিখ্যাত দৃশ্য। ইহার চিম্‌নীবৎ চূলীগুলি অতি সমুচ্চ ও সুরঞ্জিত; ইহার শিখরস্থ গুম্বুজ সোনালী রঙে রঞ্জিত। ক্রেমলীন্ দেখিতে কতকটা আমাদের জগন্নাথ মন্দিরের ন্যায়। ইহার ভিতরে বহু সুপ্রসর কামরা আছে। ইহারই চতুর্দ্দিকে নূতন ও প্রাচীন বহু ধর্ম্মমন্দির, বড় বড় প্রাসাদ, গবর্ণমেণ্ট আফিস বিদ্যমান। কোনটীর রং প্রস্তরের ন্যায়, কোন বাড়ী ইষ্টকের ন্যায় লাল। কোন কোন বাড়ী তুষারের ন্যায় শুভ্র এবং কোন কোন বাড়ী ফিকা নীলবর্ণ-বিশিষ্ট। মস্কাউএর সদর দ্বারে প্রবেশের পূর্ব্বে মস্তকের টুপী হাতে করিতে হয়, কেননা এই স্থানটী পবিত্র বলিয়াই প্রাচীন সময় হইতে লোকের সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। দেওয়ালে পিত্তলখচিত দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে।

এ সম্বন্ধে লিখিবার অনেক আছে। কিন্তু মস্কাউ নগরের বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নহে। সে অবসরও আমার নাই। বিশেষতঃ তাহাতে তোমারও কোন উপকার হইবে না। কেবল ইহাদের ধর্ম্ম মন্দিরের কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়াই এই কয়েকটী কথা এই পত্রে লিখিলাম। ধর্ম্মমন্দির অনেক আছে বটে, তাহার শোভা সংরক্ষণেও রুষগবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আছে কিন্তু ধর্ম্মকথা শুনিবার লোক খুবই অল্প। যদিও ইউরোপীয় রাসিয়ায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচলিত এবং রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মবিশ্বাসই অধিকাংশ লোকের ছিল, কিন্তু এখন কাহারও ধর্ম্মে তত আস্থা নাই। অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার আছে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের সনাতন নীতিবিষয়ে অনেকে অনভিজ্ঞ এবং সে সকল কথা শুনিতেও অনিচ্ছুক। কাউণ্ট টলষ্টয় খৃষ্টধর্ম্মের সনাতন নীতি জন-সমাজে প্রচারিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাইলাম। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বড় একটা নিদর্শন কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

যে সকল শিক্ষিত লোক আমার বক্তৃতা, উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মভাব অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তথাপি ভগবৎউপাসনা করা যে নরনারী মাত্রেরই একটী প্রধানতম কর্ত্তব্যকর্ম্ম তদ্বিষয়ে ইঁহাদিগকে যে উপদেশ করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তোমাকে জানাইতেছি—

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ণয় করিয়াছেন মানবাত্মার বৃত্তি তিনটী ;—ইচ্ছাবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তি। এই তিনটী বিভাগ আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত হইতে গ্রহণ করিলাম। তাঁহাদের ভাষায় বলিতে হইলে এই সকল শব্দের ইংরাজী অনুবাদ Volition, Intellect, এবং Emotion। আমি Emotion শব্দটীর বঙ্গানুবাদ হৃদ্‌বৃত্তি বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। বঙ্গভাষার লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে 'আবেগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; তাহাও হইতে পারে। Emotion এর আর একটী প্রতিশব্দ Feeling। ইহার বঙ্গানুবাদে বোধ হয় 'অনুভাব' শব্দটী ব্যবহৃত হইতে পারে। রসশাস্ত্রে ভাব অনুভাব, বিভাব ইত্যাদি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। Professor Bain সাহেবের Mental and Moral Science অথবা Will and Emotion গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝা যায়, ভাব, অনুভাব আদি Feeling বা Emotion এর অন্তর্গত। সুতরাং আমরা যদি ভাব, অনুভাব প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করি, তাহা হইলে বোধ হয় অর্থপ্রকাশের বিশেষ ব্যতিক্রম হইবে না। অপিচ অনুভাব শব্দের আর একটী পারিভাষিক ব্যবহার আছে। ভাব যখন দৈহিক ব্যাপারে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে অনুভাব বলা

হয়। যেমন আনন্দে বা ক্লেশে নয়নের জল পতিত হয়, ক্রোধে চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই সকল ব্যাপারকে Expression of feelings বলিয়া অভিহিত করেন। Dr. Bell এই সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার নাম Expression of Feelings। Professor Bainএর Mental and Moral Science নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। Psycho-physiology গ্রন্থমাত্রেই instinctive play of feeling বা অনুভাবের বহুল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সাহিত্য দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যাদর্শ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও অলস্কারকৌস্তভ প্রভৃতি গ্রন্থে ভাব, অনুভাব ও বিভাবের অতি বিস্তৃত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্বসমন্বিত সুবিচার দৃষ্ট হয়। তদনুসারে আমরা Emotion বা Feeling শব্দের অনুবাদে ভাবশব্দটীকেই ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু তথাপি উহা পরিভাষিক হইবে না। অনুভাব যদিও সাহিত্যে ভাবার্থেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু রসশাস্ত্রে ভাবের বাহ্যাভিব্যক্তিকেই (Play of feelings) অনুভাব বলা হয়। সুতরাং Emotion বা Feeling শব্দের অনুবাদে ভাবের পরিবর্ত্তে অনুভাব শব্দটী সুপ্রযুক্ত হইবে না। "অনু পশ্চাৎ সহার্থে চ" ইত্যাদি অনুশব্দের অর্থবিচার করিয়া অনুভাব পদের ব্যুৎপাদন করিলে প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভাবোদ্গমের পর দেহে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে যে ভাবের অভিব্যক্তি হয় তাহাই অনুভাব। তাহা হইলে আমরা Emotion বা Feeling শব্দের অনুবাদে ভাব শব্দটা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু রসশাস্ত্রে ভাবশব্দটী পারিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে কিন্তু এটী পূর্ব্বভাব। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ভাবের আর একটা লক্ষণ আছে। সেটা উত্তরভাব। যথা,—

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাবইত্যভিধীয়তে।"

অর্থাৎ অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয়বৃত্তি হইয়া আপনা দ্বারা সংবেদন যোগ্যদশা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে ভাব বলে। এই সকল বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে Emotion বা Feelingএর বঙ্গানুবাদে ভাব শব্দ প্রয়োগ করিলে অনুবাদ যথাযথ হয় কিনা তাহাও বিচার্য্য। এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিয়া আমি Feeling বা Emotion এর বঙ্গানুবাদে হৃদ্‌বৃত্তিপদটী প্রয়োগ করিলাম।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে ও সাহিত্যে হৃদয় অন্তঃকরণ, চেতনা, অনুভব, অনুভাব, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ এমন জড়িত ভাবে ব্যবহৃত হয় যে, আমরা সহসা উহাদের বিশিষ্টতা বুঝিতে পারি না। বিবাহের একটী মন্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে"।

অর্থাৎ পতি পত্নীকে বলিতেছেন, "আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয়কে বাঁধিয়া লইলাম।" এখানে হৃদয়শব্দটী Emotion বা Feelingএর ভাবোদ্যোতকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ হৃদয়ের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীরাধিকাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ, কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

শ্রীমৎ বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"হস্তৌ নিক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি জানামি পৌরুষং হি তে।"

এই প্রকার শত শত শিষ্টপ্রয়োগ দেখিয়া বুঝা যায় যে Feelingএর বঙ্গানুবাদে হৃদ্‌বৃত্তিপদটী বোধ হয় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

যাহা হউক, মনস্তত্ত্বের শব্দ বিচার এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। আমি প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া হৃদ্‌বৃত্তি পদটি আমাদের বক্তব্যবিষয় প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছি। মানুষের হৃদ্‌বৃত্তিতে কত ভাবের উদয় হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আলঙ্কারিকগণ এসম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছেন। রতি হর্ষ, ক্রোধ, শোক প্রভৃতি স্থায়ীভাব। ইহার উপরে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যুভাব, আলস্য, জাড্য, ক্রীড়া, অবহিত্থা, (আকার গোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুকতা, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি ও জাগরণ এই সমস্তগুলি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব নামে অভিহিত হইয়াছে।

ফলতঃ, আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির বৃত্তিগুলি আমাদের আত্মার বৃত্তিসমূহের অতি অল্পস্থান অধিকার করে। কিন্তু হৃদ্‌বৃত্তির প্রভাব, প্রসার ও প্রতিপত্তি অপর দুই বৃত্তি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিয়াছেন, "It is imagination that rules the world". ফলতঃ হৃদ্‌বৃত্তির ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতমা।

মানুষের হৃদয়ে যে সকল কুসুমকোমলা বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে প্রেমভক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা পিতামাতার প্রতি ভক্তি করি ; পত্নী ও সখা প্রভৃতির সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হই ; কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনী ও পুত্রকন্যাদিগকে স্নেহ করি। এ সকলই ভালবাসার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। মানুষের হৃদয় সদ্‌গুরুর সদুপদেশে যখন সাংসারিক

আত্মীয়গণের উপরেও আপাত অদৃশ্য কোন অতীন্দ্রিয় নিত্য সুহৃদের সন্ধান পায় এবং কুসুমকোমলা ভক্তি তাঁহাকে খুঁজিতে প্রয়াসিনী হন, তখন মানবহৃদয় সেই চিরমধুর চিরসুহৃদের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট মনের কথাও প্রাণের ব্যথা প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করে; উহাই প্রার্থনা নামে অভিহিত হয়। সুতরাং এই প্রার্থনা-ব্যাপার মানবহৃদয়ের অতি সমুন্নত সমুজ্জল স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশেষ। নিশীথে নীরব নির্জ্জনে সংসারের বিবিধ বিচিত্র ব্যাপার হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃদয় যখন হৃদয়েশ্বরের চরণতলে মুক্তভাবে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করে, সে ব্যাপার স্বভাবতঃই অতি সুন্দর, অতি মধুর; উহাতে হৃদয়ের ভাব অতি লঘুতর হয়, সাংসারিক দুশ্চিন্তায় কলুষিত ও বিদগ্ধ হৃদয় পবিত্র ও প্রশান্ত হয়। বাসনা-প্রপীড়িত দুর্ব্বল হৃদয়ে তড়িৎশক্তির ন্যায় নব বল সঞ্চারিত হয়। সাধকের বিষণ্নমুখ আনন্দময়ের আনন্দকিরণে সমুজ্জল ও সুপ্রসন্ন হয়। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ জ্যোতিতে তাহার মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হৃদয়ের ঘনীভূত আনন্দ, হিমাচলের তুষারের ন্যায় বিগলিত হইয়া যমুনা জাহ্নবীর ধারার মত নয়নপথে প্রবাহিত হইয়া সংসারের ত্রিতাপতপ্ত বক্ষকে সুশীতল করিয়া দেয়। দৈন্য-দারিদ্র্যের তীব্র পীড়না, গর্ব্বিত সমাজের দৃপ্ত গঞ্জনা, দুর্জ্জনের দুষ্ট তাড়না রোগশোকের দুর্ব্বিসহ যাতনা এবং স্বার্থ-লম্পটগণের কদর্য্য লাঞ্ছনা, এই সরলব্যাকুল আন্তরিক প্রার্থনায় তিরোহিত হইয়া যায়। চিরমধুর নিত্য-সখার সুধামধুর মুখচ্ছবি চিত্ত-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। তাঁহার এই মধুময়ী বাণী কর্ণযুগলে মধুধারা সঞ্চার করে। উহার অই ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সংসারের বিবিধ যন্ত্রণা চিত্ত হইতে দূরীভূত হয়। নব নব আশায় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়ী মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে আসিয়া দেখা দেয়; ভয় ও নৈরাশ্য তখন আর হৃদয়ে স্থান পায় না। পাপময়ী কুবাসনার হৃদয়ে প্রবেশ-দ্বার

একেবারেই সংরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রেমভক্তির-মন্দাকিনী-প্রবাহে সংসার-তাপের ভীষণ মরু, সহসা আনন্দের মহাসাগরে পরিণত হয়। প্রার্থনার এইরূপ মহাপ্রভাবের সহসা উদ্গমে উহার অমোঘ ক্রিয়াগুলি ইন্দ্র-জালের ন্যায় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল ক্রিয়া চির-স্থায়িরূপে ও শাশ্বতীরূপে সাধক-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধককে এই নশ্বর মর্ত্তজগতে অমর করিয়া তোলে; দুঃখদাবানলের মধ্যেও তাহাকে স্নিগ্ধশীতল জাহ্নবী-সলিলের সুখময় নিকেতনে সংরক্ষিত করে।

আমরা সংসারের জীব, নিরন্ত সংসারের দুঃখানলে সন্তপ্ত। বিষ্ঠা-কুণ্ডের কৃমিকীট যেমন নিরন্তর বিষ্ঠাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া উহার কদর্য্যতা অনুভব করিতে পারে না, আমাদের দশাও ঠিক তদ্রূপ। রোগের পরে রোগ, শোকের পরে শোক, দৈন্য দুর্ভিক্ষ, লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও দুর্ব্বাসনার তরঙ্গ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তথাপি আমরা মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করি না। ভগবৎ প্রার্থনায় যে নিত্য সুখশান্তি-লাভের অমোঘ উপায় পাওয়া যায়, তজ্জন্য একদণ্ডকালও ক্ষেপণ করার অবকাশ আমাদের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিবস হয়, তেইশ ঘণ্টা রাখিয়া দিয়া একঘণ্টা কালও কি ভগবৎ-প্রার্থনায় ব্যয় করিতে পারি না? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের সে বিষয়ে মতিগতির অত্যন্ত অভাব। আমাদের অবকাশ নাই, ইহা বলা অত্যন্ত মিথ্যা কথা।

যিনি আত্মার উন্নতি-সাধনের জন্য সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন, বহু বহু কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহার ভজনসাধনের সময়ের অভাব হয় না। দেহের অভাব পরিপূরণের জন্য যেমন দৈহিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা স্বভাবতঃই উদিত হয়, সেই প্রকার ভগবৎ চরণামৃতপিপাসু

আত্মারও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। আত্মা স্বাভাবিক অবস্থায় ভগবৎপ্রসাদ-প্রাপ্তির জন্য স্বভাবতঃই ব্যাকুল হয়; নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার চরণে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা বলিবার জন্য অধীর ও আকুল হইয়া উঠে এবং যতক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য সমুদিত না হয়, ততক্ষণ সাধকহৃদয়ে আর কিছুই ভাল লাগে না। আমাদের ঐহিক শরীরে সম্বন্ধে ও এই নিয়ম। সুস্থ সবল দেহ সময়মত ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল না পাইলে অতীব ব্যাকুল ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু আত্মার আবেগ দেহের আবেগ অপেক্ষা অধিকতর প্রবল।

এখন জিজ্ঞাসা এই যে তবে আত্মায় ভগবৎউপাসনার জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক না হয় কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। বহুজন্মসঞ্চিত অবিদ্যারূপ শ্লেষ্মার প্রগাঢ় ঘনীভূত আবরণে আমাদের আত্মার ভগবৎ-ক্ষুধার অনল (God-hunger) একরূপ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সে অনলকে পুনরায় সন্ধুক্ষিত করিতে হইবে, প্রজ্জলিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে আত্মার এ 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগের শান্তি হইবে না। উহার বিষময় ফল হইবে,—আত্মহত্যা। সে আত্মহত্যা এ জগতের আত্মহত্যার মত নয়। সাধারণ আত্মহত্যায় যে অপরাধ হয়, দীর্ঘ-কালের পরে সে মহাপাপ হইতে আত্মার সদ্‌গতি হইতে পারে। কিন্তু নিরন্তর ভগবৎসেবাবিমুখতা-জনিতা আত্মার অপোষণে আত্মহত্যা এক মহাভীষণ অপরাধ। নরনারী মাত্রেরই এবিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। চিকিৎসা কঠিন নহে, ঔষধও বিকট নহে; অথচ উপযুক্ত ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইলে উহা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে আশুফল প্রদান করে—ঠিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মত। প্রতিদিন কিছুকাল ভগবানের নাম জপ করা, নাম কীর্ত্তন করা ও সরল ব্যাকুল অন্তরে সকাম বা নিষ্কাম ভাবে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করা।

সকাম প্রার্থনা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের নিকট কামনাসূচক প্রার্থনা করেন না। কিন্তু বেদসংহিতায় যে সকল মন্ত্র আছে সেই সকল মন্ত্রের অধিকাংশই কামনাময়ী প্রার্থনা। বৈদিক যজমানগণ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের নিকট নিজেদের অভাব পরিপূরণের জন্য অতীব ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন। ইন্দ্রের নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা-সূচক বহুমন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতায় দৃষ্ট হয়। এইরূপ যজমানগণ আপন আপন কামনা-প্রপূরণের জন্য নিরন্তর সকাম প্রার্থনা করিতেন। এই প্রার্থনায় তাঁহারা সফলকাম হইতেন। ভীষণ নিদাঘকাল, আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, কৃষিকার্য্যের ভূমি তাপে তাপে ফুটিফাটা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সাহারার মরুর ন্যায় মাঠগুলি ধূ ধূ করিতেছে, শ্যামল তৃণের চিহ্নমাত্র নাই, গবাদি গৃহপালিত পশুগণ জল ও ঘাসের অভাবে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ঋষিগণ পর্জ্জন্য-যাগ আরম্ভ করিলেন। বৃষ্টিপাতের জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট সামগানের প্রার্থনামন্ত্র গীত হইতে লাগিল; আর তখনই দেখিতে দেখিতে রৌদ্রমূর্ত্তি শুভ্র আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার উদয় হইল। সে মেঘ সমস্ত আকাশকে ছাইয়া ফেলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বসুন্ধরার প্রতপ্তবক্ষ সাগরের দৃশ্য ধারণ করিল। ঋষিগণের প্রার্থনা সত্য সত্যই সদ্য সদ্য ফলবতী হইল।

আধুনিক বিজ্ঞান ইহা মানিবেন না। তাঁহারা বলেন প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ু বহে, আকাশে বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ বৃষ্টিরূপে ধরার বক্ষ পরিষিক্ত করে। মানুষের প্রার্থনায় প্রকৃতি বিচলিত হয় না, অথবা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম ভঙ্গ করে না। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত Professor Tyndal তাঁহার Fragments

of Science নামক গ্রন্থের Prayer and Natural Law নামক অধ্যায়ে অবিকল এই কথাই বলিয়াছেন। *

বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কিন্তু ঘটনা যখন মানব-সমাজের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন বিজ্ঞানের যুক্তিময়ী উক্তি কেবল বৃথা জল্পনাকল্পনাতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। Professor Tyndal এই ব্যাপারে অনর্থক, প্রাকৃতিক শক্তি-সংরক্ষণী-নীতির (The law of the conservation of energy) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ঐ নীতিটী টানিয়া আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা এই বিপুল ধরাধামে অতি ক্ষুদ্র জীব। তথাপি ইচ্ছা করিলে প্রাকৃতিক শক্তিসংরক্ষণী নীতির প্রতিকূলে অতি সহজ ইঞ্জিনীয়ারিং উপায়ে আলোক রেখার বিবর্ত্তন, কুজ্ঝটিকার মোচন, বায়ুর গতিপরিবর্ত্তন, পর্ব্বত শিখরে সলিলরাশি উত্তোলন করিতে পারি।

বৈজ্ঞানিকগণ এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের প্রার্থনা বুঝিতে পারে না এবং তদ্দ্বারা চালিত হইয়াও কোন কার্য্য করে না। তাঁহাদের একটা ধারণা এই যে জাগতিক কার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানময়ী কর্ত্তৃশক্তি বিরাজমানা আছেন, বিজ্ঞান এখনও তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণ প্রাকৃত বস্তুর অন্তরালে এক অন্তর্য্যামী জ্ঞানময় পুরুষের সত্তা অনুভব করিয়াছিলেন। "ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ সঃ বিষ্ণুঃ ; বিশতি বিশ্বং যঃ

* "Without the disturbance of a natural law, quite as serious as the stoppage of an eclipse, or the rolling of the river Niagara up the falls, no act of humiliation, individual or national, could call one shower from heaven, or deflect towards us a single beam of the Sun.

সঃ বিষ্ণুঃ।" শ্রুতি বলেন "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া যিনি ইহার প্রত্যেক পরমাণুতে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান তিনিই বিষ্ণু। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "অন্তর্য্যামী" প্রকরণে এ বিষয়ে অতি পরিস্ফুট আলোচনা দৃষ্ট হয়। Professor Tyndal কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তিসংরক্ষণী নীতির উপরে বৃষ্টি প্রভৃতির সৃষ্টিভার সন্ন্যস্ত করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনায় যে বৃষ্টি হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু আমরা বলি আর কিছুদিন পরে সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে প্রার্থনার দ্বারাও জলবায়ুর পরিবর্ত্তন, বৃষ্টিপাতন প্রভৃতি সম্ভাবিত হইবে। তখনও এইজন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু সেই প্রার্থনা ভগবানের নিকট না করিয়া Meteorological আফিসে প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিলেই নির্জ্জন দেশে জল প্রবাহিত হইবে। অনাবৃষ্টির সময় ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ হইয়া প্রতপ্ত বসুন্ধরার বিদীর্ণ বক্ষ উর্ব্বরত্ব শক্তিপ্রদায়িনী বৃষ্টিধারায় পরিষিক্ত হইবে। এখনও আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই সকল কার্য্যের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষা করেন নাই। যদি তাঁহাদের সে উপায় জানা থাকিত, তবে আমরা কখনও তাঁহাদের নিকট সে প্রার্থনা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। যাঁহারা ভগবানের নিকট বারিবর্ষণের প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস ও ভরসা আছে যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ইন্দ্রাদি বিভূতিসমূহ ঝড় বৃষ্টি উৎপাদন করার কৌশল ভালরূপেই জানেন। জীবের ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবানের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। বাঞ্ছাকল্পতরু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ জীবের সরলব্যাকুল যুক্তিযুক্ত কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিবেন কেন? প্রকৃত কথা এই যে ভগবানের অস্তিত্বে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকায় কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রার্থনার হেতুগর্ভতা বুঝিতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন আমাদের এই অধ্যুষিত জগতের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বস্তু ভিন্ন অদৃশ্য কোনও দেবশক্তির অস্তিত্ব নাই। তাঁহাদের এই নাস্তিকতাই অজ্ঞতার পরিচায়ক। মহাকবি সেক্ষপীয়র হ্যামলেটের মুখে যথার্থই বলিয়াছেন,—There are more things in heaven and earth, O Horatio, than are dreamt of in your philosophy"। স্যার অলিভার লজ্ একজন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তিনি লিখিয়াছেন, জগতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানসম্পন্ন জীব আছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিয়মে কার্য্য-শৃঙ্খলা সম্পন্ন হয়, আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমাদের নিজের ভাবে ও ব্যবহারের উপরেই যে কতকার্য্যতার নির্ভর করিতেছে তাহাও আমরা জানি না। ইহা অসম্ভব নয় যে, প্রার্থনা দ্বারা আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন জীবদিগের শক্তি উদ্রিক্ত করিয়া আমরা অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমাদের এই যত্নের শৈথিল্যে আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় বহুল সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি।*

এই সকল সকাম প্রার্থনার ফলের জন্য গৃহস্থগণ যে উপাসনাদি করিয়া থাকেন তাহাও অসঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। অসহায় অবস্থায় নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বালকবালিকাগণ যেমন পিতা-

* "We do not know the laws which govern the interactions of different orders of Intelligence, nor do we know how much may depend on our own attitude and conduct. It may be that prayer is an instrument which can influence higher agencies, and that by its neglect we are losing the aid of an engine of help for our lives and for the lives of others."

মাতার নিকট আব্দার করিয়া থাকে, জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিকট নিঃসহায় জীবের সেইরূপ প্রার্থনা অস্বাভাবিক নহে। ভগবৎবিভূতি ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বৈদিক যাগযজ্ঞসহ উপাসনায় বশীভূত হইয়া যে ফল-প্রদান করেন, তাহাও প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নহে।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড অতীব শৃঙ্খলায় রচিত, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পাইতে পারে এমন বিধানে গঠিত, প্রত্যেক পদার্থই প্রত্যেক পদার্থের সহিত সমসূত্রে সংশ্লিষ্ট। আমরা প্রত্যেকেই ইহার অংশ-স্বরূপ; সুতরাং প্রয়োজন হইলেই আমরা আমাদের অদৃশ্য স্বজাতীয় জ্ঞানময় জীবগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারি। আমাদের পরিচিত প্রত্যক্ষদৃশ্য বন্ধুগণের সহিত আমরা যেমন বাক্যালাপ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কার্য্যসাধন করিয়া লইতে পারি, তদ্রূপ অদৃশ্য উচ্চতর জীব অর্থাৎ দেবতাগণের নিকটেও প্রার্থনা দ্বারা সবিশেষ ফল-লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত অধিকতর উন্নত, তাঁহারা স্বার্থপূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। "ধনং দেহি জনং দেহি" ইত্যাদি প্রার্থনা বাক্য অনুন্নত সাধকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও শুদ্ধভক্তগণ ইহার কিছুই প্রার্থনা করেন না। এমন কি, যে মুক্তির দ্বারা সর্ব্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় এবং সর্ব্বানন্দ লাভ হয়, তাঁহারা তাদৃশ মুক্তিকেও নিরতিশয় তুচ্ছ করিয়া থাকেন। ভাগবত পরহংসগণের মধ্যে যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা মুক্তিরও প্রার্থী নহেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ ভক্তগণ কেবল ভগবৎসেবা ভিন্ন স্বকীয় স্বার্থ সম্বন্ধীয় আর কোন প্রার্থনা করেন না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, :—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

অর্থাৎ "হে গোবিন্দ! আমি ধন জন দিব্যস্ত্রী কিম্বা যশস্করী বিদ্যা ইহার কিছুই চাহি না। জন্মে জন্মে তোমার চরণে আমার যেন অহৈতুকী ভক্তি হয় ইহাই প্রার্থনা।" ইহাও কামনা বটে, কিন্তু একামনায় স্বীয় ভোগসুখ, ইন্দ্রিয়বিলাস, এমন কি সর্ব্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি-স্বরূপ মোক্ষের প্রার্থনা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। যদি ভগবৎ সেবায় ও তৎ-সৃষ্ট জীবের সেবায় অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়—শুদ্ধভক্ত প্রসন্নচিত্তে অম্লানবদনে তাহাও স্বীকার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় দেখা যায় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ যখন মহাপ্রকাশ-লীলা প্রকটন করিয়া ভক্তগণকে বরপ্রার্থী হইতে আদেশ করেন, তখন অন্যান্য ভক্তগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে বর চাহিয়াছিলেন। বাসুদেব নামক এক প্রসিদ্ধ ভক্ত অদূরে নীরবে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। গৌরসুন্দর বলি-লেন "বাসু! তুমি নীরব রহিলে কেন, তোমার প্রার্থনা কি? বাসু-দেব কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "দয়াময়! যদি এ অধমকে কোন বরদান করেন তবে এই বর দিন যে সমগ্র জগতের জীবগণের দুঃখযাতনা যেন আমার ভোগ্য হয়; আমি সকলের পাপতাপ গ্রহণ করিয়া অনন্তকাল যেন দুঃখনরকে পড়িয়া থাকি, জগতের জীব যেন আনন্দলাভ করেন।" এই প্রার্থনায় দেখা যাইতেছে যে আত্মসুখবাঞ্ছা পরিহার করিয়া যাঁহারা পরদুঃখে কাতর হন, নিখিল ক্লেশ যাতনা সহ্য করিয়াও যাঁহারা জগতে জীবের সুখ শান্তি দান করিতে অকপটে অকুণ্ঠচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনা পূরণ হউক বা না হউক, কিন্তু প্রার্থয়িতার

হৃদয়ের বিশাল উদারতা এবং পরদুঃখবিমোচনের অলৌকিক অদ্ভুত প্রার্থনা,—বিশ্বপ্রেমের এক বিপুল উচ্চতম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

প্রার্থনার বহুল প্রকার ভেদ আছে; কিন্তু যে প্রার্থনায় মানুষের আত্মা বিশ্বেশ্বরের বিশাল বিশ্বের সমগ্র বস্তুকেই আপন বলিয়া ভাবিতে পারে, নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া উপরে ভগবানের এবং নিম্নে তাঁহার সৃষ্ট জীবদলের সেবাসাধনে প্রয়াসী হয়, সেই প্রার্থনাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও উচ্চতমা।

আলেক্‌জাণ্ডার পোপ বলিয়াছেন—

"All are but parts of one stupendous whole,
Whose body nature is, and God is soul."

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতে আছে,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনার প্রকৃত আদর্শ।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শেষ হইলে সুপণ্ডিত স্বদেশহিতৈষী ডাক্তার কোমারভস্কি (Komarovsky) বলিলেন, আপনি ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসিয়া অনেক প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিলেন। কিন্তু আপনাকে দেখিলে মনে হয় যে, এই জড়দেহের কোন ক্লেশই আপনাকে স্পর্শ করে না—স্পর্শ করিতে পারে না। আপনার উপদেশ অপেক্ষা আপনার আচারব্যবহার ও জীবন-নির্ব্বাহপ্রণালী আমাদের নিকট অধিকতর শিক্ষার বিষয় ও ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আপনি আমাদের জ্ঞাত দেহবিজ্ঞানের কার্য্যাবলীর অনেক উপরে অবস্থিত। ভারতবর্ষীয় যোগীদের অলৌকিক শক্তির কথা গ্রন্থাদিতে পাঠ করিতাম, মনে অনেক প্রকার সন্দেহ হইত; কিন্তু

আপনাকে দেখিয়া সে সন্দেহ অপনোদিত হইল। যাহাহউক আপনার বক্তৃতার বিষয় অতীব চিন্তাপূর্ণ। আমাদের মধ্যে অনেকেই এ ধারার চিন্তা করেন না। কিন্তু আপনার বক্তৃতার প্রণালী এমনি চিত্তাকর্ষক যে, উপস্থিত নরনারীমাত্রেই অতীব শ্রদ্ধার সহিত আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সুখী হইয়াছেন।

আমাদের দেশের লোকদের বর্ত্তমান অবস্থা এতই শোচনীয় যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সৃষ্টি করা ভিন্ন অত্যাচারীর উৎপীড়ন কিছুতেই প্রশমিত করার আশা নাই। আমরা অতিদুর্দ্দিনে দিন যাপন করিতেছি। সর্ব্বত্রই ব্যবসায় বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প প্রভৃতির দুরবস্থা। ইতঃপূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিগণ প্রজাগণের উন্নতিকল্পে কোনও সদুপায় অবলম্বন করেন নাই। প্রত্যুতঃ তাঁহারা পদে পদেই বাধা উপস্থাপিত করিতেন। শ্রমজীবীদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। জনসাধারণের দৈন্য দুঃখ ও দারিদ্র্য সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের দুঃখ-দুর্গতি বিমোচন না করিয়া কেবল নিজদের সুখ-সমৃদ্ধি-বর্দ্ধনে ও বিলাস উপভোগে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকেন। নানা প্রকারে করদ্বারা প্রজাগণ প্রপীড়িত এবং সরকারী কর্ম্মচারি বর্গের উৎপীড়নে উৎপীড়িত। পুলিশ ও সৈন্য-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইতেছে। প্রজাদিগের উন্নতির জন্য প্রজাদের প্রদত্ত রাজস্ব ব্যয়িত না হইয়া বিলাসী রাজপুরুষদের ভোগ-বিলাস প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষেই বজেটে কেবলই কর-বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রজাদের উন্নতিকল্পে কোনও ব্যবস্থা হইতেছে না। এই সব ব্যাপার হইতে টেররিজম্, নিহিলিজম্ এবং সোজিয়ালিজ্‌মের উৎপত্তি।

প্রজাদের দৈন্য-দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রশমনের কোন চেষ্টা না করিয়া ইউ-রোপিয়ান ষ্টেট্‌গুলি কেবলই সৈন্যবৃদ্ধি ও সামরিক দ্রব্য-সঞ্চয়ে অনবরত

বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। বহিঃশত্রু হইতে স্বদেশ-রক্ষার ভাণে সৈন্যবৃদ্ধি ও সামরিক দ্রব্য সংগ্রহ করা হইতেছে কিন্তু ইহা ভাণমাত্র—উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা নহে—স্বার্থের রাক্ষসী বাসনাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইয়োরোপে কেহ কাহারও প্রতি বিশ্বাস করেন না। প্রত্যেক ষ্টেটের আশঙ্কা এই যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার প্রতিবাসী হয়তো আক্রমণ করিবে। সকলের মনেই এইভাব বর্ত্তমান। ইহা হইতে যুদ্ধের আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইউরোপীয়ান ষ্টেট্‌গুলি যেন আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত,—যে কোন মুহূর্ত্তে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপে ইউরোপে হিংসা, দ্বেষ, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং পররাজ্য স্বায়ত্তে আনিবার রাক্ষসী বাসনা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ইহার ফলে প্রত্যেক ষ্টেটে সামরিক ব্যয়ভার বাড়িয়া যাইতেছে। এন্‌রিকো ফেরি (Enrico Ferri) নামক একজন রাজনৈতিক পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপে সাধারণ অবস্থাতেও ৯০ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদাই সুসজ্জিত রাখিতে হয়। ইহার উপরে (১৫০০০০০০) এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য রিজার্ভে মজুত রাখিতে হয়। এইরূপ সৈনিক ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক দ্রব্য-সঞ্চয়ের ব্যয় যে কত অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই সকল ব্যয়ের পরে প্রজাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতি-সাধনের জন্য কোন ষ্টেট্‌ই উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ নহেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের এমনি দুরবস্থা। ১৮৮৭ সালের ২৬শে জুলাই চার্লস্‌বুথ লণ্ডনে A, R. C. N. L, সমিতিতে যে বক্তৃতা করেন তাহাতেও উক্ত সংখ্যারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। সার উইলফ্রেড্ লসন্ বলেন ইউরোপ একটী খৃষ্টিয়ান দেশ। এই দেশের শান্তিরক্ষার্থ পরস্পরকে নিহত করার জন্য ২ কোটী ৮০ হাজার অস্ত্রধারী সৈন্য রাখা নিত্য প্রয়োজনীয়।

রক্তপাত ব্যতীত শান্তিরক্ষার অন্য কোন উপায়-উদ্ভাবন করা অসম্ভব। জগতের সুবিখ্যাত খৃষ্টান দেশের এই তো অবস্থা! তিনি আরও বলেন ১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপের বাদবিবাদ অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে মীমাংসা করার জন্য ১,৫০০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। শান্তিময় যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম কি প্রকারে ইউরোপে পালিত হয় ইহা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ইউরোপের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটী প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"Take away justice, and what is then a Nation but a great band of robbers" অর্থাৎ ন্যায়পরতা বাদদিলে দেশবাসীদিগেকে একদল ডাকাইত ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্য একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কেহ ইহাদিগকে Nations of thieves এবং ইহাদের সেনাদলকে Bands of robbers আখ্যা প্রদান করেন, তাহা বড় অতিরঞ্জন হইবে না। যাহারা সমরকার্য্যে সেনাশ্রেণীতে এবং সামরিক অফিসার ও জেনারেলের কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। দাসত্ব অনেক প্রকার আছে। কিন্তু সামরিক দাসত্ব সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহারা নিঃস্বার্থে অপরদেশের নিরপরাধ লোকদিগের গলদেশে অধীনতার শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া দেয়। ইহারা রাজার আজ্ঞায় স্বাধীন লোকদিগকে নিহত করে এবং দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে; কশাইদের মত নিরপরাধ নির্দ্দোষ লোকদিগকে নিহত করার জন্য ইহারা সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করে এবং প্রভুর আদেশে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য প্রভৃতির কিছুমাত্র বিচার না করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় নরহত্যা-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ইউরোপের অবস্থা অতি শোচনীয়। পৃথিবীর ধন এবং বাণিজ্যের ভাণ্ডার আমাদের হস্তে বিন্যস্ত রহিয়াছে তথাপি আমরা সর্ব্বভাবেই অত্যন্ত দরিদ্র।" ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছিল. কিন্তু ইহা বর্ত্তমান অবস্থারই খাটি চিত্র। যুদ্ধের ব্যয়ভার অসাধারণ-রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানব সমাজের সুখসম্পত্তি সম্বর্দ্ধিত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই নরহত্যার নিত্য নূতন নিয়ম-উদ্ভাবনে বিব্রত। কি প্রকারে অতি অল্পসময়ে বহুলোকের হত্যাসাধন হয় বিজ্ঞান কেবল সেই উপায়-উদ্ভাবনে নিরন্তর প্রস্তুত হইতেছে। সমগ্র মানব-সমাজকে কশাইখানায় পরিণত করাই যেন বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার একটী প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে অর্থ দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নানাবিধ সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতে পারিত, সেই অর্থ এখন জলের ন্যায় অগণিতভাবে কেবলই লোকহত্যার বিশাল উদ্যোগ-আয়োজনে অপব্যয়িত হইতেছে। সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি-লাভ তো দূরের কথা। এখন এই উপদ্রব হইতে কি প্রকারে দেশ বিমুক্ত হইতে পারে, তাহাই বর্ত্তমান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ দেশে সাম্য ও শান্তি-সংস্থাপনের জন্য মৌখিক বক্তৃতা করিতেছেন কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় সমবেত হওয়া মাত্রই সমর-সম্ভার বৃদ্ধির এবং সৈন্যসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রস্তাবনা করিতেছেন। সামাজিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের এইরূপ কথার ও কার্য্যের বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য দেখিয়া কাহার প্রাণে দুঃখ না হয়? হস্তে বন্দুক উত্তোলন করিয়া শান্তির প্রস্তাবনা করা প্রকৃতই এক বিসদৃশ রাক্ষসী বিড়ম্বনা। দেশের এই ভীষণ দুরবস্থায়, দৈন্যে, দুর্গতিতে ও দুর্দ্দশায় ইউরোপে প্রতিবৎসর প্রায় ষাট্ হাজার আত্মহত্যা

সংঘটিত হইয়া থাকে। এই গণনায় তুরস্ক ও রাসিয়া অন্তর্ভুক্ত নহে। কি ভীষণ শোচনীয় ব্যাপার,—একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিই, আমরা আপনাদের দেশের লোকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করি। কিন্তু দেশের লোকের ধর্ম্মতঃ ও সমাজতঃ এতই দুরবস্থা যে ষাট্ হাজার লোককে আত্মহত্যা করিয়া দুঃখের জীবন অবসান করিতে হয়।

আমরা আপনার বক্তৃতা শুনিয়া বাস্তবিকই প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দূরীভূত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আপনি অবতারবাদী হিন্দু। অথবা আপনাকে হিন্দুই বা বলি কেন? আপনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-মানব। আমার তো বোধ হয় সাধারণতঃ আমরা অতি শ্রেষ্ঠ মানব বলিলে যাহা বুঝি, আপনি তাহার অনেক উপরে। আপনি প্রকৃত পক্ষেই অতিমানব—Super-man। আপনি প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ও উপ-কারিতা সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন; আমরা সরল ভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি ইউরোপের সুখ শান্তির জন্য আমাদের প্রতিনিধিরূপে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি-বেন। তাহাতে নিশ্চয়ই ইউরোপের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।”

প্রতিভাময়ী—আমি রাসিয়ার একজন কৃতবিদ্য শ্রেষ্ঠব্যক্তির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রকৃতই লজ্জিত হইলাম। আমাকে তাঁহারা এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কেন যে সম্মান প্রদান করিলেন, তাহা ভগবানই জানেন। আমি লজ্জায় কিয়ৎক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম; পরে গভীর সম্মান সহকারে ও প্রগাঢ় ভক্তিভাবে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম,—দয়াময় শ্রীভগবান আপনাদের এই শুভ বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। আমাকে আপনাদের দেশের একজন

দীনাভিদীন নিঃস্বার্থ সেবক বলিয়া মনে করিবেন। আমি সমগ্র জগতের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু জানি না শ্রীভগবান্ আমাদ্বারা মানবসমাজের কোনও উপকার সাধিত করিয়া লইবেন কি না? আপনারা আমাকে তিব্বত হইতে আমন্ত্রিত করিয়া এখানে আনিয়াছিলেন। কিছু বলিবার অধিকার দিয়াছিলেন, উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান! আপনারা ধৈর্য্যসহকারে আমার নিবেদন গুলিতে কর্ণপাত করিয়াছেন, আমি তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছি। নানারূপ কথা বলার সময়ে যাহা কিছু অন্যায় অসঙ্গত বা অসম্বন্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি সরল অন্তঃকরণে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। আপনারা আমার প্রতি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি প্রকৃত পক্ষেই লজ্জিত হইয়াছি। আপনাদের সদয় ব্যবহারে ও সৌজন্যে আমি আমাকে ধন্য মনে করিতেছি, এখন আপনাদের নিকট বিদায় প্রার্থী।" এই বলিয়া আমি গমনোন্মুখ হইলাম। তখন শ্রোতৃবর্গের অনেকের মুখে বিরহশোকের বিষাদচ্ছবি পরিলক্ষিত হইল। আমি সেইদিনই মস্কাউ হইতে ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। *

হিতব্রতা শ্যামসোহাগিনি! পত্রখানা নিরতিশয় দীর্ঘ হইল। ইহাতে অনেক কঠোর বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তুমি চিরদিন প্রেমভক্তির মাধুর্য্যামৃত সিন্ধুতে নিমজ্জিত থাকিতে ভালবাস। এই পত্রের রাজনীতিক ও দার্শনিক শুষ্ক আলোচনা তোমার নিকট ভাল বোধ হইবে না, তাহা আমি জানি; কিন্তু জগৎ অশেষ বৈচিত্র্যময়; বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই তুমি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে! বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই শ্যামসাগরের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে আত্মনিমজ্জন, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন

* এই মস্কাই-বক্তৃতার কোন কোন অংশ অবিজ্ঞাপিত ভাবে পাঞ্চজন্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—সম্পাদক।

করিয়া জীবনব্রতের সফলতা লাভ করিবে ;—এই নিমিত্ত মাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কটু তিক্ত রসের আস্বাদনও তোমার নিকটে উপস্থাপিত করিতে হইল। ইহা পাঠে তোমার যে শ্রান্তি ও ক্লান্তি হইবে,—তজ্জন্য সরলভাবে আমায় ক্ষমা করিও। অধুনা আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প,—ধ্যানে স্ফূর্ত্তিই তোমার সম্বল। আমার জন্য দুঃখ করিও না। স্ফূর্ত্তিতেই দেখা পাইবে, ইতি।

তোমার চির শুভাশীর্ব্বাদক

চিরসুহৃদ্—শ্রীগুরুদেব।

উপসংহার।

শ্রীপাদ গুরুদেবের সুদীর্ঘ পত্র-পাঠে আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম, জ্ঞানী ও ভক্তগণ তাঁহাকে অবশ্যই মহাপুরুষ বলিয়াই বুঝিতে পারেন, কিন্তু জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণও তাঁহার আচার-ব্যবহার ও বিবিধ অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-ভক্তির কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন,—ইহা ভাবিয়া আমার মনে অতীব আত্ম-প্রসাদ উপজাত হইতে লাগিল,—আত্ম-প্রসাদ এই যে—এমন জগদ্বরেণ্য জগৎপূজ্য মহাপুরুষ আমাকে কৃপা করিয়াছেন,—দেখা দিয়াছেন, শুধু দর্শন দান নয়—স্নেহের সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন—আমাকে সুখ-শান্তি ও জ্ঞান ভক্তি দেওয়ার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া সুদীর্ঘ পত্র দান করিতেছেন। আমি ইহা মহাসৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলাম।

রাসিয়ার অধিবাসিগনের বর্ত্তমান আন্দোলনের ভাব ও প্রভাব এই পত্রপাঠে আমি অনেকটা জানিতে পারিলাম। এইরূপ স্থলে শ্রীপাদ গুরুদেব কেন যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রয়োজনীয়তাও আমি

বুঝিতে পারিলাম। আমার ধারণা হইতেছে, তিনি পারমার্থিকতার যে বীজ বপন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইবে না—তাঁহার উপদেশ ব্যর্থ হইতে পারে না। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্। যখন তাঁহার শ্রীপাদধূলিকণায় জড়বাদীদের ভূমি পবিত্র হইয়াছে, তখন অবশ্যই সময়ে ইহার সুফল ফলিবে ; সুপণ্ডিত কোমারভস্থির সরল ব্যাকুল প্রার্থনায় গুরুদেবের কৃপায় এই ভীষণ মরুভূমেও সময়ে শ্রদ্ধাভক্তির মন্দাকিনী অবশ্য প্রবাহিত হইবে । ইহাতে আমার প্রাণে বড় আনন্দ হইল। জগতের হিতের জন্যই আমার প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। জগতের অতি অন্ধকার প্রদেশেও তাঁহার সুনির্ম্মল জ্ঞানের আলোক রেখা সম্পতিত হইয়া থাকে। তাহাতে জনসাধারণের চিত্ত অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করে। শ্রীভগবানই মানবদেহে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রকারগণ এইজন্য গুরুগোবিন্দের অভেদতত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন। তিনি যে সহসা ভারতবর্ষ হইতে রাসিয়ার প্রধান একটা নগরে উপস্থিত হইবেন, এবং সেখানে জড়বাদী রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের রীতিনীতির অসারত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সার-সিদ্ধান্তের বিমল জ্ঞান প্রদান করিবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতাম না। তিনি যখন রুষদেশে রুষদের ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রেম-প্রতিভা-সমুজ্জ্বল শ্রীমুখমণ্ডল দর্শনে এবং তাঁহার সুধামাখা বাক্য-শ্রবণে তুষার-শুভ্র রুষরমণীগণ যে কি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, আমার কেবল তাহাই মনে হইতেছে। তাঁহার বিদায়ের সময়ে সেই সকল মহিলাগণের কত যে নয়ন-ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, আমি কল্পনা-চক্ষে কেবল তাহাই দেখিতেছি ; এমন জগদাকর্ষি ভুবনমোহন রূপ-মাধুর্য্য, এমন সুতীক্ষ্ণ ও সুকোমল বিমল-জ্ঞান বিকাশী সমুজ্জ্বল নেত্রযুগল—এমন সুঠাম সুন্দর

লাবণ্যময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—একেবারেই মানুষে সম্ভবে না। তাঁহার শ্রীমুখের ভাষা,—অনন্ত মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। সেই শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শনে হৃদয়ে ইতর বাসনা তিরোহিত হয়। সে সুমধুর করুণকোমল বাক্য-শ্রবণমাত্রই হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। রুষরমণীগণ প্রকৃতই ধন্যা; যেহেতু তাঁহারা অনেক দিন এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং এই মধুমাখা বাক্য-শ্রবণের সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, পূরা একদিবস সময় এই শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। বিজলির চমকের ন্যায়, প্রতিপদের চাঁদের ন্যায় দর্শন দিয়াই সহসা তিনি তিরোহিত হই-তেন; ভাল করিয়া এই জীবনে তাঁহার দর্শন পাইলাম না। পত্রের উপসংহারে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও সে আশা একেবারেই নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। রুষরমণীগণের যে সৌভাগ্য হইল, আমি ততটুকু সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিতা,—এমনই আমার কর্ম্মভোগ! এ জীবনে আর যে দেখা পাইব, সে আশা নাই। এ ভাবে কি প্রকারে দিন যামিনী অতিবাহিত করিব সে এক বিষম ভাবনা আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। তাঁহার এই পত্রের অধিকাংশই রুষজড়বাদিগণের শিক্ষার্থ উপদেশে পরিপূর্ণ; তথাপি তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত এই সুদীর্ঘ পত্র বহু-বার পাঠ করিয়া আমি বুঝিয়াছি, এই নশ্বর দেহ এবং এই নশ্বর দেহের ভোগ—পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের বিঘাতক। শ্রীপাদ গুরুদেব সর্ব্বদাই যে আমার উন্নতি-সাধনের জন্য আমাকে উপদেশ করেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য; কিন্তু আমি যে তাঁহার কোন সেবা করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ রাখিবার আমার স্থান নাই। আবার কখনো কখনো ভাবি, আমি তাঁহার সেবা কি করিব? তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আমি তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কিরূপে সেবা করিব? আবার পরক্ষণেই মনে করি, শ্রীবৃন্দাবনে মা যশোদা তাঁহরে আনন্দগোপালের সেবার জন্য কি না করিয়াছেন?

ব্রজের রাখালগণ বৃন্দাবনের ভাই কানাইকে কাঁধে তুলিয়া লইতেন, বনের ফলমূল তাঁহার শ্রীমুখে তুলিয়া দিতেন, কমলের কোমল পাতায় তাঁহাকে ব্যজন করিতেন। নব নব ব্রজবালাগণ কখন বা চামরে, কখন বা পরিহিত বসনাঞ্চলে তাঁহারশ্রীঅঙ্গে বাতাস দিতেন, কখন বা নলিন-নয়নের সরস সুন্দর কুটীল দৃগ্-ভঙ্গীতে তাঁহার চিত্তে কত মধুর রস ঢালিয়া দিতেন। এইরূপে আনন্দ-বৃন্দাবনে মধুময়ী সেবার কথা—ঋষিগণের লেখায় দেখিতে পাই। তবে কথা এই যে, তাঁহার সেবাকরার অধিকার-লাভও মহা-সৌভাগ্যের ফল। আমার সে সৌভাগ্য কোথায়? সুতরাং নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া চিন্তিয়া সকল দুঃখই আমাকে সহিয়া থাকিতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনের সেবার কথা স্মরণ করিতেও বোধ হয় আমার অধিকার নাই। সে স্মৃতিতে আমার দুঃখ বাড়িবে বৈ কমিবে না। এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই এক ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন এই জীবনে আর কোন কর্ত্তব্য নাই। দিবানিশি বিরলে বসিয়া কেবল তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণ, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান এবং তাঁহার উপদেশ-অনুসারে জপ, পূজা, আরত্রিক আরাধনা, গ্রন্থপাঠ প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্যগুলি কোন প্রকারে সম্পন্ন করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মশেষ করাই এ জীবনের কার্য্য। তাঁহার পত্রে তিনি স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন, সত্বরে তাঁহার দর্শন মিলিবে না। আমার জীবন যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে এ কথা অনেক দিন হইতেই আমি বুঝিয়া রাখিয়াছি। নীরব নির্জ্জনে বাস এবং শ্রীগুরুর পাদপদ্ম-ধ্যান ইহাই এ জীবনের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিধান। সুতরাং বিরহের তীব্র তাপ নীরবে নীরবে সহিতে হইবে; নীরবে নীরবে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে হইবে, নীরবে নীরবে "হা গোবিন্দ" বলিয়া দিনযামিনী হা-হুতাশে ও

দীর্ঘশ্বাসে অতিবাহিত করিতে হইবে। ইহার উপরে অধিক আশা-করা,—আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরাশা।

তাঁহার কৃপার কথা আমি যতই ভাবি, তাঁহাকে নিঠুর বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার প্রতি তাঁহার অনন্ত দয়া; নচেৎ এত করিয়া আমার জন্য পত্র লিখিতেন না; তিনি সর্ব্বদাই আমার কথা চিন্তা করেন, অতি সরল ভাবেই পত্রে এই আশ্বাস বাক্য লিখিত হইয়াছে। আমি এক অকর্ম্মণ্য কীটানুকীট। আমার প্রতি তাঁহার এত কৃপা! বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড—তাঁহার দৃষ্টির স্থল। অনবরত জগতের হিতে তিনি অনন্ত কার্য্য সাধন করেন; অথচ এই কীটানুকীটের প্রতি তাঁহার স্নেহ দৃষ্টির অভাব হয় না। এ সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া কখন কখন আমার হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত হয়। তাঁহাকে কখনো আমি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তবে তাঁহার চরণতলে বসিয়া তাঁহার সেবা করা, তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল শ্রীমুখমণ্ডল-সন্দর্শন করা যে সৌভাগ্যের ফল,—পূর্ব্বজন্মে বা ইহজন্মে সে সুকৃতি আমার ছিল না এবং এখনও সে সুকৃতিজনক কোন কার্য্যই আমি করিতে পারিতেছি না। সুতরাং সে কথা স্মরণ করা কেবল মানসিক যাতনাভোগমাত্র। প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান হইলে শ্রীপাদ গুরুদেবের কৃপায় কখনও সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু হৃদয় তো আশা-বিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার কৃপায় এ হৃদয়ে সে আশা সততই জাগিয়া উঠিতেছে। তিনি অবশ্যই আমাকে চরণতলে স্থান দিবেন। তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া রাখাই আমার এ জীবনের ব্রত। যদি পরিনিষ্ঠিত ভাবে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া রাখিতে পারি, দয়াময় গুরুদেব কখনই আমাকে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিবেন না।

তাঁহার পত্রের অধিকাংশ স্থলেই আমার প্রতি স্নেহ সম্বোধন দেখিতে পাই। আমি দিনের মধ্যে বহুবার তাঁহার কৃপাপত্র পাঠ করি এবং সেই সম্বোধনের শব্দগুলি নয়ন ভরিয়া দর্শন করি। তাহাতে আমার হৃদয় নব নব আশায় পরিপূরিত হইয়া উঠে; অনেক যাতনার লাঘব হয়। এমন করুণা, এমন স্নেহ সম্ভাষণ,—আপনজন ভিন্ন অপর কাহার নিকটে আশা করা যায় না। আমি বুঝিয়া লইয়াছি, তিনি নিশ্চয়ই আমার,—এবং আপনার হইতেও আপনার—এই ধারণা হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগিয়া উঠিতেছে; তাহাতেই এ মহাবিরহে এই জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছি; নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিত।

এই দেহত্যাগের পূর্ব্বে আর কি একটিবারের জন্যও শ্রীপাদ গুরুদেবের চরণ দর্শন পাইব? এই পত্রে আর সে আশা করিতে পারি না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক। কিন্তু এইভাবে আমি যে দীর্ঘকাল আর এই দেহ-ভার বহন করিতে পারিব না, তাহা একবারেই সুনিশ্চয়। যত সত্বরে এই যাতনাময় দেহের অবসান হয়, তাহাই সুমঙ্গল। মৃত্যুর পরে আবার যদি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিতে পারি, তবে যেন নারীকুলেই জন্ম গ্রহণ করি। কোন ভক্তসাধক প্রার্থনায় লিখিয়াছেন:—

মা মে স্ত্রীত্বং মাচ মে স্যাৎ কুভাবো,
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম;
মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ
জাতো জাতো বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্।

অর্থাৎ "আমার যেন স্ত্রীত্ব হয় না, যেন কুভাব হয় না, মূর্খত্ব বা কুদেশে যেন জন্ম হয় না, কদাচ যেন মিথ্যা দৃষ্টি হয় না, জন্মে জন্মে যেন বিষ্ণুভক্ত হইতে পারি।" এই প্রার্থনার একটী কথা ভিন্ন অন্য সকল কথাই আমার প্রার্থনার বিষয়। স্তবলেখকমহাশয়

স্ত্রীত্ব পদের কোন্ অর্থ মনে ধারণা করিয়া স্ত্রীত্বের দোষ কল্পনা করিয়াছেন, বলিতে পারি না। স্ত্রীত্বের কতকগুলি দোষ একেবারে অস্বীকার্য্যও নহে। কিন্তু ইহার শত দোষ থাকিলেও যখন গোপীদের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করি, তখন ইহার গুণ ভিন্ন কোনও দোষ আমার মনে স্থান পায় না। স্ত্রীজন্মের যত দোষ থাকে, থাকুক; কিন্তু ব্রজ-বালাদের সেবার মত সেবার লোভ কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। যে-কুলে-সে-কুলে জন্ম হউক, যেন রমণী-জন-সুলভ সেবানিষ্ঠ হৃদয় লইয়া স্ত্রীকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দের সেবা-অধিকার লাভ করিতে পারি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে সমুচ্চ গগনে প্রখরপ্রতাপী সূর্য্যদেব বিচরণ করেন, তথাপি সরোবরবাসিনী সরোজিনী বারঘণ্টা কাল তাঁহার দর্শন পায়; দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার মাইল দূরে তারকা-খচিত সুনীল নৈশ আকাশে চন্দ্রমা ঘুরিয়া বেড়ান, তথাপি কুমুদিনী তাঁহার দর্শনলাভে প্রফুল্ল হয়—কিন্তু আমার অবস্থা কি ভীষণ শোচ-নীয়—একই দেশে অবস্থান করিয়াও প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-দর্শনে আমি সততই বঞ্চিতা; অথচ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময়, কৃপাময়, প্রেমময় ও রস-ময়; ইহা আমার দুর্ভাগ্যের বিষময় ফল ভিন্ন আর কি বলিব? দয়াময় আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলেন—"তুমি ধ্যানে ও স্ফুর্ত্তিতে আমার দর্শন পাইবে। আমি সর্ব্বদাই তোমার কথা ভাবি,—সর্ব্বদাই তোমার কথা মনে করি।" তাঁহার দয়ার অভাব নাই, স্নেহের অভাব নাই, মধুর বাক্যেরও অভাব নাই; কিন্তু আমায় সেবা-অধিকারে ও দর্শনানন্দে বঞ্চিত রাখাই যেন তাঁহার একটী স্বকল্পিত সুনির্দ্দিষ্ট বিধান। ভূধরে ভূস্তরে, সাগরে প্রান্তরে, গগনে অরণ্যে সর্ব্বত্রই তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবেন—কেবল এ দাসীকে দর্শন দেওয়াই—তাঁহার অনিচ্ছা।

ইহাতে আমার আর কি উপায় আছে? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, পরম-দয়াময় ও ইচ্ছাময়—আমাকে যাতনায় রাখিলেই যদি তাঁহার সুখ হয়, আমাকে বিরহে বিরহে ছারখার করাই যদি তাঁহার সুনিয়মের ও সুবিধানের একটা প্রধান কার্য্য হয়—তবে তাহাই হউক। তথাপি আমি মনে করিব—তিনি আমায় মনে রাখিয়াছেন, মনে রাখিয়াও নারীহৃদয়দগ্ধ করার মহাব্রত প্রতিপালন করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। শ্যাম জলধরের বারিবিন্দু ভিন্ন চাতকিনীর অন্য উপায় নাই—সে একবিন্দু জলের জন্য শুষ্ক কণ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তথাপি সে অন্য কোনও দিকে জলবিন্দুর অনুসন্ধান করিবে না—ইহাই চাতক-ব্রত। দয়াময়ী চাতকিনী আমাকেও এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। জলবিন্দু চাহিতে যদি ভীষণ বজ্র নিঃক্ষিপ্ত হয়, তাহাও ভাল—চাতকিনী তাহাও সাধের মরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, তথাপি মহানদী বা সাগরের নিকট জল-প্রার্থিনী হয় না।

হরি হরি, জগতে কেহই আমার এ যাতনা বুঝিতে পারিবেন না—কয়জনেরই বা এরূপ দুঃখ হয়, কেই বা আমার দুঃখ বুঝিবে! যিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহময়, যাঁহার স্নেহে এখনও এ জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই—তিনিই কি আমার এ জ্বালা বুঝিতে পারেন? তাঁহাকে তো জগতের লোকেরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বন্দনা করে, স্বয়ং বেদও তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করেন—আমার সেই প্রাণের প্রাণ—আত্মার আত্মা—সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরও আমার হৃদয়ের জ্বালা বুঝিতে পারেন কি? বুঝিতে পারিলে আর এ যাতনা দিতেন কি? রাবণের চিতার ন্যায় আমার এই গুরু বিরহ নিরন্তর ধক্ ধক্ জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমার অস্থি মজ্জা পোড়াইয়া পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিতেছে—আমার এ রোগ বুঝিতে কোনও বৈদ্যের শক্তি নাই,—এ রোগের কোনও ঔষধ নাই—ইহা এখন বুঝিয়াছি—

বুঝিয়াই নিজের জ্ঞানে ইহার প্রতীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—যাঁহা হইতে এই জ্বালার উৎপত্তি, তাঁহারই শ্রীচরণে এই বিরহ-তপ্ত আত্মা নিবেদন করিয়া দিয়া এজীবনের শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। প্রাণের আরাধ্য গুরুদেব, আপনি আপনার প্রিয় সখা শ্রীমৎ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

অর্থাৎ মানুষ যখন ইহ জীবনের সুখার্থ ও স্বর্গলাভার্থ যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে 'আত্ম-নিবেদন' করিয়া দিয়া কৃতার্থ হয়, তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার সহিত একত্ব-লাভের যোগ্য হয়।

আপনার এই উপদেশই—এ জীবনের চরম উপদেশ। বহুভাবে আমি বুঝিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ—গুরুরূপে আমায় কৃপা করিতেছেন। আমি যেন নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আপনি সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দ হইয়াও আমায় শ্রীগোবিন্দ-মন্ত্র ও শ্রীগোবিন্দভজন উপদেশ করিয়াছেন। গুরুও আপনি—শ্রীগোবিন্দও আপনি—ইহা ভাল রূপেই বুঝিয়াছি।

যোঽহং মমাস্তি যৎ কিঞ্চিৎ ইহলোকে পরত্র চ।
তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্।

হে নাথ, এই অনাথিনীকে দর্শন দান করুন আর নাই করুন, কিন্তু এই দাসী সকল ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া দিয়া বহুদিন হইতেই জগতের নিকটে বিদায় লইয়াছে।

এস্থলে বঙ্গের প্রেমিক কবি শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের আত্ম-নিবে-

দনের পদগুলি মনে পড়িতেছে। কিন্তু এই অনাথার মুখে সে সকল উক্তি একেবারেই শোভনীয় নহে। সে ভাবে যাঁহাদের চিত্ত বিভাবিত, তাঁহাদেরই পরিতৃপ্তির জন্য আমার কথার উপসংহার করিতেছি :—

১। বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণ নাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়ে এক মন হৈয়ে
ও পদে হইনু দাসী॥

২। বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে স'পেছি
কুল-শীল-জাতি-মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি দীনা
না জানি ভজনপূজন॥
পিরীতি-রসেতে মাখি তনু মনু
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি
মন নাহি আন ভায়॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যামরায়।
চণ্ডীদাস কয় জীবনে মরণে
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥

শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দ-চরণে সমর্পিতমস্তু!

ইতি

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূ[ষণ]

মহোদয়-প্রণীত-গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থের নাম		
শ্রীমৎ রূপসনাতন-শিক্ষামৃত (১ম খণ্ড)		৪৲
ঐ (২য় খণ্ড)		৪৲
শ্রীরায় রামানন্দ		৩॥০
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী		৩৲
গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ		৩৲
শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া		৩৲
শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী মূল সটীক বঙ্গানুবাদ		২।০
আত্মনিবেদন	২৲, বাঁধাই	২॥০
নীলাচলে ব্রজমাধুরী		১॥০
শ্রীশ্রীগোপীগীতা		১।০
শ্রীমৎ দাসগোস্বামী		১।০
শ্রীমৎ স্বরূপদামোদর		১।০
শ্রীশ্রীনামমাধুরী		১৲
সাধন-সঙ্কেত		১৲
শ্রীচরণতুলসী		১৲
অদ্বৈতবাদ		১৲
শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক মুল ও বঙ্গানুবাদ		১৲
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি		১৲
আনন্দমীমাংসা		৸০

প্রাপ্তিস্থান :—

২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

১২৮।১৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ "অমৃতপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীঅমৃতলাল দত্তদ্বারা মুদ্রিত।